আলোচনা-প্রসঙ্গে

একাদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

একাদশ খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫

মুদ্রক ঃ

প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

বাইণ্ডার ঃ

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

ভূমিকা

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঐ সালের মে মাসের ২০ তারিখ পর্য্যন্ত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন আলোচনা-প্রসঙ্গের একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। এই পুস্তকের প্রথম এক-চতুর্থাংশ 'আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশনার পূর্ব্বে পরম দয়ালকে শুনিয়ে সংশোধন ক'রে দেবার সুযোগ জুটেছিল। পরবর্ত্তী অংশও 'আলোচনা'য় প্রকাশনার পূর্ব্বে প্রতিমাসে পরমপূজনীয় বড়দাকে শুনিয়েছি। যাতে কোন কথার কোন বিকৃত ব্যাখ্যা না হ'তে পারে সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে তিনি দয়া ক'রে আমাকে প্রয়োজনমত সহায়তা করেছেন।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে হাউজারম্যানদার মা, প্রখ্যাত আইনবিদ্ ও প্রাক্তন সংসদ-সদস্য শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, গুরুপ্রেমী ভক্ত ও সাধক বেয়াসের সৎসঙ্গী ভাণ্ডারীদা প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা-ব্যপদেশে দয়াল ঠাকুর বহু সুগভীর চিরন্তন প্রশ্নের অভিনব, প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী সমাধান দান করেন। অবশ্য, ভিতর-বাইরের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথাই রত্নখচিত। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পরম স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিই বোধহয় এমন-তর অনুপম, অনবদ্য, অনন্য। আবার, ব্যক্তিগত জীবন থেকে সুরু ক'রে সমষ্টি-গত জীবন পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের কতরকম সমস্যার উপরই যে তিনি আলোকপাত করেছেন তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? তিনি ছিলেন আমাদের সাথের সাথী, ব্যথার ব্যথী। দুঃখদাবদগ্ধ সংসারে স্নেহকরুণ জননীর মত তিনি নিরন্তর আমাদের আগলে রাখতেন। তাঁর সর্ব্বব্যাপ্ত, নিখিলস্বার্থী, সক্রিয় প্রেমপ্লুত মধুময় দৈনন্দিন জীবনের এক অন্তরঙ্গ চিত্র মিলবে টুকরো-টুকরো বাস্তব ঘটনার ভিতর-দিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিভাবে বাণী দিতেন এবং বাণীগুলির ব্যাখ্যা কিভাবে করতেন, তারও কিছু নমুনা এই খণ্ডে পাওয়া যাবে।

আজ তাঁর মধুর মোহন স্মৃতির রোমন্থন করি আর চোখের জলে ভাসি। "পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা"—এ কথা আমাদের জীবনে একদিন আক্ষরিক সত্যে পরিণত হয়েছিল। আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম যাব-জ্জীবন তাঁকে এইভাবে নর-কলেবরেই পাব। কিন্তু হায়, তা' হবার নয়। তাই কাঙ্গাল নয়ন-মন-শ্রবণ আজ নিয়তই তাঁর স্পর্শের জন্য লালায়িত হ'য়ে ফেরে। সেই সঞ্জীবনী স্পর্শ আমরা অনুভব করি তাঁর পুণ্যলীলালসিত দৈনন্দিন বাণী ও কথোপকথনের ভিতর। তাঁর প্রাণ-পীযূষ সংহত হ'য়ে আছে এই শাশ্বত

সুধা-নির্ঝরের মধ্যে। তাই এগুলি আমাদের ধ্যানের ধন, উপভোগের সামগ্রী, উজ্জীবনের ঊর্জ্জীমন্ত্র।

পরমপূজনীয় বড়দার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বইখানি প্রকাশিত হ'ল। চির-প্রণম্য তিনি, তাঁকে আমার প্রাণের প্রণাম নিবেদন করি। প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত অমূল্যদা ও তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীবৃন্দ বিশেষতঃ প্রুফরীডার শ্রীমান কুমার-কৃষ্ণের আপ্রাণ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। প্রীতিভাজন সহ-কর্ম্মী শ্রীমান দেবীপ্রসাদ বিশেষ শ্রমসহকারে এই পুস্তকের সূচী প্রণয়ন ক'রে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি রচনাকালে মাঝে-মাঝে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী উমা দেবী, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মুক্তেন্দু ও কন্যা শ্রীমতী ফুল্লরার সাহায্য পেয়েছি। পরমপিতা সকলের মঙ্গল করুন। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৮
১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭২

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন-গ্রন্থ আলোচনা-প্রসঙ্গে। জনসমাদৃত এই গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। বর্ত্তমান একাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণটি পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-রূপে প্রকাশ করা হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
বৈশাখ, ১৩৯৫

প্রকাশক

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৪শে মাঘ, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ৭।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলঘরে বিছানার উপর ব'সে আছেন। হাউজারম্যানদা, তাঁর মা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রকাশদা (বসু) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

হাউজারম্যানদার মা কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ছেলেরা ভবিষ্যতে কেমন হ'লে আপনি সুখী হন ?

কেষ্টদা—আমি চাই যে তারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুসরণ ক'রে চলুক এবং তাদের দিয়ে সমাজের মঙ্গল হো'ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুরকে নয়, পরমপিতাকে।

মা—সেই কথাই ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-গুরু বা প্রেরিতপুরুষ মানুষের দৃষ্টি পরমপিতার দিকে আকৃষ্ট না করেন, তিনি প্রকৃত গুরু বা প্রেরিতপুরুষ নন।

মা—ঠাকুর যদি রে'-কে ভগবৎপথে চলতে সাহায্য করেন, তাহ'লেই আমি বুঝব যে রে ঠিক পথে উন্নতির দিকে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের প্রত্যেককে এ-বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। ভগবানের পথই তো একমাত্র পথ। জীবনের পথে যারা চলতে চায় তাদের ভগবানের পথে চলা ছাড়া উপায় নেই। ভগবানই জীবনের পথ ও পাথেয়।

মা—আপনার উপর লোকে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাই আপনার দায়িত্ব বড় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই না আমার উপর কেউ absolutely rely (নিঃশেষে নির্ভর) করে, আমি চাই ঈশ্বরে absolutely rely (নিঃশেষে নির্ভর) করে। তা' দেখলে আমি খুশী হই, তাতে আমার তাকে সাহায্য করা বেড়ে যায়, কমে না। If a patient likes cure and follows doctor conscientiously, it does good. (যদি কোন রোগী আরোগ্য কামনা করে, এবং ডাক্তারকে বিবেকসম্মতভাবে অনুসরণ করে, তাতে তার ভাল হয়)। তেমনি ভগবানের পথে অগ্রসর হবার জন্য আমি যাকে যা' করতে বলি, সে যদি তা' নিষ্ঠাসহকারে ক'রে চলে, তাতে তারও উপকার হয়, আমারও সুবিধা হয়। Willing active

obedience leads to quick progress. (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয় বাধ্যতা দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যায়)।

কেষ্টদা স্পেনসারদার অনুভূতি-সম্বন্ধে তাঁর মুখে যা' শুনেছেন, তা' বললেন। মা শুনে প্রীত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—A christian should first love Christ and through Him all the prophets, a Hindu should first love Krishna or the prophet he follows and through Him all other prophets. To love a prophet is to understand Him as He was. We must not distort His views according to our convenience. Again, to love Mary, one is to love Christ first. If one says "I love Mary, not Christ," it is to be doubted, if he loves Mary. (একজন খ্রীষ্টানের প্রথম যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে সব প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা উচিত। একজন হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে বা যে-প্রেরিতপুরুষকে সে অনুসরণ করে তাঁকে ভালবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য সব প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা উচিত। কোন প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসা মানে তিনি যেমন ছিলেন, সেইভাবে তাঁকে বোঝা। আমাদের সুবিধা-অনুযায়ী তাঁর মতের বিকৃত ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। আবার, মেরীমাতাকে ভালবাসতে গেলে প্রথমে যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসতে হয়। যদি কেউ বলে—যীশুকে নয়, আমি মা মেরীকে ভালবাসি, তাহ'লে সে মা মেরীকে ভালবাসে কিনা, তা' সন্দেহযোগ্য)।

কেষ্টদা—যদি কেউ তার নিজস্ব প্রেরিতপুরুষকে ভালবাসে, অথচ অন্য প্রেরিতপুরুষকে ভাল না বাসে, তাহ'লে তা' থেকে কী বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি কোন প্রেরিতপুরুষকে ঠিক-ঠিক ভালবাসে, তাহ'লে অন্য প্রেরিতপুরুষদের প্রতি তার ভালবাসা গজাতে বাধ্য। অন্ততঃ কারও সম্বন্ধে সে অসহনশীল ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হ'তে পারে না। তা' যদি হয়, তবে বুঝতে হবে তার ঐ ভালবাসার মধ্যে প্রবৃত্তির মিশেল আছে। অনেক সৎলোক শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাকর্ত্তাদের পাল্লায় প'ড়ে বিভ্রান্ত হয়। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা পরিবেষণ করার মত পাপ খুব কম আছে। তাই শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থের টীকাটিপ্পনী বা অজানা লোকদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না ক'রে বরং original (মূল) শাস্ত্র নিজের চেষ্টায় বুঝতে চেষ্টা করা ভাল। শাস্ত্র বুঝতে গেলে চাই ভাষার যথাযথ জ্ঞান এবং সশ্রদ্ধ, সংগতিশীল, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ক্যাথলিকদের ভালবাসেন না ?

মা—হ্যাঁ।

একটু পরে মা বললেন—প্রতি সপ্তাহে ক্যাথলিকরা ধর্ম্মযাজকের কাছে তাদের পাপের জন্য স্বীকারোক্তি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা কি ভাল ?

মা—অন্তরে অনুতপ্ত হ'য়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাটা আমি বেশী পছন্দ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেবেলায় আমি আপন মনে বলতাম, 'পরমপিতা আমি তোমার সন্তান, আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, শক্তিমান। আমি পাপ, তাপ, দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে। আমি জ্যোতির তনয়, অন্ধকার আমাকে স্পর্শও করতে পারে না।' যখন যেমন মন চায়, তখন তেমন বলতাম, যাতে আনন্দে বুক ভ'রে ওঠে, অন্তরে আশা, উদ্দীপনা, শক্তি ও সাহস জাগে। একজন বৈষ্ণব সাধু সেই কথা শুনে আমায় বলেছিলেন—ওভাবে বলো না, ওতে অহংকার হয়। বরং ব'লো —'আমি ঘোর পাপী। তুমি নিজগুণে দয়া ক'রে আমাকে উদ্ধার কর। তোমার দয়া ছাড়া আমার মত পাপীর আর কোন পথ নেই।' এই ধরণের আরো কত কাতরোক্তি। আমার সব ভাল ক'রে মনে পড়ে না। যাহো'ক, বৈষ্ণব সাধুর কথামত আমিও সেইভাবে রোজ বলতে সুরু করলাম। ক'দিন বলার পর মনটা black (কালো) হ'য়ে গেল, বুকের ভিতর একটা আনন্দের চাঁদ ডগমগ করত, তা' ভেঙ্গে গেল, লোকের ঘরে ঢুকলে মনে হ'তো—যদি আমাকে চোর মনে করে। পদে-পদে নিজেকে নিজের সন্দেহ, পদে-পদে আত্মধিক্কার। আমি যেন মহা-অপরাধী। যত ঐ সব বলছি ততই যেন তলিয়ে যাচ্ছি। ১৫ দিন ঐভাবে করলাম। করার ফলে আমি নিথর হ'য়ে উঠলাম। বুকের মধ্যে কি যেন অসহ্য যন্ত্রণা! বিকালে পদ্মার পাড়ে গেলাম। তখন সূর্য্য ডুবছে। জল লাল হ'য়ে উঠেছে। আগে এই সব দৃশ্য দেখলে মনটা স্ফূর্ত্তিতে নেচে উঠত। কিন্তু সেদিন মনে কোন সাড়া জাগল না। তখন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম—'পরমপিতা! আমি পাপী নই, আমি অধম নই, আমি দুর্ব্বল নই, আমি তোমারই সন্তান। তোমারই ভাবে ও স্বভাবে পুষ্ট আমি। তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্ব।' মনটাকে হাল্কা করার জন্য পরক্ষণে আবার পাগলের মত বললাম—'আমি ভুলবশে অন্যায় ক'রে থাকতে পারি, কিন্তু আমি তা' চাই না, আমি চাই তোমাকে। আমি তোমা বই জানি না।' মনের আবেগে অনেক কিছু বললাম! বলতে-বলতে আবার glow (দীপ্তি) ফুটে উঠলো। যেন বেঁচে গেলাম। পাপের কথা বেশী ভাবাও

ভাল না, বলাবলি করাও ভাল না। আর, তার আচরণ তো ভালই না। শরীর-মনকে otherwise (অন্যভাবে) engaged (ব্যাপৃত) রেখে গর্হিত চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের scope (সম্ভাবনা) সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলতে হয়। তৎসত্ত্বেও যদি বোঝ অন্যায় করেছ, shake it off (তা' ঝেড়ে ফেল), ignore (উপেক্ষা) কর, do the opposite and go on on the way of the Father (ন্যায় কাজ কর এবং পরমপিতার পথে এগিয়ে চল)। পরমপিতাকে নিয়ে যত মত্ত থাকবে, ততই শয়তানের নাগালের বাইরে চ'লে যাবে। যেন-তেন-প্রকারেণ positively (বাস্তবে) এইটি করা চাই। একই দোষ পুনঃ-পুনঃ করা আর তার জন্য পুনঃ-পুনঃ অনুতাপ করা—এমনতর চলতে থাকলে অনুতাপটা একটা মেকী ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। কোন বিষয়ে সত্যিকার অনুতাপ জাগলে মানুষ সে-পথে আর সহজে পা বাড়ায় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রাইষ্টের আমলে তাঁকে হয়তো খুব কম লোক জানত, তারপর whole Europe (সারা ইউরোপ) জানল, whole India (সারা ভারত) জানল, এশিয়ার অন্যান্য দেশ জানল, whole world (সারা জগৎ) জানল। ক্রমে-ক্রমে বেশী-বেশী লোক জানবে। He will be glowing fo ever (তিনি চিরকালের জন্য দীপ্তি পাবেন)। তিনি এক নূতন জীবনের message (বাণী) নিয়ে এসেছিলেন, তাই আজও তাঁর কথা শুনলে মানুষ আশা পায়, উৎসাহ পায়, আনন্দ পায়।······আমি ছোটবেলায় দেখেছি খ্রীষ্টানদের প্রতি অনেকের aversion (বিরূপভাব) ছিল, কিন্তু পরমপিতার দয়ায় সে-ভাবটা কেটে যাচ্ছে। আমার মনে হয় conversion-policy (ধর্ম্মান্তর-করণের নীতি) ক্রাইষ্টকে ভালবাসার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এমনিই মানুষ তাঁকে ভাল-ভাবে ভালবাসতে পারছে, প্রত্যেকের অন্তরের ভালবাসা কেড়ে নেবার মতই যে জীবন তাঁর।

হাউজারম্যানদা—অনেকে সৎসঙ্গী হ'য়ে যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসতে শিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো হওয়া উচিত।

হাউজারম্যানদার মা—কোন প্রেরিত পুরুষের অনুসরণকারী কিভাবে চললে অন্য সকলে ঐ প্রেরিত পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই তাঁর প্রতি normal plain love and regard (সহজ, সরল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা)। Hypocritic love (ভণ্ড ভালবাসা) ভাল নয়। আন্তরিক অনুরাগ থাকলে তার একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়। অপরেরও তা' ভাল লাগে। কোন মহাপুরুষের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকলে অন্যান্য

মহাপুরুষের প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গজায়। অপরকে খাটো করার প্রবৃত্তি হ'লে কথার মধ্যে তার ঢেকুর বেরোয়। ওতে আমার অনুরাগের পাত্র যিনি তিনিও প্রকারান্তরে অপরের কাছে সমালোচনার পাত্র হ'য়ে ওঠেন। ও-জিনিষ মোটেই ভাল নয়। যখনই বাবার কথা কই তখনই তার মধ্যে ঠাকুরদার প্রতি যেন normal ovation (স্বাভাবিক সম্মাননা) থাকে। ঠাকুরদাদাকে ছোট ক'রে যেমন বাবাকে বড় করা যায় না, কোন মহাপুরুষকে নিকৃষ্ট প্রমাণ ক'রে অন্য মহাপুরুষকে তেমনি উৎকৃষ্ট ব'লে প্রমাণ করা যায় না।

কেষ্টদা—সঙ্গ না করলে কি কারও ওপর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে হয়। বইয়ের ভিতর-দিয়ে হয়। লোকের মুখে শুনলে সুবিধা হয়। অবশ্য, সেই লোক যদি তাঁর lover (প্রেমিক) হয় তাহ'লে সব-চাইতে ভাল হয়। ভালবাসার ভিতর-দিয়ে যে-সঞ্চারণ হয় তা' অপরের মনেও ভালবাসা গজিয়ে তুলতে সাহায্য করে। মানুষ দেখে যে-লোকটি একজন মহা-পুরুষের কথা অনুরাগ ও আবেগের সঙ্গে বলছে, তার নিজের চলন-চরিত্রটি কেমন। তার চরিত্র যদি উন্নত ও সুন্দর হয়, সে যা' বলে যদি বাস্তবে তা' আচরণ করে তাহ'লে তার কথার প্রভূত দাম হয়। আচরণহীন কথার মধ্যে শক্তি থাকে না। বিশ্বাসের জেল্লা থাকে না। প্রকৃত বিশ্বাসী মানুষ তার বিশ্বাসের জোরে অপরের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে পারে।

হাউজারম্যানদার মা—একজন অ্যামেরিকান আপনাকে ভালবাসল। সে আমেরিকায় গেল। সেখানে গিয়ে সে যদি আমেরিকার জীবনধারার প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে খারাপ দেখে এবং তার সমালোচনা করে তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে আপনার কি পরিচয় লোকে পাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐভাবে মানুষের ভাবের ব্যাঘাত করা ঠিক নয়। ওতে নিজের ও অপরের ক্ষতি হয়।

মা—কিন্তু কেউ-কেউ আপনার প্রতি সাচ্চা ভালবাসা নিয়েই এটা ক'রে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর— It may be honest love but not wise love (এই ভালবাসা সৎ ও সাধু হ'তে পারে কিন্তু তা' জ্ঞানদীপ্ত নয়)।

মা—তার কিভাবে চলা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেলে আছে, Be a Roman in Rome (রোমে একজন রোমবাসী হও)। আমি যদি এদেশে যীশুখ্রীষ্টের কথা বলি এবং বাইবেলে নেই ব'লে কেষ্টঠাকুর, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব ইত্যাদিকে নস্যাৎ ক'রে দিই তাহ'লে আমার মুখে কি কেউ যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনতে চাইবে ? বরং আমি

যদি বলি ক্রাইষ্ট প্রত্যেক ভাগবত পুরুষকে বিশেষতঃ পূর্ব্ববতনদের মান্য করার কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন "I am come to fulfil and not to destroy." (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)—তখন লোকে আমাকে বলবে "এস এস বোস"। তোমার ভালবাসা যদি কারও ভালবাসাকে wound (আঘাত) করে, তোমার ভালবাসা ভালবাসা পাবে না। If your love does not revere one's love, your love will not be loved (যদি তোমার ভালবাসা অপরের ভালবাসাকে শ্রদ্ধা না করে তাহ'লে তোমার ভালবাসা, ভালবাসা পাবে না।)

একটি দাদা আমাদের কোন একজন চিকিৎসকের অনমনীয় মনোভাবের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অভিযোগ জানাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Apathy to listen and consult is not the sign of a good physician. (অপরের কথা শোনা এবং অপরের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রতি বিমুখতা সুচিকিৎসকের লক্ষণ নয়)। মানুষ যত অহঙ্কারী হয়, যত একগুঁয়ে হয়, ততই সে dull (বোকা) হ'য়ে যায়। Receptive (গ্রহণমুখর) না থাকলে মানুষের জ্ঞান বাড়ে না। অপরের কথা শুনতে হবে ব'লে প্রত্যেকের প্রত্যেক কথাই মেনে নিতে হবে এবং নিজের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করতে হবে এমন কোন কথা নয়। যদি কেউ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলে এবং তা' যদি আমার উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে সহায়ক হয় তা' আমি সানন্দে গ্রহণ করবই—সে-মানুষটা যতই ছোট হোক না কেন। কা'রও কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারলেও মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে বলতে হয়—মনে আঘাত না দিয়ে। যে যত inferiority complex (হীনমন্যতা) থেকে মুক্ত হয় সে ততই জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Propaganda work (প্রচার-কাজ) কথাটার থেকে propagation work (বিস্তার-কাজ) কথাটা আমার ভাল লাগে। Propaganda (প্রচার) কথাটার মধ্যে যেন sanctity (পবিত্রতা) কম!

হাউজারম্যানদার মা ইষ্টভৃতির মূল তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে জানতে চাইলে শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্ষেপে বললেন—To earn and spend to serve the Love is to materialise love with every potentising ability. (নিজে উপায় করে প্রেষ্ঠের সেবার জন্য তা ব্যয় করলে প্রেষ্ঠের প্রতি নিজের ভালবাসা শক্তি-সম্বর্দ্ধনী যোগ্যতায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে)। যার জন্য নিঃস্বার্থভাবে যত করা যায় তার প্রতি ভালবাসাও তত বাড়ে। যার প্রতি আমাদের ভালবাসা বাড়ে ধীরে-ধীরে তাঁর চরিত্রগত গুণাবলী আমাদের মধ্যে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ফুটে উঠতে থাকে,

এইটেই হ'লো শ্রেয়ের প্রতি ভালবাসার মস্ত লাভ। প্রিয়পরমকে যদি আমরা নিজের জন্য ভাঙাই তবে তা'তে আমাদের স্বার্থপরতা বাড়ে। এবং ঐ স্বার্থপরতাই আমাদের পঙ্গু ও অন্ধ ক'রে ফেলে। আমাদের যোগ্যতা দিন-দিন তলিয়ে যেতে থাকে। আর, প্রিয়পরমের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ করলে আমাদের প্রবৃত্তি-অভিভূতি কমে। আমাদের স্বার্থবোধ enlarged (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়। তখন সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়। আমরা চলার রাস্তা ঠিক পাই। Environment (পরিবেশ)-কে ignore (অবজ্ঞা) করার পরিবর্ত্তে help (সাহায্য) করার বুদ্ধি হয়। এইভাবে পাওয়ার পথ খুলে যায়।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—মহাপুরুষের আদেশ কোনক্ষেত্রেই কি অমান্য করা চলে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ovational denying of the command of the Lord only to preserve His life and progress is blessed and God smiles thereto (একমাত্র প্রভুর জীবনরক্ষার্থে এবং তাঁর উন্নতিকল্পে তাঁর আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য না করা পুণ্য-জনক এবং ভগবান এটা দেখে হাসেন)। আমার মনে হয় যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁর প্রতিরোধহীন হওয়ার আদেশ অমান্য ক'রে যদি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন তাহ'লে ভাল হ'ত। প্রভুর জীবন রক্ষার জন্য তাঁর আদেশ অমান্য করলে দোষ হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজক-সম্প্রদায়ের, পুরোহিত-সম্প্রদায়ের চরিত্রের উপর ধর্ম্মের উত্থান-পতন অনেকখানি নির্ভর করে। তাদের কাজ হ'লো to earn man for Lord through service (সেবার মাধ্যমে প্রভুর জন্য লোক-সংগ্রহ করা)। কিন্তু তা' ভুলে গিয়ে তারা যখন at the cost of men (মানুষের বিনিময়ে) money earn (অর্থ উপায়) করতে চায় তখনই ধর্ম্মের প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ক্রাইষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন—"Come unto me and I shall make you fishers of men" (তোমরা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের মানুষ ধরার ধীবর করব)। প্রভুপ্রীতিপ্রবুদ্ধ লোকসেবা ও লোক-সংগ্রহের নেশা যখন ধর্ম্ম-যাজকদের জীবন থেকে বিদায় নেয়, তখন তারা মানুষকে উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ ও উন্নত ক'রে তোলার প্রেরণা ও শক্তি হারিয়ে ফেলে।

রাত অনেক হ'য়ে গেছে। এরপর সবাই বিদায় নিলেন।

২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।২।১৯৪৮)

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর সামনের দিকের

বারান্দায় ব'সে আছেন। এমন সময় ভবানীপুরের নরেনদা (দত্ত) বৃহদারণ্যক উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝতে আসলেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রহ্ম হলেন অখণ্ড ও সর্ব্বাত্মক। তাঁর বাইরে কিছু নেই। যেখানে যা'-কিছু আছে, সব ব্রহ্মের মধ্যেই আছে। তাই, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কিছুই অজানা থাকে না। আর, সব জানাগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি হয়। কোন জানার সঙ্গে কোন জানার বিরোধ থাকে না। ব্রহ্মকে জানতে গেলে চাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে ভালবাসা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হলেন সম্যক্‌দর্শী ও সর্ব্বদর্শী, তাই তিনি সর্ব্বস্বার্থী ও সমদর্শীও বটে। সমদর্শী ব'লে যে তিনি সবার জন্য এক ব্যবস্থা করেন, তা' কিন্তু নয়। যার সত্তাসঙ্গত বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের জন্য যেমন ক'রে যা' করা লাগে তেমন ক'রে তা' করেন। তাই ব্যষ্টিরও জীবনদাঁড়া যেমন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, সমষ্টিরও জীবনদাঁড়া তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। তাঁর কাছে সকলেরই সমীচীন স্থান আছে। আবার, তাঁকে যে ভালবাসে সে সকলকে ভালবাসে। এইভাবে তাঁকে অবলম্বন ক'রে পরস্পর-পরস্পরের অস্তিত্বের পরিপোষক হ'য়ে ওঠে। তাই, ব্রহ্ম ছাড়া যেমন আমাদের অস্তিত্বের উদ্ভব হ'তে পারে না, তেমনি ব্রহ্ম ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব টিকতেও পারে না। তিনি সর্ব্বাশ্রয়। ব্রহ্মবিৎই আমাদের কাছে ব্রহ্ম। তাই আছে—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।'

নরেনদা—ব্রহ্মজ্ঞানই যখন মানুষের চরমকাম্য, তখন আমরা ঘরসংসারের ঝামেলার মধ্যে যাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন-কিছুই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায় হয় না, যদি তা' ইষ্টার্থে হয়। আবার, সাধন-ভজনও ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায় হ'তে পারে যদি তা' নিজ খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য হয়। There may be different purposes, in different spheres of life but all of them must lead to the fulfilment of the principle alone. (জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে-সবগুলির একমাত্র আদর্শকেই পরিপূরণ করা চাই)। জীবনের বিভিন্নতাকে একমুখী ও এককেন্দ্রিক না করতে পারলে জ্ঞান সংহত হয় না। বিচিত্র বিভিন্নতা যদি এক-এ সার্থকতালাভ করে, তা'তে জ্ঞান সমৃদ্ধতর হয়। ওতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। তাই, আমার মনে হয় দায়িত্ব ও কাজকর্ম্ম যত বাড়ে, তত ভাল। ওতে বোধ বাড়ে, ক্ষমতা বাড়ে। যে সানন্দে দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়, তার কাছে বাধা অতিক্রম ক'রে দায়িত্ব পালন করাটা খেলার মত স্ফূর্ত্তিজনক মনে হয়। তার পারগতা বেড়ে যায়। যে কর্ম্মকুণ্ঠাবশতঃ

দায়িত্ব এড়াতে চায়, তার কাছে নিজের বেঁচে থাকার দায়িত্ব এবং করণীয়ও দুর্ব্বহ মনে হয়; এবং এড়িয়ে যাবার বুদ্ধি থাকার দরুন ঐ সামান্য কাজটাকেও সে হয়তো তার বোধমর্ম্মে ইষ্টার্থসার্থকতায় সুসঙ্গত ক'রে তুলতে পারে না। এতে তার mental life (মানসিক জীবন) bifurcated (দ্বিধাবিভক্ত) হ'য়ে যায়। সংহত জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আর হ'য়ে ওঠে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলেই চাই concentric unification of all factors of life (জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সুকেন্দ্রিক একীকরণ)।

একটি মা বললেন—আমার যেন শান্তি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব নাম করিস্। সবাইকে যত ভালবাসবি, সবার যত ভাল করবি, তত শান্তি পাবি।

৩০শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩৷২৷১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় এসে একখানি ইজিচেয়ারে বসেছেন। যোগেনদা (ব্যানার্জী), সুধীরদা (সাহা), যতীনদা (দত্ত) প্রভৃতি কাছে আছেন।

সুধীরদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল বর্ম্মার স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব ভারতীয়দের প্রতি খুব সম্প্রীতিমূলক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আবার তোমাদের উপর নির্ভর করে। মানুষের ধর্ম্মীয় ভাবকে উস্কে দেওয়া লাগে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সবাই পরস্পর ভাই-ভাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল যাতে হয় তাই করা লাগে, হিন্দু যা'তে আরও ভাল হিন্দু হয়, বৌদ্ধ যা'তে আরও ভাল বৌদ্ধ হয়, জৈন যা'তে আরও ভাল জৈন হয় তাই করবে। আমরা পরমপিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপরকে যত আপন ক'রে নিতে পারি, অপরেও আমাদের প্রতি তত বন্ধুভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে। ভারতবাসীরা হলো বুদ্ধদেবের দেশের মানুষ। তাদের আচরণ যদি সুসংগত হয় তাহ'লে বৌদ্ধরা—তারা যে-দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন, তাদের শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না।

ছেলেপেলেদের চরিত্র কিভাবে সুগঠিত হয় এবং যোগ্যতা কিভাবে বাড়ে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-বাবার উপর ভক্তি যাতে বাড়ে তাই করা লাগে। ছাওয়াল, পাওয়াল নিত্য মা-বাবাকে দেবে। বেশী-বেশী ক'রে দেবে। ওতে energy (শক্তি) বেড়ে যায়। পিতৃতর্পণ ব'লে একটা জিনিষ আছে। তার মানে নিজের

ব্যবহার দিয়ে, সেবা দিয়ে, উৎসর্গ দিয়ে পিতামাতাকে তৃপ্তি দেওয়া, আনন্দ দেওয়া। তাঁদের জীবদ্দশায় যেমন এই সব করতে হয়, তাঁরা গত হ'লেও তেমনি তাঁদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁদের মনোজ্ঞ চলনে চলতে হয়। শুধু মন্ত্রপাঠ ক'রে তিলজল উৎসর্গ করলাম তা'তে কিন্তু তর্পণ হয় না। পিতামাতার প্রতি যাদের ভক্তি থাকে তাদের ভাল হয়ই। পিতামাতার প্রতি ভক্তি থাকলে ভ্রাতৃবিরোধ আসে না। ভাই-বোনের মধ্যে তারা মাতাপিতার মূর্ত্তিই যেন দেখতে পায়। তাই, পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। ভাই-বোনের প্রতি যাদের টান থাকে বৃহত্তর পরিবেশের প্রতিও তাদের টান হয়।

সুধীরদা—অদৃষ্ট কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কর্ম্মফল যা' তোমার দৃষ্টির বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তা'ই তোমার অদৃষ্ট। তুমি যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও তাহ'লে খারাপ কর্ম্মফলও তোমার বিশেষ কিছু খারাপ করতে পারে না। কারণ, যে-অবস্থাই আসুক তুমি তারই ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধান ক'রে তাকে শুভ-সন্দীপী ক'রে তুলতে পার। আবার, সুখ-শান্তি পেলে তাতেও তুমি বদ্ধ হ'য়ে পড় না। কারণ, সব অবস্থায় তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলা।

যোগেনদা নির্জ্জন সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বললেন—আমার ইচ্ছা করে যে সবসময় ওতেই ডুবে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধন-ভজন যেমন লাগে তেমনি লাগে activity (কর্ম্ম)। ইষ্টপ্রীতিকল্পে মানুষের জন্য খুব করতে হয়। নইলে মানুষ স্বার্থপর হ'য়ে পড়ে, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ে, অলস হ'য়ে পড়ে, আত্মসুখী হ'য়ে পড়ে। চাই cheering nurture to people (লোকের আনন্দদায়ক সম্পোষণা)। আপনারা যদি মানুষকে টেনে না তোলেন তাহ'লে মানুষের উপায় হবে কি? Active demonstration (সক্রিয় অভিব্যক্তি) ছাড়া character (চরিত্র)-এর মানে হয় না। আপনার ভগবৎপ্রীতির manifestation (প্রকাশ) হওয়া চাই লোকসেবায়, ধর্ম্ম-দানে। এইটে বাদ দিয়ে ভগবৎপ্রীতি সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এটা করতেন, ওটা করতেন, কিন্তু কেন কী করতেন, তার meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) আমরা খুঁজে পাই না। যদি চোখ থাকে তাহ'লে দেখতে পাব তাঁর সব-কিছু করার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সপরিবেশ লোককল্যাণ। সাধক যে তারও এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধনা-সম্বন্ধে ভুল ধারণাই আমাদের পরিবেশ-সম্বন্ধে উদাসীন ক'রে তোলে। আপনারা বড় হ'য়ে না উঠলে আমার কোন লাভ নেই। আমি

চাই পরমপিতাকে নিয়ে আপনারা সবার মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ুন। ভগবান যেমন দয়ী, ভক্তও তেমনি দয়ী। সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে যা'তে সকলকে রক্ষা করতে পারে। প্রত্যেকের প্রাণে পরমপিতার উপর অনুরাগ গজিয়ে দিন। তাই মানুষকে পরিপোষণ করবে, শক্তি দেবে, বড় ক'রে তুলবে। আমি জ্যোতিঃ দেখলাম, শব্দ শুনলাম, তা'তে কার কী এসে গেল যদি সেগুলি তাদের উন্নত ধরণের সেবা না দিল, অন্ততঃ ন্যস্ত না করল সেই পথে যা'তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আলিঙ্গনে তারা সার্থক হতে পারে। বিদ্যা দান করলে যেমন তা'তে বিদ্যা বাড়ে ছাড়া কমে না, ধর্ম্ম দান করলেও তেমনি তা' বাড়ে ছাড়া কমে না। পরমপিতার কাছে তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানই অতি প্রিয়। তাদের উন্নতির জন্য আপ্রাণ করলে পরমপিতা পরিতুষ্ট হন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা পরমপিতা ও পরিবেশের সেবা ক'রে নিজেরাই ধন্য হই। ধন্য করছি এই বোধ থাকলে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ হয়।

যোগেনদা—সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বড় কষ্ট পেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বরাবর থাকবে। Surrender (আত্ম-সমর্পণ) ঠিক থাকলে, ওতে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ফাঁকতালে আপনার জ্ঞান বাড়বে। দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে ভাল এবং মন্দ দুটোকেই ভাল ক'রে চিনতে পারবেন। ইষ্টের উপর টান থাকলে খারাপ কোন-কিছু আচরণ করবেন না। আপনি হয়তো কামশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হ'তে পারেন, একটা ছোটখাট হ্যাভলক এলিসও হ'তে পারেন, কিন্তু কাম-আচরণের বেলায় ধর্ম্মানুমোদিত কামের সীমারেখা লঙ্ঘন করবেন না। ভাল-মন্দ কোনসম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকা ভাল না। তা'তে ভুলবশে বা প্রতারিত হ'য়ে কেউ খারাপ কোন কিছুতে submerged (মগ্ন) বা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে যেতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান মানে ভালমন্দ সব-কিছুকে এমন analytically ও synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-সহকারে) জানা যা'তে সবটাকেই মঙ্গল-প্রসূ ক'রে তোলা যায়। চলার রকমটাকেই ঐ-মুখী ক'রে ফেলতে হয়।

দক্ষিণাদা—খুব শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত্যন্ত সহজ, তাই অত্যন্ত শক্ত।

যোগেনদা—ইচ্ছাশক্তির অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনিচ্ছাটা এত এস্তামাল করেছি যে যা' পারি তাও করতে অস্বীকার করি। কঠিনও না, অসম্ভবও না। অপারগ কেউ আছে তাও মনে হয় না।

যোগেনদা—আপনি আপনার স্তর থেকে বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার করাগুলির experience (অভিজ্ঞতা) থেকে তো বলছি।

যতীনদা (দত্ত)—যে-কোন মানুষকে লহমায় আপন ক'রে নেওয়া যায় কি-ভাবে তাই ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পীরিতপাগলা মানুষ যদি হও, ভাববে, করবে, পারবে। যদি slave mentality (দাস-মনোবৃত্তি)-তে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে যেয়ে থাক, তাহ'লে অসম্ভব মনে করবে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এতখানি শক্তি আছে যে, সে যে-কোন কাজ করতে পারে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে বললেন—আমি সুধীরকে কই—কাঠের কারখানাটা যা'তে ভাল ক'রে করতে পারি, তেমন কয়েকটা যন্ত্রপাতি আমাকে এনে দে। তাড়াতাড়ি চাই একটা 'ভার্টিক্যাল স' ও একটা 'হরাইজণ্টাল্ স'।

সুধীরদা (সাহা) বললেন—দয়াল! আমি যাবার আগে ভাল ক'রে শুনে যাব।

১লা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী), সুধীরদা (সাহা), যতীনদা (দত্ত), রাজকুমারদা (শীল) প্রভৃতি কাছে উপস্থিত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী এমন জিনিষ যে এর একটু অপলাপ হ'লেই বোঝা যায়! হরেন ভদ্র একবার স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অন্য কাজে খরচ করেছিল, হঠাৎ তার হাঁটুটা ভেঙ্গে গেল, টাকা যত পূরণ করতে থাকল, তত হাঁটুর অবস্থা ভাল হতে লাগল। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও বাস্তবে এতখানি ক্ষতির কারণ সৃষ্টি হয়ই। তাই, বুঝে চলা লাগে। এর থেকে জীবনে কোনমতে কিছুতেই বিচ্যুত হ'তে নেই।

প্রফুল্ল—ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী যারা না করে, তাদেরও তো বেশ দিন চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে ইষ্টের পথে চলে, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী যারা অনুরাগের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে পালন ক'রে চলে, তারা প্রতিদিন একটা vital elatement (জীবনীয় আনন্দ) ও vital ecstasy (জীবনীয় উচ্ছ্বাস)-এর যোগান পায়, কারণ, নাম, নামী ও ইষ্টীচলনের মধ্যেই আছে সত্তার রসদ। যারা এ-সবের ধার ধারে না, তারা ও-থেকে অতখানি বঞ্চিত হয়, ঐগুলি করার ভিতর-দিয়ে যা' পাবার তা' তারা

পায় না। তাদের হয় চলতি চলন। আত্মবিশ্লেষণী ও আত্মশোধনী কোন মানদণ্ড তাদের হাতে থাকে না। তাই, তাদের চলাটা হয় অন্ধের মতন। Suffer (কষ্টভোগ)-ও করে তেমনি। অবশ্য, ইষ্টপথে যারা চলে, তারাও কর্ম্মফল-অনুষায়ী কষ্ট পেয়ে থাকে। কিন্তু আত্মবিচার ও আত্মশোধনের বুদ্ধি থাকায় ক্রমাগত নিজেদের চিন্তা, চলন, বাক্য ও কর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে। এতে দুর্ভোগের কারণ ধীরে-ধীরে অপসারিত হয়।

আমি একদিন পেঁয়াজ খাওয়ার ফলে আমার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর হ'য়ে গেল। তখন মনে হ'লো, যেই খায়, তারই তো এই অবস্থা হয়, অভ্যস্ত হ'বার জন্য হয়তো ঠিক পায় না। ফল যা হ'বার তা' হয়ই। অবশ্যকরণীয় ভাল কিছু করা বা না-করার ফলও যা' হবার তা' হয়ই।

সুধীরদা—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি, ধনাদ্ধর্ম্মঃ ততো সুখম্'

—এই শ্লোকের সঠিক তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হ'লে মানুষের ভিতর আরো-আরো জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রবল হয়, তখন জানার ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার তার থাকে না, কারণ, ঐ ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার থাকলে তার জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। সে বিনম্র হ'য়ে উন্মুখ হ'য়ে ক্রমাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রে চলে। এই receptive mood (গ্রহণমুখর মনোভাব) থাকলে মানুষ উপযুক্ত receptacle (পাত্র) হ'য়ে ওঠে। সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আধার হ'য়ে ওঠে। আর, তারই proper application (বিহিত প্রয়োগ)-এর ফলে সে হয় ধনের অধিকারী। ধন হ'লো major symbol of service (সেবার প্রধান প্রতীক)। যার জ্ঞান যত বেশী থাকে, সে পরিবেশকে তত ব্যাপক ও গভীর-ভাবে সেবা দিতে পারে। করা যার যত পরিবেশের প্রয়োজনপূরণী হয়, পায়ও সে তত বেশী। প্রাপ্ত ধন-সম্পদের সত্তাপোষণী ব্যবহার যে যেমন করতে পারে, তার জীবনে ধর্ম্ম তেমন সজীল হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়া। ধন থাকলেই যে ধর্ম্ম হবে, তার কোন মানে নেই। ধনকে যে সত্তাপোষণে লাগাতে পারে, ধন তার জীবনেই ধর্ম্মের কারণ হয়। আর, তা' থেকেই হয় সুখের উৎপত্তি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কর্ম্মী যারা হবে, তাদের প্রধান গুণ হ'লো unrepelling adherence (অচ্যুত অনুরাগ)। তা' না থাকলে কখনও এগোয়, কখনও পিছোয়। মনের তীব্রতা নিয়ে আজীবন সক্রিয়ভাবে লেগে

থাকতে পারে না। ভিতরে কোনরকমের প্রত্যাশা থাকলে, ইষ্টসেবায় বিঘ্ন হবেই। যার যে-ধরণের চাওয়াই থাক, তা' frustrated (ব্যর্থ) হ'লে চলনাটা নড়বড়ে হ'য়ে ওঠে। অবশ্য, ভিতরে সত্যিকার টান থাকলে ভক্ত নিজেকেই নিজে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নেয়। নইলে কেউ-কেউ ছিটকে যায়। বুদ্ধদেবের ৫ জন শিষ্য ছিল। শুনেছি, তারা নাকি বুদ্ধদেবকে অতিকৃচ্ছ্রতা ত্যাগ ক'রে মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে চলতে দেখায় তাঁর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। তারা বুদ্ধদেবকে ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চ'লে যায়। বুদ্ধদেব পরে এসে তাদের ধরেন সারনাথে। এবং তাদের নিয়েই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তারা হয়তো বুদ্ধদেবের চলনার তাৎপর্য্য ঠিকভাবে বুঝতে না পারার দরুন তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এবং পরে বুদ্ধদেব নিজেই সব প্রশ্নের সমাধান ক'রে দেওয়ায়, তাদের প্রশ্নের নিরসন হয়েছিল। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, তাদের ভক্তিবিশ্বাসে কিছুটা গোল ছিল। আমি এ-কথা বলি না যে, গুরুর কোন আচরণের অর্থ বুঝতে না-পারাটা বা তা' বুঝতে চাওয়াটা অন্যায়। বরং কোন বিষয় না বুঝেও বোঝার ভান করাটা অন্যায়। কিন্তু গুরুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়া চাই-ই কি চাই। এ থেকেই আসে তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে নিজের ক'রে নেওয়া। এটা শুধু বুদ্ধির ব্যাপার নয়, এতে being (সত্তা)-টা-ই transformed (পরিবর্ত্তিত) হয়। তাতে infusion (সঞ্চারণা) ভাল হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের সম্বন্ধে প্রশংসনীয় এই যে তারা convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হ'বার পর কিন্তু আর আগুপিছু করেনি। আপ্রাণ চেষ্টায় আদর্শ-সঞ্চারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তা'তে বহুলোকে বুদ্ধদেবকে জানবার ও অনুসরণ করবার সুযোগ পেয়েছে। আমরা যে আমাদের করণীয় করছি না, এতে environment (পরিবেশ)-কে suffering (দুর্ভোগ)-এর মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি। এটা আমাদের পক্ষে গুরুতর অন্যায় হচ্ছে। না করার দরুন পরমপিতার অবদানের মূল্য আমরাও বুঝতে পারছি না, লোক-জীবনও বঞ্চিত হচ্ছে। তাই চাই ভালমতন organisation (সংগঠন)।

যোগেনদা—Organisation (সংগঠন) মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organisation মানে to set up everybody at work to serve and fulfil the Ideal and principle. (সংগঠন মানে প্রত্যেকটি মানুষকে ইষ্ট ও তাঁর নীতির সেবা ও পরিপূরণে কর্ম্মব্যাপৃত ক'রে তোলা)। প্রত্যেককে কাজে লাগাতে হবে তার বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হ'য়ে যদি কাজ করে, তাহ'লে দেখা যায় সমবেত চেষ্টায় বিরাট কাজ হ'য়ে যায়। একজনে যেটা পারে না, আর একজনে সেটা পারে,

এইভাবে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে ওঠে। Organisation (সংগঠন)-এর best example (উত্তম দৃষ্টান্ত) হ'লো আমাদের শরীর। Our organs serve one another to keep up the existence of the organism and help themselves to exist. (শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীরের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরকে সেবা করে এবং এইভাবে তারা নিজেরাও টিকে থাকে)। এমনটা হয় ব'লে তারা normally inter-interested (স্বভাবতঃ পরস্পর-স্বার্থান্বিত) হয়। আপনার চোখে একটা কুটো পড়লে তৎক্ষণাৎ দরদের সঙ্গে হাতখানা সেখানে এগিয়ে যায়। পা কয়—কোথায় নিয়ে যাবি চল্—চল্ ডাক্তারের কাছে। একেই বলে organisation (সংগঠন)। ইষ্ট-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ জাগলে ইষ্ট, ইষ্টপরিবার, ইষ্টভ্রাতা—সকলেরই দুঃখকষ্ট দূর করার দুরন্ত প্রচেষ্টা জাগে। এটা ভক্তিরই একটা রূপ। Organisation (সংগঠন) মানে সপরিবেশ ভক্তির পথে চলা, সেবার পথে চলা, যাজনের পথে চলা। সেবা করতে গিয়ে দেখতে হবে যাতে কেউ তার ফলে পঙ্গু হ'য়ে না পড়ে। মানুষ সুবিধা পেলে exert (চেষ্টা) করতে চায় না। ওতে প্রশ্রয় দিলে লোকের ক্ষতি হয়। আমি জেনেশুনেও অনেক সময় ঐ দোষ ক'রে ফেলি। কেউ মুখ কাঁচুমাচু ক'রে এসে দাঁড়ালে সব ভুলে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাজেনদা (মজুমদার)-কে লক্ষ্য ক'রে বললেন—তোমরা প্রত্যেককে ভালবাসবে, সেবা দেবে, কিন্তু নজর রাখবে যাতে কারও সামর্থ্য ও যোগ্যতা নষ্ট না হয়।

রাজেনদা—কিভাবে তা' করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে স্বার্থপর হ'য়ে থাকবে না, অপরকেও স্বার্থপর হ'য়ে থাকতে দেবে না। যার জন্য বাস্তবে যতখানি করতে পার, করবে। অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখে উদাসীন থাকার রেওয়াজ যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন ইষ্টপ্রাণতা, সঙ্ঘশক্তি বা সংহতির জাগরণ হবে না। শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখালেও চলবে না। Active responsibility (সক্রিয় দায়িত্ব) নিতে হবে। এই সেবা আবার হওয়া চাই ইষ্টপ্রাণ সেবা, যা'তে সেবার অহংকার না আসে। তুমি যাকে সেবা করবে তার কাছ থেকে তোমার নিজের জন্য সাধ্যমত কিছু চাইবে না, কিন্তু অপরের জন্য তার কাছে চাইবে। প্রত্যেককে দিয়ে প্রত্যেকের জন্য করাবে। তাতে প্রত্যেকেই বেড়ে উঠবে।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আসলেন।

তিনি প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে উপবেশন করলেন। পরে দেশের

অবস্থা, বিশেষ ক'রে হিন্দুসমাজের দুরবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—প্রথম কথা হ'লো ধর্ম্মদান। মানুষ যদি মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে না ওঠে, তাহ'লে শুধু আলোচনায় কিছু হবে না। প্রত্যেকটি মানুষেরই ভিতর আছে বড় হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। প্রকৃত বড় যিনি, Divine man (ভাগবত-মানুষ) যিনি, তাঁকে ধ'রেই বড় হ'তে হয়। তাই, প্রথম জিনিষ হ'লো Realised man (অনুভূতিবান মানুষ)-এর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষার অনুশীলন করতে করতে মানুষের উন্নতির পথ খুলে যায়। দীক্ষা নিয়ে যেমন তপ করতে হয়, তেমনি কাজ করতে হয়, মানুষকে service (সেবা) দিতে হয়। আর চাই ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির এন্তার যাজন বা ধর্ম্মদান। Spiritual ও cultural revival (আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত পুনর্জাগরণ) হ'লে ওর সঙ্গে-সঙ্গে আর সব-কিছু আসবে। Material progress (ভৌতিক উন্নতি) যদি আমরা চাই, তাও ওর ভিতর-দিয়ে ছাড়া হবে না। শক্তিকে জাগাতে গেলে ভক্তিকে জাগাতে হবে। নিজে বাঁচতে গেলে ইষ্ট ও পরিবেশকে বাঁচাতে হবে। আমি বলি, মরো না, মেরো না, যদি পার মরণকে মার।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনার ভক্তগণ আপনাকে অনুসরণ করতে বলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা'র কি কোন প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে ভালবেসে যদি কেউ উপকৃত হয়, তা'তে আমি বাধা দিতে চাই না এবং বাধা দেওয়াও সমীচীন নয়। কিন্তু আমি চাই যে প্রত্যেকে Lord (প্রভু)-কে ভালবাসুক, তাঁর পথে চলুক সবাই।

দেশের সামরিক শক্তি কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত সেই-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেহে যেমন রক্তের লোহিত কণিকা থাকে, তেমনি থাকে রক্তের শ্বেত কণিকা। শ্বেত কণিকার কাজ হ'লো বহিরাগত বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করা। এটা হ'লো প্রকৃতিরই আত্ম-সংরক্ষণী ব্যবস্থাপনা। তাই defence force (প্রতিরক্ষার শক্তি)-কে খুব strong (শক্তিশালী) করাই যুক্তিযুক্ত। কখন কোন্ দিক থেকে বিপদ আসতে পারে, তা' বলা যায় না। তাই, সব দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকা লাগে।

২রা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৫।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর আমগাছতলায় এসে বসেছেন। আজ সরস্বতী পূজা, এই উপলক্ষ্যে কলকাতা ও বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে এসেছেন। তাঁরা সবাই ব্যক্তিগত সমস্যাদির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করছেন।

কলকাতা থেকে আগত একটি দাদা বললেন—ঠাকুর! আপনার উপর যেন আজীবন আমার অকাট্য বিশ্বাস বজায় থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমগাছটাকে তুমি কাঁঠালগাছ বল না। ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে তুমি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কর, সে-সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন থাকে না।

উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ।
যথাসময় ইষ্ট-নিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

—এই কটা কথা মনে রেখে গেঁজেলের মত লেগে যাও। যত কষ্টই হো'ক, যা' করণীয়, তা' করা থেকে কখনও বিরত থেকো না। বিহিত কর্ম্মের মত অতো বড় শিক্ষক আর হয় না। করার ভিতর-দিয়ে যে বোধ-বিশ্বাসের উদয় হয়, তা' বড় নাছোড়বান্দা। অপরের উল্টো যাজনে তা' টলে না। আমি তোমার জন্য যা' করি না কেন, তা' তোমার সম্পদ নয়। তুমি আমার জন্য যা' কর, তাই-ই তোমার সম্পদ। তোমার টানই তোমার অস্তিত্বকে অটল-ভাবে ধ'রে রাখবে।

উক্ত দাদা—এটা বুঝি যে সাধন-তপস্যা করার ভিতর-দিয়ে অনুভূতি ও উপলব্ধি হ'লে আর কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভূতি-উপলব্ধির লোভ ক'রো না, লোভ ক'রো তাঁকে ভালবাসার। তা' থেকে যা' আসার তা' আসবে। সতী স্ত্রী সতীত্বের পুণ্যের কথা স্মরণ ক'রে স্বামীকে ভালবাসে না। সে স্বামীকে বাদ দিয়ে নিজ অস্তিত্বের কোন সার্থকতা খুঁজে পায় না, তাই স্বামীর সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে ভাবে। তাকে দিয়ে স্বামীর সুখ-সুবিধা যতটুকু হয়, ততটুকুই সে নিজেকে সার্থক মনে করে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Self-conceited devoutness is ever blind to protect and nurture the Lord. (দাম্ভিক ভক্তি সর্ব্বদা প্রভুর সংরক্ষণ ও পোষণে অন্ধ)।

প্রফুল্ল—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত ভক্তি যদি হয়, তা' হয় প্রিয়পরম-সর্ব্বস্ব। তা' যেখানে থাকে না, সেখানে মানুষ নিজেকে prominent (প্রধান) ক'রে নিয়ে চলে। তাই, প্রিয়পরমের interest (স্বার্থ) দেখা আর হ'য়ে ওঠে না। কামকামনা ও স্বার্থপরতা যেখানে যত প্রবল হয়, প্রিয়-প্রীণন বা প্রেম সেখানে তত দুর্ব্বল হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সন্ধ্যার দিকে খুব খারাপ করেছে। তিনি গোল তাঁবুতে শুয়ে আছেন। বঙ্কিমদা ও সরোজিনীমা তাঁকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন। ঢাকা থেকে আগত দুটি ভাই তাদের দুঃখকষ্টের কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদিগকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিকে জীবনের সাথী ক'রে নিও। ও-থেকে কখনও বিচ্যুত হ'য়ো না। এর সুফল আমরা সহস্র-সহস্র লোকে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পরমপিতার দেওয়া রক্ষাকবচ। করলেই টের পাবে। তোমাদের জন্য আমারও ভাবনা কম নয়। মনটা অস্থির হ'য়ে থাকে। কিছুতেই সুস্থ হ'তে পারছি না, তবে তোমরা যদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি নিখুঁতভাবে পালন করে চল, তাহ'লে আমি কিছুটা সোয়াস্তি পাই।

একজন তাদিগকে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। এই অবস্থায় আজ কথা না ব'লে পরে কথা বলাই তো ভাল।

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—না, না, বলুক। আমার চাইতে ওদের কষ্ট বেশী! আমার কাছে ব'লে যদি একটু শান্তি পায়, বলুক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘ-সময় ধ'রে ধৈর্য্য-সহকারে ওদের কথা শুনলেন এবং ওদের যা' নির্দ্দেশ দেবার তাও দিলেন।

৩রা ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১৬।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমগাছের নীচে তক্তপোষের উপর পাতা শুভ্র শয্যায় ব'সে আছেন।

এমন সময় সুধীরদা (দাস) ও রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদিগকে বললেন—এখানে (দেওঘরে) কাঠের জিনিষের বড় দাম। শুনেছি, এখানকার তুলনায় কলকাতায় কাঠ অনেক সস্তা। একসঙ্গে বেশী আনলে আনার খরচও বেশী পড়ে না। তাই, কলকাতা থেকে কাঠ আনিয়ে কাঠের জিনিষ তৈরী ক'রে যদি বিক্রী করা যায়, তাহ'লে বেশ দু'পয়সা হয়, তোরা খেয়ে বাঁচিস। অনেকের খোরাকী হয়। কলকাতা থেকে যে কাঠ আনতে হবে এমন কোন কথা নয়। কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে প্রয়োজন মত গাছ কিনে নিলেও সুবিধা হ'তে পারে। এখানকার বাজারের কাঠের দাম জানা লাগে। তার চাইতে সস্তা পড়া চাই। আমার মনে হয়, ঠিকমত করতে পারলে ভালই হয়।

ইতিমধ্যে সুধীর সাহা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলিস সুধীর? কেমন হয়? তুই তো বৈশ্যের ছেলে, এ-সব বুঝিস ভাল।

সুধীরদা—ভালই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা গতানুগতিকভাবে চলি। মাথা খাটাই না। ভেবে দেখতে হয় পরিবেশের কী প্রয়োজন, এবং কেমনভাবে তা' মেটান যায়। এর থেকে উদ্ভাবনী বুদ্ধি গজায়। স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে-ক'ম্মে লোকের সুবিধা ক'রে দিয়ে নিজেও লাভবান হওয়া যায়। অবস্থার চাপে আমাদের ভাল ছাড়া খারাপ হয় না, যদি কিনা আমরা চলতে জানি।

সুধীরদা—অবস্থার চাপে প'ড়ে অনেকে অসাধু উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসাধু উপায়ের দিকে ঝোঁকা অযোগ্যতা ও বিকৃতিরই লক্ষণ। যারা ফাঁকি দিতে চায়, তারা নিজেরাই ফাঁকিতে পড়ে। দুষ্টভাবে চলতে গেলেও মাথা খাটান লাগে, সদ্ভাবে চলতে গেলেও মাথা খাটান লাগে। মাথাটা এমনভাবে খাটান ভাল যাতে একযোগে নিজের ও অপরের ভাল হয়। তাতে আশু অসুবিধা হ'লেও ধীরে-ধীরে সকলের আনুকূল্য লাভ করা যায়। কিন্তু অপরকে ঠকিয়ে নিজে বড় হবার চেষ্টা করলে, কালে-কালে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা তাকে নানা দিক থেকে ঠেসে ধরে। আজ কাগজে বানর দিয়ে পকেটমারার খবর বেরিয়েছে। কতখানি evil (অসৎ) সমাজের মধ্যে ঢুকে গেছে এ থেকে বোঝা যায়। কিন্তু এ-কথা আমরা ভুলে যাই যে নিজের স্বার্থে কাউকে যদি আমরা অসৎ আচরণের প্ররোচনা যোগাই, তার ঐ পুষ্ট অসৎবৃত্তি একদিন আমাদেরও ছোবল মারতে ছাড়ে না। যে evil (অসৎ)-কে আমরা স্বেচ্ছায় চারিয়ে দিই, আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই evil (অসৎ) পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে শক্তিমান ও গুণিত হ'য়ে আমাদেরই আক্রমণ করে। অভ্যাস বড় জবর জিনিষ। ওটা পেয়ে বসে। ভেজাল দিতে-দিতে আজ অনেকে খাঁটি জিনিষ তৈরী করা ভুলে গেছে। তাই, সৎ অভ্যাস ছাড়তে নেই।

বড়দার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি সংসারী মানুষ হ'লেও আমার জীবন কাটে public (জনসাধারণ)-কে নিয়ে। সংসারের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা' আমার দেওয়া হ'য়ে ওঠে না। আবার নিরিবিলি থাকার ইচ্ছা করলেও সুযোগ জোটে না। মাঝে-মাঝে নিজেকে তাই ক্লান্ত মনে হয়।

আরো কয়েকজন আসলেন।

দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা কৃষ্টিপ্রহরী ক'রে ফেলেন, তারপর কাগজে-

কাগজে জোরসে ভাবধারার প্রচার চালান। দেখেন পরমপিতার দয়ায় কী হয়। মানুষকে সদ্ভাবে ভাবিত ও সৎপথে চালিত করতে পারলেই অবান্তর বিভ্রান্তির নিরসন হবে। সমালোচনায় কিছু হবে না।

মদনদা (দাস) কলকাতা থেকে একটি লেপ নিয়ে-আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুলে দেখা তো!

মদনদা খুলে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশী হ'য়ে উল্লাসভরে বললেন—সুন্দর হয়েছে। Super-royal extra-fine quality (অতি উচ্চ ও সূক্ষ্মস্তরের জিনিষ)।

মদনদার চোখেমুখে ফুটে উঠলো পরমতৃপ্তির অভিব্যক্তি।

৪ঠা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১৭।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমগাছের ছায়ায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ কাছে ব'সে আছেন।

সুধীরদা (সাহা) বললেন—আপনার বইগুলির বিভিন্ন ভাষায় translation (অনুবাদ) হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো বুঝি, কিন্তু লোক কোথায়? তোমাদের কতদিন থেকে লোক জোগাড় করার কথা বলছি। কিন্তু সেদিকে তোমরা কান দাও না। কাজের বহর যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আরো অনেক ভাল-ভাল কর্ম্মীর দরকার। কতকগুলি কর্ম্মী'র এখানে মোতায়েন থেকে লেখাপড়ার কাজকর্ম্ম করা লাগবে, আর একদল এমন চাই যারা বাইরে গিয়ে যে-কোন society (সমাজ)-এর মধ্যে successfully (কৃতকার্য্যতার সঙ্গে) কাজ করতে পারে। যাজন, বক্তৃতা, বেয়াড়া লোক ও বেয়াড়া situation (অবস্থা) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা—ইত্যাদি সব রকমের গুণ তাদের থাকা চাই। তাদের ইষ্টপ্রাণতা, সেবাবুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা, দরদ, চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমনতর হওয়া চাই যা' দেখে লোকে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। যার যত গুণপনাই থাক egoistic, expectant ও tussling nature (অহঙ্কারী, প্রত্যাশাপীড়িত ও বিরোধপ্রবণ প্রকৃতি) হ'লে পরমপিতার কাজ করা মুশকিল। তুমি বইয়ের translation (অনুবাদ)-এর কথা বলছ। শুনেছি বড়খোকা ও হাউজারম্যান নাকি translation (অনুবাদ) করছে। হাউজারম্যানের মা তো বলেন বেশ ভাল হয়েছে। ভাষার sense (বোধ)-টা, word (শব্দ)-এর feeling (অনুভূতি) ও intent (উদ্দেশ্য)-টা ধ'রতে পারলে, তখন আর অসুবিধা হয় না।

সুধীরদা—আপনি যে-ধরণের লোক যোগাড় করতে বলেন, তার জন্য অনেক খাটতে হয়, কিন্তু চাকরি ক'রে বেশী সময় পাই না।

প্রফুল্ল—ঋত্বিকদের যাতে চাকরি করতে না হয়, সেইজন্যই তো শ্রীশ্রীঠাকুর ঋত্বিকীর বিধান দান করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকী ভাল ক'রে চারালে অনেক প্রশ্নের সমাধান হ'য়ে যাবে। তোমরা যজমানদের পিছনে খাটবে—দেখবে তারা যাতে adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে এবং ভালভাবে দাঁড়াতে পারে এবং তারাও তোমাদের ভরণপোষণের জন্য সাধ্যমত নিয়মিত দেবে। এই পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে সবাই বেড়ে উঠবে। তোমাদের যদি চাকরি করা না লাগে, তবে মন-প্রাণ ঢেলে এই কাজ করতে পারবে। দোটানার মধ্যে থাকা লাগবে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালর অন্ত নেই, আমি চাই যে তোমরা আরো-আরো ভাল হও, নিখুঁত হও। তাই তোমরা যতই ভাল হও, তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে আমি তোমাদের গাল পাড়বই। যদিও এ-কথা ঠিক বাইরে তোমাদের মত লোক কমই মিলবে।

কোন একজন কর্ম্মীর অর্থাসক্তির বিষয় কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টাকার প্রতি আসক্তি টাকা পাওয়ার পথে সব চেয়ে বেশী অন্তরায় সৃষ্টি করে। টাকার উপর লোভ গেলে মানুষের উপর নজর ক'মে যায়, সেবার উপর নজর ক'মে যায়, কাজের উপর নজর ক'মে যায়। তাতে পাওয়ার পথ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে।

রামকানালীর জমির জন্য ২৫০ টাকার প্রতিশ্রুতি ক্রমাগত বাড়ছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতার গরীব বাচ্চা আমি, তাই সকলের মধ্য-দিয়ে তিনি আমাকে দয়া করেন। তাঁর দয়া ছাড়া কিছুই হয় না।

ব্যক্তিগত ভোগসুখ-সম্বন্ধে কী মনোভাব নিয়ে চলা উচিত সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের প্রয়োজন অযথা বাড়াতে নেই। কতকগুলি প্রয়োজন বাড়িয়ে সেই সব প্রয়োজনের দাস হ'য়ে পড়লে স্বস্তির বদলে অস্বস্তিই বাড়ে। তবে অস্তিত্বের জন্য যা' প্রয়োজন সে-ব্যাপারে কার্পণ্য করতে নেই। মানুষের প্রকৃত সুখ হয় অপরকে সুখী করার ভিতর-দিয়ে। তাই, অর্থ-সামর্থ্য ও দ্রব্য-সামগ্রী ইষ্ট, পরিবেশ ও প্রিয়জনের তৃপ্তিসাধনের জন্য যতটা ব্যয় করা যায় ততই আত্মপ্রসাদ আসে। অবশ্য, এই করাটা যদি প্রত্যাশাজনিত হয়, তাহ'লে পরে ক্ষোভেরও সঞ্চার হ'তে পারে। তাই প্রত্যাশাহীন হ'য়ে করা লাগে।

পরিবার-পরিবেশের সেবার বেলায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা লাগে যাতে সে-সেবা সমীচীন ও সত্তাপোষণী হয়। আমাদের বেহিসাবী দান ও দয়া যেন কাউকে পঙ্গু ক'রে না তোলে, যেন কারও অসৎপ্রবণতাকে প্রশ্রয়পুষ্ট ক'রে না তোলে।

৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ১৮।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। যতীনদা (দাস), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), রাজেনদা (মজুমদার), মুরারিদা (দাঁ), লালবিহারীদা (দত্ত), সুরেনদা (দাস) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে হয়, এই কথাটা বললে যতীনদা ব্যথা পাবে, তাই বলি না, কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়। আবার ভাবি, আমার কথা যদি কেউ একবার মেনে চলতে অক্ষম হয়, তবে ঐ inertia (জড়তা)-বশে ভবিষ্যতে serious (গুরুতর) কথাও হয়তো শুনবে না, তাতে তার খুবই ক্ষতি হবে। এই সব consideration-এই (বিবেচনায়) যে সময় যাকে যা' বলতে চাই তা' বলতে পারি না। এটা হয়েছে সি, আর, দাশকে দার্জ্জিলিং যাওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করার সময় তার দলের লোক যখন বেঁকে বসলো সেই থেকে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে বাস্ ধ'রে ঠেকিয়ে রেখে দিই, কিন্তু তা' পারলাম না। যতীন আচার্য্যচৌধুরীকেও আমার সেইদিন রাতে যেতে দেবার ইচ্ছা ছিল না। যা' বলা যায়, তা' বললামও, কিন্তু কথা শুনল না। প্রত্যেকের জন্যই আমার নানা উদ্বেগ, নানা দুশ্চিন্তা লেগে থাকে।

অহিংসা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অহিংসা কথাটা negative (নেতিবাচক)। হিংসা না-করাটাই যথেষ্ট নয়। চাই প্রত্যেককে ভালবাসা ও প্রত্যেকের ভাল করা। তা' করতে হ'লে চাই ইষ্টপ্রাণ সেবা, যাতে মানুষের সদ্ভাব উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে। মানুষের অন্তরে ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে তার দুরিত-বুদ্ধির গায় হাত পড়ে না। তাই, ভালবাসা ও ভাল করার জন্য ধর্ম্মদান চাই-ই কি চাই। সঙ্গে-সঙ্গে চাই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত নির্ব্বিরোধ অসৎনিরোধ। অহিংসার expression (অভিব্যক্তি) এমনতর হ'লে তবেই নিজের ও অপরের মঙ্গল হয়। হিংস্রতাকে অব্যাহতভাবে পুষ্ট হ'তে দিলে অহিংসা অক্ষুণ্ণ থাকে না।

২৫০ টাকার প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নেংটের সাথে পারার জো নেই, নেংটের power (শক্তি) অত্যন্ত, আমার এই নেংটে মানুষগুলি poor (দরিদ্র) হ'তে পারে, কিন্তু pauper (দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত) নয়। আবার

অনেক হোমরা-চোমরা লোক আছে, তারা poor (দরিদ্র) না হ'লেও pauper (দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত)।

৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৯।২।১৯৪৮)

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে চৌকিতে বসেছেন। হরিপদদা শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা আঁচড়ে দিচ্ছেন। এমন সময় বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) শ্যামাপদ ভাই (মুখার্জ্জী)-কে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত দিয়ে পাঞ্জাদানের জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামাপদ ভাইয়ের হাতে পাঞ্জা দিয়ে বললেন—এইবার তোমার পিতৃকার্য্য শেষ হ'লো (শ্যামাপদ ভাইয়ের বাবা ঋত্বিক ছিলেন, তিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন, শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরে শ্যামাপদ ভাই এসেছেন), যাজন করবে এমনভাবে যাতে প্রত্যেকে খুশী হয়, কারও সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি ক'রো না। Be ever untussling with every tolerance (সহনশীলতার সঙ্গে সর্ব্বদা নির্ব্বিরোধ থেকো)। কাউকে ছোট ক'রে কাউকে বড় করতে যেও না।

ইষ্টায়নীর স্বাক্ষর সংগ্রহ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা খুশী হ'য়ে করে, তাদের দিয়েই করিও, শুভকাজে মানুষ যদি আনন্দের সঙ্গে না দেয়, তাতে ভাল হয় না।

অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি কেমনভাবে খোলে সেই-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগ্রহ-সন্দীপ্ত ইষ্টকেন্দ্রিকতা মানুষের মনকে তীব্রভাবে একমুখী অর্থাৎ একাগ্র ক'রে তোলে, ঐ কেন্দ্রীভূত মনের সূক্ষ্ম বোধশক্তি অসম্ভব বেড়ে যায়। তখন equituned impulse (সমতান-সমন্বিত সাড়া)-গুলি চেতনার পর্দ্দায় সহজে ভেসে ওঠে। সর্ব্বদা কত সাড়ারই তো radiation (বিকিরণ) হচ্ছে, মন যখন যে স্তরে থাকে, তখন তেমনতর ততটুকু ধরতে পারে। বাকীগুলি আমাদের বোধের অসাড়তার দরুণ ধরা পড়ে না। সেগুলি এসে-এসে দরজা বন্ধ দেখে বিমুখ হ'য়ে ফিরে চ'লে যায়। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্য কত সঙ্কেত যে দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু তা' নেয় কে? সেইজন্য গভীর ইষ্টানুরাগ নিয়ে নামধ্যান খুব করতে হয়, আর চলাবলা কাজকর্ম্ম এমনভাবে করতে হয় যাতে মনটা ইষ্ট থেকে একলহমার জন্যও বিচ্যুত না হয়। প্রবৃত্তির বিক্ষোভ মনকে যত মলিন ও বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে, অনাবিল মনন, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির ক্ষমতা তত লোপ পেয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় এসে বসলেন। ইংরাজীতে একটা লেখা

দিলেন—Selfish ego conscientiously ignores gratitude (স্বার্থপর অহং বিবেকিতার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে)।

প্রফুল্লদা—কাজটা তো জ্ঞানকৃত অন্যায়, সে-ক্ষেত্রে conscientiously (বিবেকিতার সঙ্গে) কথাটা কেন দিলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার প্রকৃতি যেমন, তার conscience (বিবেক)-ও তেমনভাবে গঠিত হ'য়ে ওঠে। এবং সেই conscience (বিবেক) তেমনতর যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রেরণা জোগায়। যে অকৃতজ্ঞ, সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে সে অকৃতজ্ঞ নয়। অপরে তার জন্য যা' করেছে, তা' নিজের স্বার্থের খাতিরেই করেছে। তা'ছাড়া, সে তার জন্য অপরের করাটাকে লঘু ক'রে দেখিয়ে নিজের করাটাকে সব সময় গুরু ক'রে দেখতে চায়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও কৃতজ্ঞতার বালাই বহন করা বড় কঠিন কাজ। সবাই ওটা পারে না। তাই ব'লে ভীষ্ম যেমন দুর্য্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা লঙ্ঘন ক'রেছিলেন, তা' কিন্তু ঠিক নয়।

লক্ষ্মীপুরের প্রভাতদা (মজুমদার) নোয়াখালির দাঙ্গার সময় কেমনভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন, কেমনভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক দয়া উপলব্ধি করেছিলেন, তার কাহিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে চললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—বাইবেলেও নাকি আছে যারা এই new name (নূতন নাম) পাবে, করবে, তারা চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে এবং disaster (বিপর্য্যয়)-এর সময় তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। এ হ'লো পরমপিতার অমোঘ বিধান। মানুষের poor faith (দুর্ব্বল বিশ্বাস), ঠিকমত করে না। তবু পরমপিতার দয়ার অন্ত নেই।

মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে প্রাণপণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকতে-ডাকতে প্রভাতদার যে অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, তারও বর্ণনা তিনি দিলেন। পরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিস্নিগ্ধ কোমল-কণ্ঠে বললেন—ঐ moment-এ (মুহূর্ত্তে) extreme concentration (চরম একাগ্রতা) হয়েছিল কিনা, তাই পরমপিতা দয়া ক'রে এক ঝলক দেখিয়ে দিলেন।

অন্যান্য বিস্ময়কর কাহিনী শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রহ্লাদের চাইতেও বেশী পরীক্ষা হ'য়ে গেছে।

পরে বললেন—প্রভাত যদি নিজের কথা কয়, তাহ'লেই যাজন হ'য়ে যায়। পরমপিতার দেওয়া জীবন পরমপিতার কাজে লাগানই ভাল।

প্রভাতদা হাত জোড় ক'রে কাতর কণ্ঠে বললেন—আপনার দয়া।

৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ২০।২।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় ইজি-চেয়ারে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। কালিদাসী মা, সুধাদি, প্রভৃতি কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মনটা বিষণ্ন, কাল রাত্রে কাজলভাইয়ের পেটে খুব ব্যথা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগত বলছেন—আমি মানুষের ব্যথায় বড় কাবু হ'য়ে পড়ি টক ক'রে।

খানিকটা পরে শরৎদা (কর্ম্মকার) জিজ্ঞাসা করলেন—রামকানালির জমির জন্য ২৫০ টাকা ক'রে ২০০ জনের কাছ থেকে আপনি সংগ্রহ করতে বলেছেন, non-Satsangee-দের (যারা সৎসঙ্গী নয় তাদের) কাছ থেকে তা' সংগ্রহ করতে পারি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হঁ্যা। তবে non-Satsangee (সৎসঙ্গী নয়) কথাটা ভাল নয়, বলা ভাল non-initiated (অদীক্ষিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় সুশীলদাকে বলছিলেন—সকালে কাজলের অসুখের কথা কাজলের মা এসে যখন বলতে লাগলো,—কাঁদতে লাগলো, আমার কেমন আতঙ্ক হ'লো। এই ক'দিন মাথাধরা থাকলেও মনে হয় otherwise (অন্যদিক দিয়ে) একটু ভাল ছিলাম। আজ সকাল থেকে কেমন যেন লাগছে। আতঙ্ক, শোক, অত্যাচার অর্থাৎ যে-সব আঘাত আমি বার-বার পেয়েছি, সে-সব এখন যেন সামলাতে পারি না।

৮ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২১।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আমতলায় চৌকিতে ব'সে চট্টগ্রাম থেকে আগত কয়েকটি দাদাকে বলছেন—মনে রেখো—

উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ।

এর প্রত্যেকটি পালন করতে হবে। একজনের এই সম্পদ না থাকলে সে বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

এক দাদা—কম্যুনিষ্টদের মধ্যে কাজ করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্যুনিজম্-এর কথা ধ'রেই পারা যায়। কম্যুনিজম্ কী, Community (সম্প্রদায়) কী এই ব'লে সুরু করতে হয়। আমি বুঝি সকলের

চাওয়াই বাঁচাবাড়া। বাঁচার জন্য নানা জায়গায় নানা দলের নানা কায়দা, সেইটে কেমনভাবে, কী ক'রে, কোন্ পথে পুরোপুরি পুষ্ট হয় তাই কথা। পরমপিতার দয়ায় তোমরা যা' পেয়েছ, তা' হ'লো solution of all isms (সমস্ত বাদের সমাধান)। কেমন ক'রে বিন্যস্ত ক'রে adjust ক'রে (খাপ খাইয়ে) পরিবেষণ করতে হয়, তা' জানতে হবে, তবেই সবাইকে খুশী করতে পারবে, solution (সমাধান) দিতে পারবে.........

একটু থেমে আবার বললেন—যেয়ে আমার ভিক্ষাটা (২৫০ টাকা ক'রে ২০০ জনের অবদান) তাড়াতাড়ি জোগাড় ক'রে ফেল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব কথা সবার কাছে বলা ভাল না। আধার বুঝে, প্রকৃতি বুঝে যাকে যতটুকু বলা সাজে, যে-বলায় তার অকল্যাণ না হয়, তেমন ক'রে তাকে ততটুকু বলা ভাল। অক্ষেত্রে প'ড়ে বহু ভাল কথার মূল উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়। একজন উপযুক্ত মানুষ হয়তো একটা distorted (বিকৃত) মেয়েকে বিয়ে ক'রে তাকে save (রক্ষা) করতে পারে। তা'র কষ্ট হ'লেও সে হয়তো তাকে সামলাতে ও শোধরাতে পারে—নিজ আদর্শে অটুট থেকে। তাই তাকে যদি তা' করতে বলা হয়, তাতে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। কিন্তু একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি তা' করতে বলা যায়, তবে সে তাকে হজম করতে না পেরে নিজেও জাহান্নমে যাবে, তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বহু লোকের সামনে যাজন করতে গেলে কথা খুব মেপে ও হিসাব ক'রে বলা লাগে, যাতে লোকের বুদ্ধিভ্রংশ না হয় এবং ঐ কথার ফলে কারও ক্ষতি না হয়।

প্রফুল্ল—অতো হিসাব-নিকাশ ক'রে কথা বলতে গেলে তো কথা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় না, এবং তাতে লোকের প্রাণও স্পর্শ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—দূর পাগল! ইষ্টে যে সজাগ থাকে, ঐখানে যার মন বাঁধা থাকে, সে যে সব সময়াই হুঁশিয়ার থাকে, সচেতন থাকে, ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে লোকমঙ্গলের মাপকাঠিতে মেপে-মেপে চলা, বলা, করা, ভাবা ধীরে-ধীরে তার স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে। বাহ্যিক চলা, বলা, করার সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টচেতনা ও ইষ্টচিন্তা অর্থাৎ মঙ্গলচেতনা ও মঙ্গলচিন্তা তার জীবনে অচ্ছেদ্য ও নিরন্তর হ'য়ে ওঠে। ধ্যান তাকে কখনও ত্যাগ করে না। প্রথমটা কিছুদিন লেগে-বেঁধে চেষ্টা ক'রে অভ্যাসটা পাকা ক'রে নিতে পারলে তখন আর হিসাব ক'রে কথা বলার জন্য কসরত করতে হয় না। বলতে গেলেই হিসাব ক'রে বলা আসে। বেফাঁস কথা বলা কষ্টকর হ'য়ে ওঠে। আমাদের চোখের সামনে যখন একমাত্র ইষ্ট থাকেন, ঐ এককে অগ্রভাগে রেখে যখন আমাদের

চলনা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই বলে একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা। অমনতর একাগ্রতায় আসীন হ'তে পারলে আর ভাবনা নেই। তোমার প্রতিটি কথাবার্ত্তা, প্রতিটি চালচলন, প্রতিটি ভাব, প্রতিটি কাজ তখন তাঁকেই প্রকাশ করবে, তাঁকেই প্রচার করবে, তাঁকেই তুলে ধরবে, তাঁরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা পাকা করবে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার অছিলায় যদি আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্ধায় ঘোর, কিংবা ইষ্টে একাগ্র না হ'য়ে যদি ইষ্ট ও অহংএর দোটানার মধ্যে থাক, কোন সময় ইষ্টকে মুখ্য কর, কোন সময় অহংকে মুখ্য কর তাহ'লে কিন্তু চলা, বলা ও চরিত্রে সঙ্গতি আসবে না, স্বাভাবিকতা আসবে না। তাই, নিজেও শান্তি পাবে না এবং মানুষকেও শান্তি দিতে পারবে না। তোমার কপটতা, তোমার কৃত্রিমতা তোমার নিজের কাছে ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অপরের কাছে তোমাকে করুণার পাত্র ক'রে তুলবে।

পরে বললেন—Love is the leader to normal concentration (ভালবাসা একাগ্রতার পরিচালক)।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের সঙ্গতি মানুষ। এই মানুষ যদি থাকে, তাহ'লে মানুষ কত কী-ই করতে পারে। আমার আধপয়সা সঙ্গতি নেই, আমার সঙ্গতি মানুষ। মানুষ কেনা যায় ইষ্টাথী ভালবাসার গুণে, সেবার গুণে, সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহারের গুণে, সওয়া-বওয়ার গুণে, ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ের গুণে, দয়া-ক্ষমার গুণে, অক্রোধিতা, অমানিতা ও নিরলস পালন-পরিচর্য্যার গুণে, ত্যাগ-তিতিক্ষার গুণে, তাকে সার্থক, যোগ্য ও বড় ক'রে তোলার সক্রিয় প্রবণতার গুণে। জিনিষ কেনা যায় টাকায়। মানুষের তুলনায় জিনিষের দাম বা টাকার দাম কিছুই নয়। যে-সব গুণের কথা বললাম ঐ-সব গুণ যদি কারও থাকে, তাহ'লে যে সে নিজের ও অপরের কত ভাল করতে পারে, তার ঠিক নেই। মানুষের প্রধান আহরণীয় জিনিষ হ'চ্ছে ইষ্টার্থে লোক-আহরণী গুণ আহরণ করা।

প্রফুল্ল—ইষ্টার্থে লোক আহরণ করায় আহরণকারীর নিজের লাভ কোথায়? ওর চাইতে নিজের জন্য লোক আহরণ করলে বরং আহৃত লোকগুলি আহরণকারীর হাতে থাকে। এবং তাতে তার সুবিধা-সুযোগ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে নিজস্বার্থে তাদের নিজের কুক্ষিগত ক'রে রাখতে চায়, সে কালে-কালে তাদের হারায়। এমন-কি, বাপ-মা যে সন্তানের জন্য এতখানি করে, তাও তারা যদি সন্তানকে আদর্শের দিকে উন্মুখ ক'রে তুলে তার সার্থকতার পথ উন্মুক্ত ক'রে না দেয়, বরং নিজেদের খেয়ালমত তাকে চালাতে চায়, দেখা যায়, সন্তান সেখানে তাদের হাতের বাইরে

চ'লে যায়। মানুষকে আপন ক'রে তুলে তাকে পরমপিতার হাতে দিতে হয়। তাতে সে সুখী হয়, শান্তি পায়। তখন সে কৃতজ্ঞতাবশে ভগবদ্ভক্তির পোষণদাতা যে, আজীবন তার কেনা-গোলাম হ'য়ে থাকে। সে কিছু না চাইলেও তাকে অঢেল দেয়, করেও তার জন্য এন্তার। কিন্তু কোন অহঙ্কারী ও স্বার্থপর লোক একজনের জন্য যদি প্রভূতও করে এবং সে যদি ঐ করার বিনিময়ে চায় যে মানুষটা চিরকাল তার অহমিকা ও স্বার্থের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিকিয়ে দিক, তাহ'লে কিন্তু একদিন ঐ উপকৃত ব্যক্তির সত্তাও হাঁপিয়ে ওঠে। সে তখন নিজের স্বস্তির জন্য ঐ বাধ্যবাধকতার বন্ধন ছিঁড়তে চায়। মানুষকে পরমপিতার দিকে ঠেলে না দিয়ে নিজের দিকে টেনে বেঁধে রাখতে চাইলে একদিন-না-একদিন সে ছুটে যাবেই, এমন-কি শত্রুও হ'য়ে উঠতে পারে, কারণ, কেউ চায় না যে তার সত্তার বিবর্দ্ধন খতম হ'য়ে যাক। অবশ্য, উপকারীর অপকার যদি কেউ করে সেটা তার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা বই আর কিছু নয়, এবং তার ফলও তাকে পেতে হয়। কিন্তু আমরা যেন মতলববাজী সেবায় মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে তাকে আমাদের অহং ও খেয়ালের পরিচারক ক'রে রাখতে না চাই। তার ফল কিন্তু বিষময় হ'তে বাধ্য। দেখ না, কত ইষ্টহীন নেতা আছে যাদের একদিন মানুষ ফুলের মালা পরায়, আবার একদিন তাদেরই জুতোর মালা পরায়। এই রকমটা আমার ভাল লাগে না। যারা এমনতর বিপরীত ব্যবহার করে তাদের ঢের দোষ আছে। কিন্তু আত্মস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার প্রণোদনায় মানুষ যদি লোকসেবায় ব্রতী হয়, তার ফল সাধারণতঃ শুভ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আজ তাঁর শরীর ভাল নয়। পূজনীয় বড়দা কাছে এসে বসেছেন এবং দয়ালের স্বস্তি-বিধানের চেষ্টা করছেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রোগের চাইতে চিকিৎসা-বিভ্রাট হয় বেশী। অন্যের বেলায় আমি dictate করি (নির্দ্দেশ দিই)। আমার বেলায় আমি নিজেও পারি না, ওরাও (ডাক্তাররাও) ভয় পায়। ঠাওর পায় না কী দিয়ে কী করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গুরুদাসদাকে (সিংহ) সহজভাবে বললেন—আমাকে ২৫০ টাকা দিবি না ?

গুরুদাস—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা মানুষ earn (উপার্জ্জন) করতে পারে, তারা poor (দরিদ্র) হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে তারা কখনও pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)

নয়। তাদের উপর যত pressure (চাপ)-ই দেওয়া যাক, তারা কখনও 'না' কয় না। তারা 'হ্যাঁ'-ই কয় এবং পারেও। Pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) যারা, তারা কখনও মানুষ earn (উপার্জ্জন) করতে পারে না। মানুষকে আপন করতে এবং তার সঙ্গে আপনজনের মত ব্যবহার করতে কিম্মৎ লাগে। inferiority (হীনমন্যতা) থাকলে তা' পারা যায় না।

অনেকে বলে 'আমার মানুষের কাছে হাত পাততে ঘেন্না করে।' আমি কই—তুমি যে মানুষকে আপন করতে পার না, আপন ভাবতে পার না, তা' আর কও না। অবশ্য, শুধু নেওয়ার বেলায় মানুষকে আপন ভাবলে হবে না। দেওয়ার বেলায়ও মানুষকে আপন ভাবতে হবে। অপরের প্রয়োজন থাকলে নিজের সাধ্যমত তাকে দিতে হবে। নিজের লোকের জন্য মানুষ যেমন করে অপরের জন্যও তেমনি করতে হবে। নিজের জন্য, ইষ্টার্থে বা অপরের জন্য কারও কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করলে সব সময় নজর রাখতে হবে, যাতে তাকে আরো ক'রে পূরণ ও উচ্ছল ক'রে তোলা যায়। যে মানুষকে আপন করতে চায় সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দরদ, দায়িত্ব ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অপরের জন্য করতেই থাকবে—ইষ্টসঞ্চারণাকে অব্যর্থ রেখে। তখন তার ঘরে-ঘরে ব্যাঙ্ক। মানুষকে যারা যোগ্য ক'রে ও আপন ক'রে তোলার ধান্ধায় ঘোরে, তাদের পারগতা ও ঐশ্বর্য্যের ইতি নেই।

গুরুদাসদা—২৫০ টাকার ব্যাপারে বাইরের লোকের কাছে চাইতে হ'লে কিভাবে বলা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়, কলোনীর জন্য ঠাকুরও ভিক্ষা করছেন আমরাও ভিক্ষা করছি। আপনার প্রাণ চাইলে আপনিও দিতে পারেন। অবশ্য এতে যদি আপনার কষ্ট হয় বা আপনি দুঃখিত হন, তাহ'লে দেবেন না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে (ব্যানার্জ্জী) বললেন—মন্মথ দিবি নাকি ?

মন্মথদা—হ্যাঁ !

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্মথর শুধু ২৫০ টাকা দিলে হবে না। ২০০ জন ঠিক ক'রে দেওয়া লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জুঁইমাকে বললেন—শোন্ মা! তুই তোর জায়গায় গিয়ে, যারা দিয়ে খুশী হয়, তাদের কাছ থেকে ২৫০ টাকা ক'রে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে পাঠাবি। যারা খুশী হ'য়ে না দেয়, তাদের কাছ থেকে নিও না। তোমার কথাই এমন হওয়া চাই যাতে খুশী হ'য়ে দেয়।

কাজের কথা বলতে-বলতে অসুস্থতার মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ভিতর থেকে যেন এক অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা ফু'ড়ে বেরুচ্ছে। এক হাস্যমধুর স্বর্গীয় দ্যুতি তাঁকে মোহন মূর্ত্তি দান করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্মথদার দিকে চেয়ে সহাস্যে আব্দারের সুরে বললেন—২৫০ টাকা দেবে ব'লে ইষ্টায়নী, কৃষ্টিপ্রহরী করবে না, তা' কিন্তু নয়। তোমাকে সব করতে হবে।

মন্মথদা খুশী হয়ে বললেন—আপনি যা' আদেশ করবেন, তাই করব। আপনার দয়ায় সব পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—এই তো পুরুষ-মানুষের মত কথা।

পরে আবার বললেন—জু'ইমা একাই ২৫,০০০ ইষ্টায়নী জোগাড় করতে পারে।

এরপর ধীরে-ধীরে অনেকেই উঠে পড়লেন।

৯ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২২।২।১৯৪৮)

আজ সকাল ৬টায় শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজীতে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

Logos, the word has behaved into life, blood and flesh, hence word with behaviour is one's life and existence. (বাক্ অর্থাৎ শব্দ অনুশীলন ও আচরণের ভিতর-দিয়ে জীবন, রক্ত ও মাংসে পর্য্যবসিত হয়েছে, সুতরাং বাক্য ও আচরণই মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব)।

লেখাটি দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় চৌকিতে এসে বসলেন। ধীরে-ধীরে দীপ্তণাদা (সেনগুপ্ত), কাশীদা (রায়চৌধুরী), জু'ইমা প্রভৃতি আসলেন।

ঐ লেখাটির সূত্র ধ'রে আলোচনা সুরু হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাক্ ও ব্যবহার এই দুটো জিনিষের মধ্যে whole creation (সমগ্র সৃষ্টি) নিহিত আছে। তাই মানুষকে চেনা যায় তার বিভিন্ন অবস্থার বাক্য ও ব্যবহার দিয়ে।

প্রফুল্ল—বাক্ ও ব্যবহারের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি কি-ভাবে নিহিত আছে তা' বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাক্ হ'লো আদিম শক্তি বা primal energy-র একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ। তার প্রাণ হ'লো স্পন্দন। এই স্পন্দনাত্মক শক্তির সম্ভাবনার ইতি নেই। কিন্তু যার অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্বকে যদি সম্ভব ক'রে তুলতে হয়,

তবে শক্তির কার্য্যকারিতাকে এমনতরভাবে ব্যবহার, বিনিয়োগ ও বিনায়ন করতে হবে, যাতে ঈপ্সিত বস্তুর উদ্ভব সম্ভব হয়। একে বলে বিধি। তাই আমি বলি, যা' ক'রে যা' হয়, তা' ক'রে তাই হয়। অর্থাৎ, কিছু পেতে বা হ'য়ে তুলতে গেলে বিহিত ক্রিয়া বা আচরণ-পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে যেতে হয়। মানুষ যে আজ মানুষ হ'য়ে উঠেছে এর পিছনে আছে আদি বাক্-এর অজস্র আচরণ, আচলন বা সম্যক্ চলনের পারম্পর্য্য। প্রত্যেকটি বস্তু ও জীবের পিছনেই আছে সুদীর্ঘ সক্রিয় বিবর্ত্তনের ইতিহাস। যে যেমনতর স্তরে উপনীত হয়েছে তার অভিব্যক্তি ও আচরণও তেমনতর। মানুষের অভিব্যক্তির অন্যতম প্রধান বাহন তার বাক্ বা বাক্য। তাই মানুষের বিভিন্ন সময়ের বাক্ বা ভাষা এবং আচরণ যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা যায়, তাহ'লে ঠিক পাওয়া যায়, সে কী বা কেমনতর। শুধু লোক-দেখান কথা বা আচরণ দিয়ে কিন্তু মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না। মানুষ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় কী বলে বা কী করে, তাই দিয়ে বোঝা যায় সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য, উপরে ওঠার রাস্তা তার সামনে খোলাই থাকে। উন্নততর বাক্য ও ব্যবহারে অভ্যস্ত হ'য়ে-হ'য়ে সে তা' আয়ত্ত করতে পারে। অনুশীলন করতে-করতে সদ্‌গুণ রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে যায়। কারও হতাশার কোন কারণ নেই।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা আছে divine law (সার্ব্বজনীন ভাগবত বিধান), আর একটা আছে discrete law (স্থানকালপাত্রোচিত বিধান)। যেমন divine law (সার্ব্বজনীন ভাগবত বিধান) হ'লো—সাধারণতঃ মদ না খাওয়া উচিত, কিন্তু কারও হয়তো মদ খেয়ে উপকার হয়। তাকে তখন অবস্থা-বিশেষে মাত্রামত মদ খাওয়ার বিধান দেওয়া চলে। এটাকে বলা যায় discrete law (স্থানকালপাত্রোপযোগী বিধান)।

ধূর্জ্জটিদা—পাগল হওয়া ও মারা যাওয়া উভয়ই obsession-এর (অভিভূতির) ব্যাপার। এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা obsession (অভিভূতি) শরীরে থাকে আর একটা শরীর থেকে বের হ'য়ে যায়। পাগল মানে unbalanced (সাম্যসঙ্গতিহারা)। বহু ভাবই ঠেসে ধরে থাকে। তুমি select (নির্ব্বাচন) ক'রে নিচ্ছ, তোমার জিহ্বা তিতোটা থু-থু ক'রে ফেলে দেয়, তুমি ভাল-মন্দ বিচার করতে পার এবং সেইভাবে চলতে পার, কিন্তু পাগলের সে-বোধ থাকে না, তাই সে select (নির্ব্বাচন) ক'রে নিতে পারে না। মানুষ প্রবৃত্তিতে অভিভূত হ'লে পরে অনেকটা পাগলের মত হয়, তখন সে ধীরভাবে ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে পারে

না। প্রবৃত্তিটাই তাকে পেয়ে ব'সে চালনা করে। এও একরকমের সাময়িক পাগলামি-বিশেষ। সবরকম পাগলামি থেকে নিস্তার পেতে গেলে তাই ইষ্টকে আঁকড়ে ধ'রে থাকা লাগে। তখন কোন অভিভূতিই মানুষকে কাবু করতে পারে না। আর, মৃত্যু হ'ল একটা ভাবে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে cut off (বিচ্ছিন্ন) হওয়া। সমাধি হ'ল full consciousness (পূর্ণচেতনা) নিয়ে একটা ভাবে ডুবে যাওয়া। সমাধির ভিতর-দিয়ে জ্ঞান ও বোধ বেড়ে যায়। উৎসে যে যত তন্ময় ও বিভোর হ'তে পারে তার তত সমাহিত ভাবের উদয় হয়। এই হ'ল সার্থকতার পথ। সমাহিত ভাব মানে সমাধি, যার ভিতর-দিয়ে কিনা সমস্যার সমাধান সম্যক রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। পাগল হ'লে যেমন unbalanced (সাম্যসঙ্গতিহারা) হয় তেমনি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। যেটা পেয়ে বসে তার থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। আবার, কোন ঝোঁক বা আবেগের উদয় হ'লে তা' সামলাতে পারে না। নিজের সচেতন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে মঙ্গলের পথে চলতে পারে না। বহু সময় suppressed sex-complex (নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি) থেকে পাগল হয়। তাই, যৌন-প্রবৃত্তি ও অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিকে suppress (নিরোধ) না ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। শুনেছি, মানুষ খুব বেশী পাগল হ'লে নাকি তাড়াতাড়ি মরে যায়।

কলকাতা থেকে United Commercial Bank-এর একজন অফিসার (আগ্রার সৎসঙ্গী) আসলেন।

তিনি এসে প্রণাম ক'রে নিজের পরিচয় দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে সস্নেহে আগ্রা-সৎসঙ্গের খোঁজ নিলেন।

তিনি আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনান হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—তা' ভালো, দাদাকে শুনিয়ে ওকে দিয়ে ঠিক ক'রে নাও।

ভদ্রলোক বললেন—সন্ত পুরুষের বাণী চিরকালই ঠিক থাকে। আমাদের ঠিক করার কিছু নেই। আমাদের কাজ হ'ল আপনাদের উপদেশ ঠিকভাবে মেনে চলা।

একের পর এক ইংরাজী বাণী পড়া হচ্ছে, ভদ্রলোক মুগ্ধ অন্তরে শুনে চলেছেন।

একটি বাণীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের কাজ হ'ল যাতে ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি ভক্তি হয় তাই করা। ভ্রান্ত উপদেশে মানুষের অকল্যাণ হয়। আজকাল অনেকে বলে, ভগবানকে দিয়ে কী হবে? কিন্তু বাঁচতে হ'লেই ভগবানকে দরকার। ভগবানকে চাইতে হ'লে ভালর পথে যেতে

হবে। ভাল করতে হবে। শুধু শুনলে ও বললে হবে না। না ক'রে কেউ পায় না। মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তোলা, প্রবৃত্তিপরায়ণ ক'রে তোলা খুবই সহজ কাজ, কারণ, মানুষের সেদিকে স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। কিন্তু তাকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা, ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা কঠিন। মানুষ কালের রাজত্বে আছে, তাই complex (প্রবৃত্তি)-গুলি disintegrated (বিশ্লিষ্ট) ক'রে রাখার সুযোগ পাচ্ছে। সর্ব্বোপরি সত্য হ'ল আমরা সবাই জীবনের পূজারী। জীবনকে ভাল না বাসে, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে না চায় এমনতর মানুষ বিরল। মানুষ কেন, প্রতিটি জীবই চায় বাঁচতে, বাড়তে। আর, জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়ান আছে ধর্ম্ম—যা' কিনা জীবনকে ধ'রে রাখে ও বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। এই ধর্ম্মকে পেতে গেলে চাই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া। কারণ, তিনিই হ'লেন ধর্ম্মের জীবন্ত পথ। যাঁর প্রতি প্রেমে, প্রীতিতে, জীবনে উন্নীত হই, তিনিই সদ্‌গুরু। তিনি হ'লেন বেত্তাপুরুষ, অর্থাৎ সবই তিনি জানেন। তাই তাঁর কাছে শুনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলতে হয়, হাতেকলমে করতে হয়। কায়মনোবাক্যে, সদ্‌গুরুর সঙ্গ ক'রে, সেবা ক'রে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা মহান পুরুষ, তাঁদের নির্দ্দেশমত চ'লে আমরা ঢের উপকৃত হ'তে পারি। যারা surrender (আত্ম-সমর্পণ) করেনি, কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা করেনি, তারা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়। তাই তারা যত কথাই জানুক, যত কথাই বলুক, মানুষকে মঙ্গলে পরি-চালিত করার শক্তি তাদের নেই। যে আচরণ-সিদ্ধ নয় সে কখনও মানুষের চালক হ'তে পারে না। যাঁর চরিত্রে ও আচরণে সৎনীতিগুলি মূর্ত্ত তাঁর দ্বারাই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয়। কারণ, তাঁকে ভালবেসে যদি কেউ অনুসরণ করে তাহ'লে আপসে-আপ সে সৎ ও সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তাঁর কথার ভিতরও একটা বিশেষ শক্তি থাকে। তিনি যা' বলেন, তা' আচরণ করতে মানুষ অন্তরে একটা প্রেরণা ও তাগিদ অনুভব করে। হুজুর মহারাজ প্রভৃতি যেমন ক'রে গুরুর সেবা কায়-মনোবাক্যে ক'রে গেছেন—অমন আর দেখা যায় না। তাই তাঁরা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। মানুষকে অমৃতে উপচে দিতে পেরেছিলেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে আগ্রার সৎসঙ্গী দাদাকে নিয়ে বেশ ভাল ক'রে সৎসঙ্গ হ'ল। প্রথমে আহ্বানী ও পুরুষোত্তম বন্দনা হ'ল। তারপর সুরেশদা (মুখার্জ্জী), সেই দাদাটি এবং বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি হিন্দী বই পড়লেন। তারপর সত্যানুসরণ পড়া হ'ল। বিনতি-প্রার্থনার পর একটু অশোভনভাবেই একটি দাদা হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করলেন। এতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর চোখ-মুখ লাল হ'য়ে

উঠলো, মাথা ধ'রে গেল। পরে কয়েকজনকে ডেকে খুব ভৎ'সনা করলেন—বলি! আমাকে এভাবে insult (অপমান) করার মানে কী? হুজুর মহারাজের বই পড়া হচ্ছে তার মধ্যে 'সত্যানুসরণ' আমার সামনে পড়ার দরকার কী ছিলো? সব যেন একটা বাজারী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মানুষ দেখে মনে করবে যে আমি যেন একটা অবতার সেজে কতগুলি স্তাবক নিয়ে আছি। তোমাদের কারও সামনে যদি কেউ বলে—তোমাকে দিয়ে তোমার পিতৃপুরুষ ধন্য হয়ে গেছে, তাহ'লে কেমন লাগে? যারা আত্মপ্রশংসা শুনতে পছন্দ করে, তারাই আজকের মত এমন কাণ্ড করে। সবচাইতে বিশ্রী করেছে রমেশ। ঐভাবে প্রণাম মন্ত্র পাঠ করার দরকার ছিল কি? পুরুষোত্তম-বন্দনাটাও আমার সামনে করা ঠিক হয়নি।

প্রফুল্ল—ঠাকুর, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না প্রার্থনার সময় আপনার সামনে আপনার বাণী পাঠ করায় কী দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাচ্ছলে হয়, সে একরকম। আমি যাঁদের ভক্তি করি, আমার সামনে তাঁদের কথা হয়, তাই আমার ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে আগ্রার ভাইটি আজ উপস্থিত ছিলেন, তাঁর সামনে হুজুর মহারাজের বাণী ভাল ক'রে পাঠ ও আলোচনা হ'লে আমাদের কাছেই আরও উপভোগ্য হ'ত। তাঁর কোন কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার নাম উল্লেখ না ক'রে আমার যা' বলা আছে তার সাহায্য গ্রহণ করলে দোষ হ'ত না। তোমার সামনে তোমার গুণগান করতে লাগলে তোমার কেমন লাগে তা' আমি একদিন দেখিয়ে দেবো। ও একরকমের শাস্তি-বিশেষ।

প্রফুল্ল—কতবার ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় আপনার সামনে তো পুরুষোত্তম-বন্দনা ইত্যাদি করা হয়েছে। তাই ওটা করায় যে দোষ হবে তা' আমরা বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমার পছন্দ নয়, কেষ্টদার খুব ইচ্ছা, তাই হয়েছে। সৎসঙ্গ আমার সামনে না করাই ভালো। একটু দূরে করতে হয় এবং এমনভাবে করতে হয় যাতে প্রত্যেকেই, এমন-কি বাইরের লোক পর্য্যন্ত রস পেয়ে যায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাকে যদি প্রশংসা করতে হয় সেটা করা উচিত তোমাদের কাজের ভিতর-দিয়ে, তোমাদের চরিত্রের ভিতর-দিয়ে, তোমাদের সৌজন্যের ভিতর-দিয়ে। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকের চলনা যেন লোককে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে এবং প্রত্যেকেই যেন শতমুখে তোমাদের প্রশংসা আমার কাছে এসে করে। তোমরা প্রশংসনীয়

কাজ করলে, তোমরা প্রশংসিত হ'লে আমি যে কতখানি আত্মপ্রসাদ লাভ করি তা' ব'লে বোঝাতে পারি না। তখন আমি বুঝি যে তোমাদের দিয়ে পরোক্ষে আমি প্রশংসার ভাগী হ'লাম। আর, সেইটেই আমার খুব ভাল লাগে। আমার সামনে আমার মৌখিক স্তুতি না ক'রে তোমরা সতত তোমাদের জীবন ও চরিত্র দিয়ে কায়মনোবাক্যে যদি পরমপিতার স্তুতি কর, তাতেই আমি সুখ পাই। আমার যা' বলা আছে, তোমরা যদি সেই পথে চল, তাতে আমি সোয়াস্তি পাই। কারণ, সেই পথে ঠিকভাবে চললে অমঙ্গল বা বিধ্বস্তি তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

জ্‌ঁইমা সুবোধদার (সেন) ডাক্তারীর বিষয় কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সার কথা না ভেবে রোগীকে সুস্থ ক'রে তোলার কথা, স্বস্তি দেবার কথা বড় ক'রে ভাবতে হয়। আর, নাম খুব ক'রে করতে হয়। ওতে মাথা খুলে যায়। বিচারে বড় একটা ভুল হয় না। সেই কতদিন আগে গণ্ডগ্রামে ডাক্তারী ক'রে মাসে average (গড়পড়তায়) ৫০০ টাকা ক'রে আয় করেছি। আর, সকাল-সকাল সুস্থও হ'য়ে উঠতো প্রায় সকলে। কোন রোগী হাতে নিলে, তাকে ভাল ক'রে না তোলা পর্য্যন্ত আমার ভাল লাগত না। তার ভাল খবর পাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করতো। কত সময় without visit (দর্শনী ছাড়া) রোগীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসেছি। বার-বার ঐভাবে গেলে prestige (মর্য্যাদা) থাকে না, তাই কখনও-কখনও রোগীর বাড়ীর আশপাশ দিয়ে ঘুরতাম। যাতে রোগীর বাড়ীর কোন লোকের সাথে দেখা হয় ও সে আমাকে তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। পর কাউকে দেখলাম না, পর কাউকে পেলাম না। প্রত্যেকেই আপন। তাই প্রত্যেকের জন্যই রকম-রকম হাঁকপাকানি লেগেই থাকে প্রাণে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন। কাছে অনেকেই আছেন।

জ্‌ঁইমা বললেন—আমার মনে হয়, সবই বরাতের উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরাত মানে ভাগ্য, আর ভাগ্য মানে ভজনা। যার ভজনা অর্থাৎ সেবা যেমনতর ভাগ্যও তেমন হয়। আমরা যা'-কিছু পাই তা' পরিবেশ থেকেই পাই। পরিবেশকে সেবায় আমরা যত উচ্ছল ক'রে তুলতে পারি আমাদের প্রাপ্তিটাও তত উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। মূল জিনিষ হ'ল ইষ্টের প্রতি টান। সেই টান যার উদগ্র হয়, সে ইষ্টের প্রীত্যর্থে ইষ্ট ও পরিবেশের সেবায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। তখন আর মানুষের অভাব থাকে না। তার মনও যেমন ভরা

থাকে, বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যেও সে তেমনি ভরপুর হ'য়ে ওঠে। অভাবটা আসে ভাবের অভাব থেকে। ভাবের মধ্যে আছে হওয়া। যে ইষ্টের হয়, সে সকলের আপনজন হ'য়ে ওঠে। কাউকে সে পর মনে করে না। তাই, সেবা তার মধ্যে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। এই সেবা যে সে করে তা' প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় করে না। সেবা না ক'রে পারে না, তাই সেবা করে। এই প্রত্যাশাহীন সেবাই পাওয়ার পথ। পরমপিতাকে ভালবাসাই ভাগ্যের জনক।

জুঁইমা—মানুষ যা'ই করতে যাক তার মধ্যেই অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে টান থাকলে মানুষ কোন বাধা-বিঘ্নেই দমে না। বাধার সম্মুখীন হ'য়ে সে আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বাধাকে জয় করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে। তার প্রধান নেশা হয় কৃতকার্য্যতা লাভ ক'রে ইষ্টকে নন্দিত করা, তাই সে বাধাকে উন্নতির সহায়ক ক'রে তোলে। বাধা যত মানুষ অতিক্রম করে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। বাধায় তার লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। সবটা মনের উপর নির্ভর করে। অবশ্য, শরীরটাও ভাল রাখা চাই। শরীর ভাল না থাকলে মানুষ তার করণীয় ঠিকভাবে করতে পারে না। তবে মন যার ভাল-বাসাময় তার শরীরও ঐ ভালবাসার সম্বেগে ধীরে-ধীরে ভাল হ'য়ে ওঠে। সৎ-চিন্তা, সৎকর্ম্ম, সৎ-সম্বেগ মনকেও যেমন পুষ্ট করে, শরীরকেও তেমনি পুষ্ট করে। মানুষের শারীরিক ব্যাধির মূলে মনের গোল কিছু-না-কিছু থাকেই। মনের গোল যার যত মিটে যায়, তার শরীরও তত ভালর দিকে চলে। অবশ্য, শরীর সুস্থ রাখার জন্য শরীরের নিয়ম যা'-যা' পালন করার তা' করাই লাগে।

জুঁইমা—ভাল করতে গিয়ে কেন মন্দ হয়, ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেটা সব সময় বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অপচয় হয়। একদিক থেকে যেমন উপচয় হয়, অন্য দিক থেকে তেমনি কিছুটা ক্ষয় হয়। তরকারি রান্না হ'ল, মশলা কমলো, মশলা পুরিয়ে না রাখলে পরে তরকারি রান্না বন্ধ হ'য়ে যাবে। সেইজন্য সবদিকে লক্ষ্য রেখে এমনভাবে চলতে হবে যাতে চলার ক্রমাগতি, করার ক্রমাগতি এন্তার এগিয়ে চলে। যার কাছ থেকেই আমি নিই আমার সব সময় লক্ষ্য থাকে তাকে আরো-আরো উপচে দেওয়া। হয়তো পারিপার্শ্বিককে ব'লে নানাভাবে বিন্যাস ক'রে তার পাওয়ার পথটা প্রশস্ত ক'রে দিই। নয় তো 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?' এইরকম হ'লে কিছুই হ'ত না। আমার এত যে গেছে, নষ্ট হয়েছে তাতে আমি একটুও

দমিনি। আমি জানি, মানুষই আমার সম্বল। মানুষগুলিকে যদি তাজা রাখতে পারি তাহ'লে আমার কোন ভাবনা নেই। তোমরাও সেইভাবে চলবে। দেখবে কোন ক্ষয়-ক্ষতি তোমাদের কাবু করতে পারবে না। ভগবান আমাদের অনন্ত শক্তি দিয়েছেন। চাই সে-শক্তির সদ্ব্যবহার। কোন মন্দে ঘাবড়াতে নেই। সব সময়ই পরম-পিতার উপর মন রেখে যে-অবস্থায় যা' করণীয় তা' ক'রে চলতে হয়। অমঙ্গলকে মঙ্গলের হেতু ক'রে তুলতে হয়। যা' চ'লে যায়, তার জন্য আপসোস না ক'রে, বর্ত্তমান করণীয়ের দিকে মন বেশী ক'রে দিতে হয়। অনেক জিনিষ আছে যার উপর আমাদের কোন হাত নেই। সেগুলি ধীর চিত্তে মেনে নিতে হয়। এই যে দেশ-বিভাগ হ'ল, এটা আজ আমাদের হাতের বাইরে। কিন্তু আমি যা'-যা' করতে বলেছিলাম তা' যদি সময়মত করা হতো তাহ'লে এটা এড়ানো অসম্ভব ছিল ব'লে আমি মনে করি না। যা'হোক, যা' হবার তা' হয়েছে। এখন চলাটা এমন হওয়া চাই, যাতে বিপর্য্যয় এড়িয়ে মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যায়।

জুঁইমা—আপনার চলার স্রোত তো রুদ্ধ হয়নি, আমাদের চলার স্রোত তো রুদ্ধ হ'তে চললো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার স্রোত ছাড়া তোমার আবার অন্য স্রোত কী আছে? আমাদের সকলেরই চলার স্রোত এক। আমাদের গন্তব্য হ'লেন পরমপিতা। তাঁর পথে তাঁর দিকেই চলতে হবে আমাদের পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে। শুধু নিজের কথা ভাবলে হবে না। ভাবতে হবে সকলের কথা। পরিবেশের মঙ্গল ছাড়া তোমার-আমার মঙ্গল হ'তে পারে না। পরমপিতাই হ'লেন আমাদের সকলের পথ। সর্ব্বদা ভাববে কেমন ক'রে সকলকে নিয়ে পরমপিতার পথে চলতে পার। এই চলার ভিতর-দিয়ে পাবে বাঁচার পথ।

প্রফুল্ল—একটা মানুষ যদি অর্থনৈতিক জীবনে বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে তাহ'লে সবটা সুবিন্যস্ত ক'রে নিতেও তো একটা সময় লাগে। কিন্তু তার আগেই যদি সে সাবাড় হ'য়ে যায় তাহ'লে উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল ইষ্টসর্ব্বস্ব হওয়া এবং ইষ্টার্থে লোক সংগ্রহ করা। যে মানুষ উপায় করতে না পারে, মানুষকে যে উচ্ছল ক'রে তুলতে না পারে তার অর্থনৈতিক জীবন কখনও সুদৃঢ় হ'তে পারে না। ইষ্টার্থে মানুষ অর্জ্জন করার সামর্থ্য যে অর্জ্জন করে, প্রলয়েও সে নষ্ট পায় না। এই হ'ল পরমপিতার বিধান। পরমপিতার দয়ায় তোমরা যা' পেয়েছো তার তুলনা নেই। কোন বিপর্য্যয়ই তোমাদের বিধ্বস্ত করতে পারবে না, যদি কিনা তোমরা পরমপিতার পথে অটুটভাবে চলতে পার।

১০ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। কাছে অনেকেই উপস্থিত আছেন।

মলিন ভাই প্রশ্ন করলেন—রাশিয়ার কম্যুনিজম তো বাঁচাবাড়া চায়, আমরাও তাই চাই। এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের কম্যুনিজমের রূপ তো আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়, তারা যদি বাঁচাবাড়া চায় তাহ'লে ঘুরে-ফিরে আমাদের রকমটাতেই এসে দাঁড়াবে, অবশ্য তাদের মত ধরণে। শুনেছি, রাশিয়া co-education (সহ-শিক্ষা) তুলে দিচ্ছে। আর্য্যভারতও চায় পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষা ও বিবর্দ্ধন। আমাদের কম্যুনিজমে সহজাত সংস্কার-ভিত্তিক বিভিন্ন বর্ণ বা community (সম্প্রদায়) আছে। তাদের মধ্যে আছে পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতা। প্রত্যেক বর্ণই জানে যে অপরাপর বর্ণের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। তাই, সে তার বর্ণোচিত কর্ম্ম দিয়ে সমাজকে সেবায় পুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধিত করে, যাতে কিনা সে অপরাপর বর্ণের সাহায্য, সহযোগিতা ও সেবা ঠিকমত লাভ করতে পারে। এই পারস্পরিকতা ছাড়া কেউ দাঁড়াতে পারে না। শুনেছি, আজকাল রাশিয়ায় প্রত্যেকের profession (বৃত্তি) selected (নির্ব্বাচিত) হয় according to inborn instincts and capacities (সহজাত সংস্কার ও ক্ষমতা-অনুযায়ী)। এর মধ্য-দিয়ে বর্ণধর্ম্মের মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে বলা চলে। 'যেখানে-সেখানে ঘোর রে মাকু, চরকি ছাড়া নয়।' বর্ণ-বিধানে কেউ কারও বৃত্তি হরণ করতে পারে না। এতে unemployment (বেকারত্ব) থাকে না। Undue competition (অবিহিত প্রতিযোগিতা) থাকে না। কেউ জীবিকাহীন বা নির্ধন থাকে না। প্রত্যেকেরই তার মত ক'রে আয়ের পথ প্রশস্ত থাকে। তাতে কাউকে দারিদ্র্যে কষ্ট পেতে হয় না। বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রতিটি শ্রেণী ও প্রতিটি ব্যক্তি স্ববৈশিষ্ট্যে, আপন ছন্দে বাঁচাবাড়ার সুযোগ পায়। বর্ণাশ্রম proper education, proper occupation ও proper marriage-এর (বিহিত শিক্ষা, বিহিত জীবিকা ও বিহিত বিবাহের) উপর খুব লক্ষ্য রেখে চলে। তাই, প্রত্যেকটা মানুষ বেড়েই চলে গুণে ও ধনে। বর্ণাশ্রমের শিক্ষাটা হ'ল দীক্ষাভিত্তিক যাতে কিনা মানুষের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থা থাকে ব'লে বর্ণাশ্রমী সমাজ individual (ব্যক্তি)-কে independence (স্বাধীনতা) দিতে ভয় পায় না।

আর, এ-কথাও ঠিক যে সমীচীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ঠিকভাবে স্ফুরিত হ'তে পারে না। অবশ্য, কেউ যদি তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ঠিকভাবে পালন না করে, তাকে সামাজিক শাসনের আওতার মধ্যে প'ড়ে যেতে হয়। আদর্শনিষ্ঠা যেমন যোগায় ভাল হ'য়ে চলার প্রেরণা, সামাজিক শাসনের ভীতি তেমনি যোগায় সমাজবিরোধী চলন পরিহার ক'রে চলার বুদ্ধি। এইভাবে মানুষগুলি অনেকটা ঠিক থাকে। আর, মানুষগুলি মোটামুটি ঠিক থাকলে জীবনের কোন ক্ষেত্রে খুব বড় রকমের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'তে পারে না।

মলিন—মানুষের সব প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মেটে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা এই, মানুষ চায় ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচাবাড়া। মানুষ শুধু বেঁচে থেকেই খুশী নয়, সে চায় বৃদ্ধির পথে চলতে। Go of life (জীবনচলনা) scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'লে মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া দুই-ই shattered (বিচূর্ণ) হ'তে বসে। সেটা এড়াতে গেলে চাই concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তার জন্য দরকার একটি মানুষের শরণাপন্ন হওয়া যাঁর মধ্যে কিনা বাঁচাবাড়া মূর্ত্ত। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' ব্রহ্মবিৎ ছাড়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অসম্ভব। ব্রহ্ম হ'লেন সর্ব্বতোমুখী বৃদ্ধির প্রতীক। ব্রহ্মবিৎ-এর অনুসরণে আসে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ বৃদ্ধির জ্ঞান। এই জন্য প্রথমে তাঁর কাছে initiation (দীক্ষা) নিতে হয়, initiation (দীক্ষা) নিয়ে তাঁকে follow ও fulfil (অনুসরণ ও পরিপূরণ) ক'রে চলতে হয়। প্রত্যেকে fulfil (পরিপূরণ) করবে তাঁকে তার সহজাত কর্ম্ম দিয়ে। ব্রহ্মবিৎ হ'লেন সকলের common Ideal (অভিন্ন আদর্শ)। এই common Ideal (অভিন্ন আদর্শ)-কে অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যে আসে integration (সংহতি)। তাতে power ও piety (শক্তি ও ধর্ম্ম) দুই-ই মাথা তোলা দেয়। তাতে কারও কোন প্রয়োজন অসিদ্ধ থাকে না। আমরা বলি সত্তা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মনে সাড়া, আনন্দ মানে বাড়া। এই-ই সত্তার চিরন্তন স্বরূপ। প্রত্যেকেই তার মত ক'রে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি factor (উপাদান) রকমারি-ভাবে অনুস্যূত আছে। তার মধ্যে আবার আছে আত্মরক্ষা, আত্মপোষণ ও আত্মবিস্তারের আকৃতি। একটা পিঁপড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত এটা আছে। ধর্ম্মের মধ্যে আছে সপরিবেশ নিজেকে ধারণ, পালন ও পোষণ ক'রে চলা। আদর্শানুসরণের ভিতর-দিয়ে ধর্ম্মকে যারা realise (উপলব্ধি) করে, তারা হ'ল সমাজের

teacher (শিক্ষক)। তাদের কাজ হ'ল Ideal-কে (আদর্শকে) infuse (সঞ্চারিত) করা। এই কাজটি বাদ পড়লে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় আসতে বাধ্য। তাই আমি এত ক'রে যাজনের কথা বলি, দীক্ষাদানের কথা বলি। তাতে সবগুলি community (সম্প্রদায়), সবগুলি individual (ব্যক্তি) inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠবে। সবার মধ্য-দিয়ে fulfilled (পরিপূরিত) হবেন সমাজের মাথা ঐ ব্রহ্মবিৎ আদর্শপুরুষ। এমনি ক'রে সকলের জন্য সকলে হবে। সকলে মিলে যেন আদর্শানুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত মাত্র একটি মানুষে পরিণত হবে। তখন কারও দুঃখ বা অভাবে কেউ উদাসীন থাকতে পারবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিছনে দাঁড়াবে। এই হ'ল Indo-Aryan socialism বা Communism (আর্য্যভারতীয় সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম)-এর স্বরূপ। Commune (সঙ্ঘ) মানেই হ'ল to serve together, to oblige together (একসঙ্গে সেবা করা, একসঙ্গে বাধিত করা)। তা' বাদ দিয়ে যে কম্যুনিজম তা' হ'ল নিষ্প্রাণ। এক কথায়, আদর্শ-নিষ্ঠ পারস্পরিক সক্রিয় প্রীতি ও সেবাই হ'ল ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলের পথ, আর তাকে তোমরা যে-নামেই অভিহিত কর না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

মলিন—Class-war (শ্রেণী সংগ্রাম) না হ'লে ধনী-দরিদ্র-বৈষম্য দূর হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়কে ছোট নয়, ছোটকে বড় করাই কাজের মত কাজ। আমরা কাউকে দরিদ্র থাকতে দেব না, কাউকে অযোগ্য থাকতে দেব না। Class-war (শ্রেণী সংগ্রাম) নয়, class-fulfilment (বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক পরিপূরণ) চাই। প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের হয় সেই ব্যবস্থাই করা লাগে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা লাগে যাতে কেউ কারও ক্ষতি করার কথা কল্পনায়ও না আনতে পারে, বরং আত্মস্বার্থের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাল করার জন্য হন্যে হ'য়ে ওঠে। কেউ কারও ক্ষতি করলে সমাজের আর দশ-জনেরই উচিত সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তা'তে মানুষ অকাম করতে সাহস পায় কম। ধনী হোক, দরিদ্র হোক, যার মধ্যে evil (অসৎ) যা' সেই প্রবণতাকে মারতে পার, অবশ্য সবচেয়ে ভাল হয় যদি ভালর দিকে তার মোড় ফেরাতে পার, কিন্তু ভালটা মারলে দাঁড়াবে কোথায়? তাই সব জিনিষ মেজে-ঘসে ঠিক ক'রে তোল, বিহিত পন্থায় প্রত্যেকের দোষ যথাসম্ভব কমাও, গুণ যথা-সম্ভব বাড়াও। কোন জিনিষ ঝাড়ে-মূলে নষ্ট করলে তার সুফল থেকে বঞ্চিত হবে। ধনীকে যদি নিশ্চিহ্ন কর, তবে তার বৈশিষ্ট্যগত যোগ্যতা ও সদ্‌গুণ যদি

কিছু থাকে, তাও নিশ্চিহ্ন হবে। তুমি বলতে পার না যে সমাজে ঐ যোগ্যতা ও সদ্‌গুণের কোন উপযোগিতা বা প্রয়োজন নেই। কোন শুভ বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করার কথা আমি ভাবতে পারি না। ওর মত সর্ব্বনাশা জিনিষ আর নেই। আজ যার দোষের দিকটা বড় ক'রে ভেবে তাকে খতম দিচ্ছ, খতম করার পর কাল হয়তো দেখতে পাবে, তার মধ্যে এমন গুণ ছিল যার অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে তোমার পক্ষে। তখন মাথাকুটেও তুমি তা' আর পাবে না। আমের মধ্যে different variety (বিভিন্ন শ্রেণী) আছে। কোন variety (শ্রেণী) নষ্ট করলে, তা' কিন্তু চিরদিনের জন্য হারালে।

মলিন—যদি কোন variety (শ্রেণী) নিছক খারাপ হয়, তাহ'লে তা' নষ্ট করায় দোষ কী? আর, নষ্ট যদি না করা হয়, তাকে ভাল করারই বা উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিছক খারাপ যাকে বলছ, তাও হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে। তাই, কোন-কিছুকে নষ্ট করার আগে ভেবে দেখা উচিত। আবার, খারাপ আমকে ভালর সঙ্গ কলম লাগিয়ে ভালও ক'রে তোলা যায়। সামাজিক জীবনে অনুলোম বিয়েটা খুব ভাল জিনিষ। এতে নীচু উপরের দিকে ওঠে, সন্তানও ভাল হয়। অবশ্য, সবর্ণ নিয়ে বাদ দিয়ে কখনও অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে হওয়া উচিত নয়। তা'তে বংশের নিজস্ব মূল বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'য়ে যায়। প্রতিলোম বিয়ে কিন্তু বিশ্রী জিনিষ। তুমি যদি অপকৃষ্ট ঘরে মেয়ে দাও তাতে তোমার মেয়ে less (ন্যূন) হবে, uncultured (অপকৃষ্ট) হ'য়ে তা'তে পর্য্যবসিত হবে। ভেবে দেখতে হবে, আমরা pulverise (গুঁড়ো) করতে চাই, না crystallise করতে (দানা বাঁধতে) চাই! জাতিকে, সমাজকে, বংশকে up (উন্নত) করতে চাই, না down (অবনত) করতে চাই! প্রতিলোম চালু হ'লে সমাজে সংহতি থাকবে না, love (ভালবাসা) থাকবে না, sympathy (সহানুভূতি) থাকবে না, Ideal (আদর্শ) থাকবে না। কারণ, ঘরে-ঘরে অশ্রদ্ধা, অবনিবনা, অকৃতজ্ঞতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিধ্বংসিতা প্রবল হ'য়ে উঠবে। একে-একে মুর্গীর মত জবাই হ'য়ে যাবে সারা জাতটা। একজন যখন বিপন্ন হবে, অন্য কেউ তার বিপদকে নিজের বিপদ মনে ক'রে তার উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে না, বরং নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। এর ফলে কেউ রেহাই পাবে না। কারও বাঁচাবাড়াকে যদি ব্যাহত হ'তে দাও, তবে তার ফলে তোমার বাঁচাবাড়াও একদিন ব্যাহত হ'তে বাধ্য। এইটে বুঝে চ'লো। এই হ'ল চলার পথের ফিতে,

এই ফিতে দিয়ে মেপে-মেপে পথ চল। বর্ণাশ্রমভিত্তিক ভারতীয় সমাজতন্ত্রের কল্যাণকর স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে সুন্দর-সুন্দর বই লিখতে হয়। যারা জানে না, বোঝে না, তারা লেখে, তাই গোলমাল হ'য়ে যায়। ভাল ক'রে ফুটিয়ে লিখতে পারলে দুনিয়ার তাক লেগে যেত!

মলিন—ভারতের রাজনীতি যে-পথে পরিচালিত হচ্ছে; সে-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করা হ'চ্ছে ও হয়েছে, তার পিছনে surrendered (আত্ম-নিবেদনপরায়ণ) আচার্য্য যদি থাকতেন এবং তাঁতে সকলের surrender (আত্ম-নিবেদন) যদি থাকত, কী কাণ্ড ঘটে যেত বলা যায় না। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে, গুরু বাদ দিয়ে, দীক্ষা বাদ দিয়ে, গুরুভক্তি বাদ দিয়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা বাদ দিয়ে যে movement (আন্দোলন)-ই করা হোক না কেন, তা' গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার সামিল হয়। তাতে কাজের চাইতে অকাজ বেশী হয়। নইলে কি আর দেশটা দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে যায়? এই দেশভাগে হিন্দুরও লাভ হয়নি মুসলমানেরও লাভ হয়নি। India undivided ও intergrated (ভারতবর্ষ অবিভক্ত ও সংহত) থাকলে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রতিটি নরনারী ঢের বেশী সুখী ও সমৃদ্ধ হ'ত। আজ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই দুর্ব্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করবে অপরে। আজ আমরা নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিই, অথচ আমাদের মূল স্তম্ভগুলি আমরা জানি না, মানি না। তা' ঠিক নয়। আমাদের উচিত এক ও অদ্বিতীয়কে মেনে চলা, পূর্ব্বতন ঋষি মহাপুরুষদের প্রতি নতি-সম্পন্ন হওয়া, পিতৃপুরুষগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে চলা, বর্ণাশ্রমের সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যকে বাস্তবে অনুসরণ করা, অর্থাৎ সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাস করা, এবং সর্ব্বোপরি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইদানীন্তন মহাপুরুষ যিনি তাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে চলা। সবাই এই রকমে চললে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই এক মায়ের পেটের ভাইয়ের মত হ'য়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবকাশই থাকে না। পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তীকে মানার কথা সব ধর্ম্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাই আমার মনে হয়, ধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন নীতিগুলি সকলের মধ্যে চারান ভাল। তাতে রাজনীতি বা শ্রেষ্ঠ নীতির সুষ্ঠু অনুশীলন হয় বাস্তবে।

মলিন—কম্যুনিষ্টরা বলে আগে matter (বস্তু), পরে spirit (আত্মা), আমাদের মতে তো আগে spirit (আত্মা), পরে matter (বস্তু)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Matter ও spirit (বস্তু ও আত্মা) আলাদা নয়। আদতে

জিনিষ এক, শুধু দুই standpoint (দৃষ্টিকোণ) থেকে দুই রকমের বলা। আমার মনে হয় matter ও spirit (বস্তু ও আত্মা) অবিচ্ছেদ্য। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। Spiritual (আত্মিক)-এর working-এর (ক্রিয়াশীলতার) জন্য তদনুপাতিক material adjustment (ভৌতিক-বিন্যাস) অবশ্য প্রয়োজন। আমরা বলি সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ, তার অর্থ হ'ল materialised spirit of সচ্চিদানন্দ '(সচ্চিদানন্দের মূর্ত্তনাদীপ্ত আত্মা)। আমি বুঝি বাস্তবজগতে misery (দুঃখ)-কে যদি আমরা materially impossible (বাস্তবে অসম্ভব) ক'রে তুলি, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তেমনতর material adjustment (বাস্তব বিন্যাস) যদি আমরা করতে পারি, spiritually (আত্মিকভাবে)-ও একদিন misery (দুঃখ) impossible (অসম্ভব) হ'য়ে উঠবে। তাই আমি বলি এমনতর material adjustment (বাস্তব বিন্যাস) ক'রে তোল, যাতে মরতে না হয়, মারতে না হয়, বরং মৃত্যুকেই মরণ বরণ করতে হয়। Material plane-এ (আত্মিক স্তরে) আমরা দুঃখ জয়ের যে সাধনা করব, তাও যেন thorough (সুসম্পূর্ণ) হয় এবং spiritual plane-এ (আত্মিক স্তরে) আমরা দুঃখজয়ের যে সাধনা করব, তাও যেন thorough (সুসম্পূর্ণ) হয়। এই দ্বিমুখী চেষ্টা যদি flawlessly (নির্ভুর্লভাবে) চলে, তবে আমাদের success (সাফল্য) অনিবার্য্য। এই যা' বললাম—in a nutshell (ক্ষুদ্রাকারে) Aryan philosophy (আর্য্যদর্শন)-এর সবখানি এতে আছে।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হ'য়ে আসলো। তাই অনেকেই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

এমন সময় কাজলভাই এসে আবদারের সুরে বললেন—বাবা, তুমি উঠবা না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি যখন বলছ, তখন ওঠাই তো লাগে। দাঁড়াও, একটু তামুক খেয়ে নিই। তুমি কী বল ?

কাজলভাই—হ্যাঁ ! তোমার ভাল লাগলে খাবেই তো !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মা'র শরীর ভাল আছে তো ?

কাজলভাই—হ্যাঁ !

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে স্নান করতে গেলেন।

১১ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪।২।১৯৪৮)

আজ মাঘী পূর্ণিমা। এখন সন্ধ্যা সাতটা। জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে যাচ্ছে চতুর্দ্দিকে। ইদানীং শীতটা ক'মে গেছে। বাতাসের মধ্যে জেগেছে বসন্তের

আমেজ। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-প্রাঙ্গণে সামিয়ানার নীচে চৌকিতে ব'সে আছেন। দাদারা ও মায়েরা তাঁর প্রাণজুড়ান মধুর সান্নিধ্যে পরম তৃপ্তি উপভোগ করছেন। একটু দূরেও কিছু-কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় কবিরাজ মহাশয়ের (নলিনীবাবুর) গাড়ী আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—চেয়ার নিয়ে আয়।

গোপেনদা (রায়) দৌড়ে চেয়ার আনতে গেলেন। ততসময় কবিরাজ-মহাশয় ছোট বেঞ্চে ব'সে পড়েছেন।

পরে গোপেনদা চেয়ার আনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি বেঞ্চ থেকে উঠে চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বললেন—আমি আগে কত ছুটোছুটি করেছি। কিন্তু এখন শরীরটা আমার কাছে যেন বোঝার মত লাগে। সোয়াস্তি পাই না, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। ঘুমটা ভাল হয় না। হজমের গোলমাল আছে। কখনও-কখনও উদ্গার ওঠে। বুকের মধ্যে মাঝে-মাঝে থগবগ-থগবগ করে। মাথাটাও দুই-এক সময় ভার হ'য়ে থাকে। সর্দ্দিকাশির উদ্বেগও টের পাই। তা'ছাড়া, আমার বড় অযথা দুশ্চিন্তা হয়। হয়তো আপনি গাড়ীতে আসছেন। মনে হয় কবিরাজ-মহাশয় ঠিকমত আসতে পারবেন তো? না রাস্তায় আবার কোন বিপদ ঘটে! এই ধরণের রকম-রকম উদ্বেগ ও ভয় লেগে থাকে।

তারপর কবিরাজ-মহাশয় নাড়ী দেখে অভয় দিয়ে বললেন—চিন্তার কোন কারণ নেই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

এরপর সুশীলদার লিখিত একখানি চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টর্চটা ধর তো।

সরোজিনীমা টর্চ জ্বালিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নীচু ক'রে ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে টর্চের আলোতে চিঠিটা পড়লেন। চিঠিতে সংবাদ আছে যে শ্রীযুত এন. সি. চ্যাটার্জ্জী সপরিবারে সত্বর দেওঘরে আসবেন এবং এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকবেন!

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—তাড়াতাড়ি বড়খোকাকে চিঠিটা দেখিয়ে আন্ গিয়ে। তার কানে সংবাদটা গেলে, যা'-যা' ব্যবস্থা করার সে-ই করতে পারবে। অমন দায়িত্বশীল মানুষ আর দ্বিতীয়টা দেখি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় পরে গোলঘরে এসে বসলেন। কবিরাজ-মহাশয় আবার আসলেন। সঙ্গে আসলেন প্রমথদা (দে), সুরেনদা (শূর) প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কবিরাজ-মহাশয় যদি আমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ ক'রে দিতে পারেন খুব ভাল হয়। দেশের এ-দুঃসময়ে অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে থাকা চলে না। লোকরক্ষণা ও লোকবর্দ্ধনার জন্য আমাদের ঢের করণীয় আছে। বহুদিন থেকে আমাদের দেশে এই basic nurture (মৌলিক পোষণ)-টা neglected (উপেক্ষিত) হ'য়ে আছে। তাই মানুষের এত অনটন সর্ব্বত্র। উপযুক্ত মানুষ গজিয়ে তুলতে না পারলে কিছুতেই কিছু হবে না। মানুষের সম্পদ মানুষ, মাটিও নয়, টাকাও নয়। এই মানুষ অর্জ্জন ক'রে যে তাকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে, সে সব পারে। নিজে পরমপিতার হ'তে হয়, মানুষকে পরমপিতার ক'রে তুলতে হয়। তা' হ'তে ও করতে পারলে কিছুই বাকী থাকে না। নারায়ণকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর পূজো করতে গেলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হ'য়ে ওঠেন, নারায়ণের অনুগত ও অনুরাগী হ'য়ে চললে, চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হন। অনভ্যাসে মানুষের বোধ মলিন হ'য়ে গেছে, চলনা শিথিল হ'য়ে গেছে। তাই প্রত্যেককে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা লাগবে, প্রত্যেকের পিছনে খাটা লাগবে। আমার শরীর আপনি ঠিক ক'রে দেন।

কবিরাজ-মহাশয়—আমি নিমিত্ত মাত্র। ভগবানের দয়ায় আপনি ঠিক হ'য়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে-মাঝে বিষম খেয়ে আমার অসম্ভব ব্যাপার হয়। পেটে বায়ু হ'য়েও কষ্ট পাই। সব দিকে লক্ষ্য ক'রে ওষুধ দেবেন। রোগী, রোগ, ওষুধ—তিনের সামঞ্জস্য চাই। কোন রোগী কিন্তু কোন রোগীর মত নয়।

কবিরাজ-মহাশয়—আয়ুর্বেদে আছে, রোগী, চিকিৎসক, ঔষধ ও পরিচারক এই চতুষ্পদের সামঞ্জস্য চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এক আগন্তুক রোগ হ'ল এই দাঁতের trouble (উপসর্গ)।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Blood Pressure-এ (রক্তের চাপে) তেঁতুলের বীচির কিন্তু অসম্ভব গুণ। ননীমা খুব উপকার পেয়েছে।

কবিরাজ-মহাশয়—কিভাবে সমাজের উন্নতি হবে আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল একদল বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে উঠে-প'ড়ে লেগেছে, প্রতিলোম বিবাহ চালু হ'তে চলেছে। এর মত অপরিণামদর্শিতা আর নেই। এতে মানুষের সুষ্ঠু জৈবী দানাই ভেঙ্গে যাবে। অত' বড় ক্ষতি আর হ'তে পারে না। আজকাল হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ করান নিয়ে যে তোলপাড় হ'চ্ছে, সে তোলপাড়টা হওয়া উচিত ছিল তাদের সদাচারী ও সমুন্নত ক'রে

তোলার জন্য। সদাচারী শূদ্রের মন্দির-প্রবেশে কোন বাধা থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না। শূদ্রেরও একটা বিশেষ স্থান আছে সমাজে। সে ফেল্‌না নয়। কিন্তু প্রতিলোমজ বাহ্যজাতি স্বভাবতঃই সমাজবিধ্বংসী সংস্কারসম্পন্ন হয় ব'লে তাদের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করা সম্পর্কে শাস্ত্রের বিধান অতি কঠোর। অনেকে মনে করে বর্ণাশ্রম বৈষম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে যতখানি পরিপূরক, সে ততখানি বড় ব'লে গণ্য হওয়া উচিত। এই তো সাধারণ বিধি। এর মধ্যে বৈষম্য কোথায় ?

বর্ণাশ্রমে প্রত্যেক বর্ণের উপজীবিকা তার instinct (সহজাত-সংস্কার)-অনুযায়ী ভাগ করা ছিল। তাই কেউ বেকার থাকত না। ফলে অনটনও ছিল না। কেউ অপরের বৃত্তি অপহরণ করতে পারত না। সমাজ ছিল চারটে বর্ণ নিয়ে। প্রত্যেক বর্ণই প্রত্যেক বর্ণের সহযোগী ও সংরক্ষক হ'য়ে চলত। ইষ্ট ও কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে চলার অধিকার সমাজে স্বীকৃত হ'ত না। কল্যাণ-বিরোধী চলনায় কেউ চললে সমাজ-শাসন তাকে সংযত ক'রে তুলত। ঋষি-আনুগত্য ও ঋষি-অনুশাসনবাহিতাই ছিল সমাজের প্রাণ। তাতে প্রত্যেকেই ক্রমাগত উৎকর্ষের পথে চলত। আমাদের বাপ, বড় বাপ কী ব'লে গেছেন, তা' আমরা আজ খতিয়ে দেখি না। আজ বড়কে ছোট করার চেষ্টা করা হ'চ্ছে, কিন্তু ছোটকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রকৃত উন্নত করা হচ্ছে না। অনুলোম বিয়েয় নীচু উঁচু হ'ত, আজ হ'চ্ছে উল্টো। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন বরাবরই ছিল, অবশ্য প্রথমে বিহিত সবর্ণ বিবাহ না হ'লে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ করা যেত না। যাহোক, রঘুনন্দনের সময় থেকে তা' নিষিদ্ধ হয়েছে। আমার দুই এক সময় মনে হয়, হয়তো বিরুদ্ধ শক্তির চাপ ও চক্রান্তের মধ্যে প'ড়ে তিনি তা' করতে বাধ্য হ'য়েছেন। এর ফলে, হিন্দু সমাজের expansion ও power of absorption (বিস্তার ও আত্মীকরণ-ক্ষমতা) hampered (ব্যাহত) হয়েছে এবং কোন-কোন শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। এর আগে কত invasion (আক্রমণ) হ'য়ে গেছে ভারতে, কিন্তু আজ তাদের কারও trace (চিহ্ন) পাবার জো নেই, অনুলোমক্রমে সবাই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আর্য্যসমাজের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছে। তাতে বৃহত্তর মানব-সমাজের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয়নি। Divine integration-এর (ভাগবত সংহতির) পথ মুক্ত ছাড়া রুদ্ধ হয়নি। আমাদের তাই করণীয় যাতে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সত্তাসম্বর্দ্ধনী আদর্শের পথে চলতে পারে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে। এই ব্যাপারে কারও কোন ক্ষতি হ'লে সে-ক্ষতি তারও যেমন, আপনার আমারও তেমন। তাই,

নিজের ও অপরের ভাল যাতে হয়, তাই করা লাগে—অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকে।

পরে তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার শরীরও খারাপ, কেষ্টদার শরীরও খারাপ। সুশীলদার শরীরটা একটু ভাল। কেষ্টদার শরীরটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারতেন, কেষ্টদা যদি বেপরোয়া খাটতে পারত, তাহ'লেও ঢের হ'ত। অমনতর বুদ্ধিমান মানুষ কমই দেখা যায়।

এরপর কবিরাজ-মহাশয় তখনকার মত বিদায় নিলেন।

১২ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৫।২।১৯৪৮)

শীত ক'মে আসলেও এখনও সকালের দিকে বেশ শীত বোধ হয়। গাছের পাতা ঝরতে সুরু করেছে। কোন-কোন গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়ে উঠছে! একদিকে রিক্ততার দৃশ্য, অন্যদিকে নবীন সৃষ্টির অনুষ্ঠার অনুপ্রবেশ। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে নির্লিপ্ত আনন্দে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। দেখছেন আর অকারণ খুশীতে তাঁর মন ভ'রে উঠছে। মন যদি অনাসক্ত, বন্ধনবিমুক্ত ও সর্ব্বতোব্যাপ্ত হয়, বিহিত একাগ্রতা ও আগ্রহ নিয়ে, তাহ'লে বোধহয় প্রতি পদক্ষেপেই সব যা'-কিছু থেকে এমনি ক'রে আনন্দের রসদ সংগ্রহ করা যায়, আনন্দময় হ'য়ে থাকা যায়। আর, সেই আনন্দময়ের সান্নিধ্যলাভের আশায় মানুষ পাগল হ'য়ে ছুটে আসে। তাইতো সুদূর পাঞ্জাব থেকে ছুটে এসেছেন বেয়াসের সৎসঙ্গী ভাণ্ডারীদা। প্রমথদা (দে), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জ্জী), নীরোদদা (মজুমদার), প্রভৃতিও কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভাণ্ডারীদা প্রণাম করার পর একখানি মোড়াতে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমার গুরুদেব অসুস্থ, কিন্তু তিনি ওষুধ খেতে চান না, বলেন পরমপিতার দয়ায় সারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ভালমন্দ যা'-কিছু করি তা' পরমপিতার শক্তিতেই করি। পরমপিতা চান যে আমরা ভালই থাকি এবং ভালই করি। তাঁকে যারা ভালবাসে তারা ভালই করে। মন্দ কাজ করলে পরমপিতার দেওয়া শক্তির অপব্যবহার করা হয়। তাতে আমাদের নিজেদেরও ক্ষতি হয়, অপরেরও ক্ষতি হয়। আর, তা' কখনও পরমপিতার অভিপ্রেত নয়। যারা তাঁর দিকে যতখানি অগ্রসর হয় তারা ততখানি bliss (আশীর্ব্বাদ)-এর অধিকারী হয়, নইলে তিনি সবার কাছেই সমান। খারাপ লোকের কাছেও তিনি merciful (করুণাময়), ভালো লোকের কাছেও তিনি merciful (করুণাময়)। তবে যার যেমন কর্ম্ম

তাকে তদনুযায়ী ফল পেতে হয়। মূল কথা এই যে তিনি আমাদের কতখানি ভালবাসেন, তা' আমাদের বিচার্য্য নয়, আমরা তাঁকে কতখানি ভালবাসি তাই আমাদের বিচার্য্য। তাঁকে ভালবাসা মানে তাঁর মনোমত হ'য়ে চলা। তিনি জীবনস্বরূপ। তাঁকে ভালবাসলে চেষ্টা হয় কেমন ক'রে প্রতিপ্রত্যেকের জীবনকে সন্দীপ্ত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা যায়।

একটু থেমে স্নেহকোমল দৃষ্টিতে ভাণ্ডারীদার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের বাড়ীর সবাই ভাল আছে ?

ভাণ্ডারীদা—হ্যাঁ !

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করছিলাম এবার যখন দেখা হবে তখন আমাদের আশ্রমের পুনর্গঠন সম্পর্কে তোমাকে বলব।

ভাণ্ডারীদা—আমি কিছুটা শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অনেকগুলি machine-এর (যন্ত্রের) প্রয়োজন আছে। কিন্তু পয়সা নেই। অবশ্য পয়সাও বড় জিনিষ নয়। বড় জিনিষ মানুষ। সেই মানুষ থাকলে সবই হয়। তুমি ইচ্ছা করলে ঢের পার। তাই ভেবেছি একটা list (তালিকা) দিয়ে দেব। দেখো যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

ভাণ্ডারীদা—রাধাস্বামীই সহায়। আমি চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যতই তাঁকে ভালবাসি, ততই তিনি মানুষের মধ্য-দিয়েই নানাভাবে এগিয়ে আসেন আমাদের কাছে। পদে-পদে দয়া করেন। তাঁর দয়ার কোন কূল-কিনারা নেই।

এরপর পূজনীয় বড়দা আমেরিকার একটা চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। সেই চিঠিতে সংবাদ আছে যে হাউজারম্যানদার একজন বন্ধু সৎসঙ্গের নূতন আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন সেখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সংবাদ শুনে বললেন—দেখ পরমপিতার কাণ্ড !

ভাণ্ডারীদা—একজন হয়তো বহু বৎসর ধ'রে গুরুর সঙ্গ করল অথচ তার হয়তো গুরুর উপর প্রকৃত টান গজাল না, আবার আর একজন হয়তো প্রথম দর্শন থেকেই গুরুকে গভীরভাবে ভালবাসতে সুরু করল। এই পার্থক্যের কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যখন selfish motive (স্বার্থপর উদ্দেশ্য) নিয়ে গুরুর কাছে যাই তখন ঐ selfish motive (স্বার্থপর উদ্দেশ্য)-ই তাঁকে ভালবাসার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, পরে আমাদের desire (ইচ্ছা)-গুলি baffled (ব্যর্থ) হ'য়েই হোক বা fulfilled (পরিপূরিত) হ'য়েই হোক, আমরা বুঝি যে

তিনিই কাম্য। তাঁর মত কিছু নেই। তাঁকে যখন সবচাইতে আপন ও সবচাইতে প্রিয় ব'লে মনে হয় তখন তাঁকে ভাল না বেসে পারা যায় না। যারা একটু বুদ্ধিমান, যারা একটু চিন্তাশীল, তারা বরাবর অকিঞ্চিৎকর কামনা নিয়ে খুশী থাকতে পারে না। মনে কর, তাঁকে বাদ দিয়ে ঐ-সব আজে-বাজে জিনিষের পিছনে ছুটে আমার লাভ কী? আর, প্রবৃত্তি-চাহিদা এমনই বেয়াড়া জিনিষ যে তা' কখনও নিবৃত্ত হ'বার নয়। একটার পর একটা পেয়ে বসে। ও পথে শান্তি নেই। শান্তির পথ হ'ল তাঁর খুশীর জন্য নিজের সব খেয়াল বিসর্জ্জন দেওয়া। তাঁকে খুশী করার ধাঁধা প্রবল হ'লে সেই একমুখী আগ্রহের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় শান্তি, খুঁজে পাওয়া যায় তৃপ্তি। যারা first sight-এ (প্রথম দৃষ্টিতে) তাঁকে ভালবাসতে পারে তারা হ'ল blessed and wise (ধন্য এবং প্রাজ্ঞ)। Love is the only coin by which we can purchase bliss (ভালবাসাই হ'ল একমাত্র মুদ্রা যা' দিয়ে আমরা শান্তি ক্রয় করতে পারি)।

প্রফুল্ল—মানুষের কামনা-বাসনা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও কি তার গুরুর উপর টান হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রজনী সেনের একটা গান আছে "ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়, চাহে ধন-জন আয়ু আরোগ্য বিজয়।" যা' পায় তা' পেয়ে যখন তৃপ্তি আসে না, তখন মনে করে "তুমিই আমার শান্তি ও তৃপ্তি।" যারা এমনতরভাবে গুরু-সর্ব্বস্ব হয় তারাই true lover (প্রকৃত প্রেমিক)। সন্ন্যাসী যারা, ভক্ত যারা, তাদের ত্যাগ ও ভোগের নিয়ামক হ'লেন প্রিয়পরম। তাঁর মধ্যেই তারা জীবনের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা খুঁজে পায়। হাজারো রকমের consideration (বিবেচনা) তাদের থাকে না। তাদের একমাত্র consideration (বিবেচনা) হ'ল ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা। তাই তাদের বিভ্রান্তি ক'মে যায়। জীবন সহজ, সরল ও ভারমুক্ত হ'য়ে ওঠে। নানা চাহিদার দাসত্ব যারা করে তারা কিন্তু জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে না। মনের কষ্ট ও ভারাক্রান্ত ভাব তাদের যায় না। ভালবাসার একটা লক্ষণ এই যে সে alert (সতর্ক) হয়, inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) হয়, active (সক্রিয়) হয়। এ-সব বাদ দিয়ে ভালবাসা কখনও real (বাস্তব) হয় না। গরুগুলি দেখ না ঘাস খায়, কিন্তু বাচ্চার দিকে কী তীক্ষ্ণ নজর। কুকুর আসলেই অমনি ঘ্যাক ক'রে ওঠে। যে ভালবাসে সে কখনও প্রিয়ের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন হ'তে দেয় না। তার মনে ব্যথা লাগে এমন কোন কাজ সে নিজে তো করেই না, এমন-কি চেষ্টা করে

যাতে ঐ ধরণের কাজ অন্যেও না করে। কী ক'রে তাকে সুখী করবে, কী ক'রে তাকে শান্তি দেবে সেই চেষ্টায় সে উদগ্র হ'য়ে থাকে। বুকখানা যার ভালবাসায় কাবেজ হয় তার জীবন আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। ভালবাসা কথাটা ভালবাসা নয়। ভালবাসা হ'লে যেমনতর ভাবা, বলা ও করা আসে প্রিয়ের জন্য তেমনতর ভাবা, বলা ও করা নিয়ে চলাই ভালবাসা। ভালবাসলে প্রিয়ের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। Self is sold out for the beloved (প্রিয়ের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া হয়)।

ভাণ্ডারীদা—আমাদের ওখানকার কয়েকজন সৎসঙ্গী ভাই আপনার ফটো নিয়ে যেতে বলেছেন। কোন্ ফটোটা নিলে সবচাইতে ভাল হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আমাকে জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাণ্ডারীদা সম্বন্ধে সস্নেহে বললেন—এ-ভাই বাংলা কিছু-কিছু বোঝে।

ভাণ্ডারীদা—Yes (হ্যাঁ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ইংরাজীও জানি না, হিন্দীও জানি না।

প্রফুল্ল—আপনি যেমন জানেন, তেমন কেউ জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার উপর তো আমার কোন control (অধিকার) নেই। তাই জানি বলা চলে না। যখন আসে তখন বলতে পারি just like an instrument (ঠিক যন্ত্রের মত)।

এরপর সবাই বিদায় নিলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় চৌকিতে বসেছেন। বেলা শেষের সোনালী রোদ চতুর্দ্দিকে সোনা ঢেলে দিয়েছে। তাঁর মুখখানি ছায়ার মধ্যেও জ্বল-জ্বল করছে। ভাণ্ডারীদা প্রভৃতি কাছে ব'সে আছেন। তাঁর সান্নিধ্যে কী যেন এক অপার শান্তি। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই নীরবে এক মধুর আবেশে আবিষ্ট হ'য়ে আছেন। এমন সময় পাণ্ডাজী চরণামৃত দিয়ে গেলেন। চরণামৃত পানের সার্থকতা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চরণ মানে চলন। গুরু বা মহাপুরুষের চলনায় চলাই প্রকৃত চরণামৃত পান। ঐ চলনায় চ'লে আমরা ধন্য হ'তে পারি, সার্থক হ'তে পারি। কিন্তু ঐ চলাটা বাদ দিয়ে আমরা যতই পূজার ফুল-জল গ্রহণ করি না কেন, তাতে আমাদের তেমন কোন লাভ হয় না। তথাকথিতভাবে চরণামৃত গ্রহণের সার্থকতা হয়; যদি তা' আমাদের মনে ইষ্টানুসরণের আগ্রহ সঞ্চারিত করে।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাণ্ডারীদার দিকে চেয়ে বললেন—আমরা আশ্রমের পুনর্গঠনের জন্য ও কৃষ্টির সঞ্চারণার জন্য ইষ্টায়নী ও কৃষ্টিপ্রহরী দুটো fund (তহবিল) খুলেছি। যে-কেউ এতে contribute (দান) করতে পারে। এটা খুব তাড়াতাড়ি না করলে হবে না। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দু সহায়-সম্বল-হীন হ'য়ে চ'লে আসছে। আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে যাতে কেউ বিপন্ন না হয়। প্রত্যেকে যাতে তার মনোবল ফিরে পেয়ে নিজের যোগ্যতার উপর মর্য্যাদা-সহকারে দাঁড়াতে পারে সেদিকে আমাদের নজর রাখা লাগবে। আর, চাই ঋষি, মহাপুরুষদের বাণী এমন ক'রে ছড়ান যাতে প্রত্যেকে সদ্‌ভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। মানুষের সদ্‌ভাবকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারলে, কৃষ্টিগত জাগরণ ঘটাতে পারলে, জাতির মধ্যে পারস্পরিক সেবাবুদ্ধি গজিয়ে তুলতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। এ-জাতির মধ্যে অসম্ভব সম্ভাবনা বিদ্যমান। চাই proper nurture (উপযুক্ত পোষণ)। সেইজন্য যেমন চাই কর্ম্মী, তেমনি চাই টাকা। আজ বড় threatening condition (ভীতিপ্রদ অবস্থা)! কারও চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

ভাণ্ডারীদা—নামধ্যানের তত্ত্ব-সম্বন্ধে আপনি দয়া ক'রে কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামই হ'ল বিশ্বচরাচরের প্রতিটি সত্তার মূল ভিত্তি। তাই নামকে জানলে আত্মতত্ত্ব জানা যায়। নামকে জানতে গেলে নামীর শরণাপন্ন হ'তে হয়। নামী মানে যিনি নামস্বরূপ অর্থাৎ নামের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি হ'লেন দয়ীপুরুষ। জীবের প্রতি করুণাবশে তিনি মানুষ হ'য়ে আসেন, যাতে মানুষ তাঁকে ধ'রে দয়ালদেশে পৌঁছাতে পারে। নাম প্রেরণা জোগায় আর ধ্যান মানুষকে ধ্যেয়ের ভাবে ভাবিত ক'রে তদভিমুখী ও তৎচলনপরায়ণ ক'রে তোলে। যার-তার ধ্যান করতে নেই, কারণ তাতে ধ্যেয়ের মধ্যে যদি কোন imperfection (অপূর্ণতা) বা unsolved knot (অসমাহিত গ্রন্থি) থাকে, তবে তা' ধ্যানীর মধ্যে transmitted (সঞ্চারিত) হ'য়ে যেতে পারে। উপর থেকে যিনি perfection-এর (পূর্ণতার) তক্‌মা নিয়ে আসেন, তিনিই ধ্যেয়। কারণ, He is the highest and best guide and goad to human evolution (তিনি হলেন মানব-বিবর্ত্তনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অনুপ্রেরক)। পুরুষোত্তমকে যারা জীবদ্দশায় পায়, তারা যদি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে তাঁর সঙ্গ, অনুসরণ, অনুচর্য্যা ও তীব্র কর্ম্মসহ নিষ্ঠাসহকারে নামধ্যান করে, তবে অল্প সময়ের মধ্যে ঢের এগিয়ে যেতে পারে। পুরুষোত্তমই ইষ্ট, পুরুষোত্তমই ধ্যেয়। তাঁর অন্তর্ধানের পরও তিনিই মানুষের ইষ্ট ও ধ্যেয় হ'য়ে থাকেন, যতদিন পর্য্যন্ত

তাঁর পুনরাবির্ভাব না ঘটে। তাঁর অনুগামীদের কাজ হ'ল তাঁকেই লোকসমক্ষে তুলে ধরা। মানুষের প্রাপ্তব্য হ'লেন ঈশ্বর এবং পুরুষোত্তমই হ'লেন রক্তমাংস-সঙ্কুল আমান ঈশ্বর। আবার, পুরুষোত্তমকে নিজ জীবন দিয়ে যিনি যতখানি অবিকৃতভাবে ধারণ, বহন, প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করেন, যাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যতখানি ইষ্টানুরাগসন্দীপী, তিনি ততখানি পূজনীয় মানুষের কাছে।

প্রফুল্ল—নামী ছাড়া অন্য কাউকে ধ্যান করলে কি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম-নামী অভিন্ন। নাম করার সঙ্গে-সঙ্গে নামীকে ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ ও ধ্যান একলক্ষ্যাভিমুখী হ'য়ে পারস্পরিক-ভাবে পরিপূরণী হ'য়ে ওঠে। নাম ও নামীর সঙ্গে প্রতিটি সত্তার সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য। তাই বলে—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। যাঁর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিত্য নয় এবং যিনি চরমধামের মালিক নন তাঁর ধ্যানে মানুষ নিত্য ও চরমধামে উপনীত হ'তে পারে না। ধ্যেয় যদি নামের মূর্ত্ত প্রতীক না হ'য়ে অন্য কিছু হন, তবে নামের গন্তব্যে যাওয়া যায় না। হয় মাঝপথে থেমে যেতে হয়, না-হয় দোটানা অবস্থার সৃষ্টি হয়। জপ্য নাম যাঁর দ্যোতক, তাঁকেই ধ্যান করতে হয়। নইলে integrated evolution (সংহত বিবর্ত্তন) hampered (ব্যাহত) হয়, এমন-কি সাধকের জীবন ওতে bifurcated (দ্বিধাবিভক্ত) হ'য়ে যেতে পারে, কারণ, নাম তাকে দেয় এক impulse (প্রেরণা) আর ধ্যান তাকে দেয় আর-এক impulse (প্রেরণা)। নাম যে স্বরূপ-সচেতন, ঈশিত্ব-অধ্যুষিত ব্যক্তিত্বকে সূচিত করে, সেই তাঁকে ছাড়া অন্যকে ধ্যান করলে নামধ্যানের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধন-তপস্যা একটা science (বিজ্ঞান), আবোল-তাবোল যা'-তা' করলে evolution (বিবর্ত্তন) না হ'য়ে devolution (অপবর্ত্তন) হ'বার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাইতো ধর্ম্মের দেশ ভারতে আজ মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর, ধর্ম্মের নামে চলে অজান, আত্মম্ভরি মানুষদের আজব ধরণের আজগবী।

১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৬।২।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে যথারীতি আমতলায় ইজিচেয়ারে বসেছেন। পাশে গাড়ু,গামছা, জলের ঘটি, সুপারির কৌটা, দাঁতখড়কে, টিকে, তামাক, দেশলাই, গড়গড়া, পিকদানি, ফ্লাস্ক ইত্যাদি নিয়ে গুছিয়ে কালীদাসীমা ও সরোজিনীমা ব'সে আছেন। ভাণ্ডারীদা, সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি এবং অন্যান্য দাদা ও মায়েরা আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বাস্য

হ'য়ে ইজিচেয়ারের উপর পা গুটিয়ে চাদরের মধ্যে হাত-পা ঢেকে সুখে ব'সে আছেন এবং প্রীতিসিক্ত পরিতৃপ্ত চোখে সকলকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। চোখে চোখ পড়তেই যেন মনে হয় সব দেহ-মন অমৃতসিঞ্চিত হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার কাছে আগ্রার সৎসঙ্গ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবার্ত্তা ক'রে সেখানকার খবরাখবর শুনতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সবই ঠিক আছে, কিন্তু পূর্ব্বতন অবতার-মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ওদের যে ধারণা আছে ব'লে শুনি, অমনতর ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নয়। আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। ঋষিপারম্পর্য্যকে উপেক্ষা করলে সেই ধারাটা ছিন্ন হ'য়ে যায়। আর, বর্ণাশ্রমকে কখনও ignore (অবজ্ঞা) করতে নেই। সেইটেই হ'ল sound philosophy (যথার্থ দর্শন) যা' জীবনের সব aspect (দিক)-কে fully fulfil ও explain (পূর্ণভাবে পূরণ ও ব্যাখ্যা) করে—পূর্ব্বাপরের সামঞ্জস্য নিয়ে। বিরোধ সৃষ্টির মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব আছে সকলকে পরিপূরণ ক'রে আপন ক'রে নেওয়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একবার তামাক খেলেন। তামাক খেয়ে হাত বাড়িয়ে গামছাটা চেয়ে নিয়ে মুখ মুছলেন। পরে সুপারি খেয়ে পিকদানিতে খারা ফেললেন। আবার গামছা চেয়ে নিয়ে মুখটা মুছলেন। এমন সময় পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য) খবরের কাগজ নিয়ে আসলেন। সুশীলদা কাগজ প'ড়ে শোনালেন।

খবর শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ইজিচেয়ার থেকে উঠে পাশের একখানি চৌকিতে পাতা বিছানায় তাকিয়া ও কোলবালিশ ঠেস দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে অর্দ্ধ-শায়িত ভঙ্গীতে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ আপনমনে বললেন—ভালবাসা হ'ল the only prop of man's life (মানুষের একমাত্র অবলম্বন)। তা'ছাড়া মানুষের existence (অস্তিত্ব)-ই টিকতে পারে না। খুব বীভৎস মানুষ যে, সেও কাউকে হয়তো ভালবাসে।

একজন কর্ম্মী এসে বললেন যে তিনি সংসারের নানা ঝামেলায় আটকে প'ড়ে যাজন কাজে বেরুতে পারছেন না এবং বাড়ীতে ব'সে থাকার দরুন নানাবিধ অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা more important (বেশী গুরুত্বপূর্ণ), পিছটানের পরিচর্য্যা করতে গিয়ে তাকে যদি unimportant (অপ্রয়োজনীয়) ক'রে রাখি,

তাহ'লে তো চলবি নানে। আমি যা' কইছি, জোর দিয়ে তাই করা লাগে। প্রাণ ঢেলে যাজন কর, দীক্ষা দেও; মানুষকে চাঙ্গা ক'রে তোল, বড় ক'রে তোল। আর, 'ঋত্বিকী' সই করায়ে ফেল। লোকরাখাল তোমরা, পারিবারিক অসুবিধা কিছুটা উপেক্ষা ক'রে লোকপরিচর্য্যাকে যদি প্রধান ক'রে তোল তাহ'লে দশজনেই স্বতঃ-দায়িত্বে তোমাদের সংসার দেখবে। অবশ্য; যার জন্য যা' করবা তা প্রত্যাশাহীন হ'য়ে করা লাগে। প্রত্যাশা নিয়ে করলে করাটাও নিখুঁত হবে না। ফলের ব্যাপারেও গরমিল হবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় চৌকিতে এসে বসেছেন। বিছানাটি সাদা-ধবধবে। তাঁর গায়ে একটি সাদা ফতুয়া। শুভ্র বেশবাসে তাঁকে পরম রমণীয় দেখাচ্ছে। তিনি খুশীমনে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে আসলেন। সকলে প্রণাম ক'রে উপবেশন করার পর নানা বিষয়ে কথা উঠল।

দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি একশ' বছর আগে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ষাটভাগের উপরে ছিল। পরবর্ত্তীকালে আমাদেরই চলার দোষে হিন্দুর সংখ্যা গেল ক'মে। এ কাজটা আমরা ভাল করিনি। সব সময়ই দূরদর্শিতা নিয়ে চলতে হয়। এমনভাবে চলা লাগে যাতে কেউ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে না পারে। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। তবে দেখতে হয় যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শুভ বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। আমরা যদি নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে দিই তাহ'লে সেটা কিন্তু অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। অপরের সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার যেমন আমাদের নেই, নিজেদের সত্তাকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেওয়ার অধিকারও তেমনি আমাদের নেই। সত্তাপোষণী সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলাই ধর্ম্ম। দেশ-বিভাগে কারো ভাল হয়নি। আমি বুঝি মুসলমানের ভাল না হ'লে হিন্দুর ভাল হ'তে পারে না, হিন্দুর ভাল না হ'লে মুসলমানের ভাল হ'তে পারে না। উভয়ের স্বার্থ ও কল্যাণ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অন্ততঃ বাংলাদেশ যাতে দ্বিখণ্ডিত না হয় সেজন্য বহু পূর্ব্বেই আমি শ্যামাপ্রসাদবাবু ও আপনাকে বলেছিলাম। বাইরে থেকে অন্ততঃ পঁচিশ লাখ family (পরিবার) বাংলায় এনে জায়গা-জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করতে। এবং এর পরে নূতন ক'রে census (আদম সুমারী) নেওয়ার ব্যবস্থা করতে। তা' যদি সময়মত করা হ'ত তাহ'লে বাংলাদেশ ভাগ হ'তে পারত না। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের যে বিপর্য্যয় হ'ল সে বিপর্য্যয়ের তুলনায় পঁচিশ লক্ষ পরিবার বাংলায়

এনে বসবাস করাবার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার পরিণাম সামগ্রিকভাবে সব সম্প্রদায়ের পক্ষে দূর ভবিষ্যতে ভালই হ'ত। প্রথমে বাংলাদেশে এটা ক'রে পরে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশেও এটা করা যেত। তাড়াতাড়ি এটা করতে পারলে দেশের কোন অংশই খণ্ডিত করার প্রয়োজন হ'ত না। তাতে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র দেশের সব সম্প্রদায় ও সব লোকই উপকৃত হ'ত। দেশ ভাগ ক'রে যে স্বাধীনতা হয়েছে তাকে freedom (স্বাধীনতা) কওয়া যায় না। একে বলা যায় fienddom (শয়তানের রাজত্ব)। এতে সকলেই দুর্ব্বল হয়েছে, সকলেরই ক্ষতি হয়েছে। এই যে দুর্দ্দৈব এসেছে এর জন্য আপনি, আমি প্রত্যেকেই দায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে দরদের সঙ্গে বললেন—কিছু না, আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠুন, ভগবান আপনাকে যদি সে মন দেন, আপনি যদি তেমন ক'রে লাগেন, এ সবের প্রতিকার হওয়া কঠিন কিছু নয়। আমার মত মুখ্যু লোকের মাথায় যদি আসে, আপনার মত মানুষ তো খুব ভাল পারবেন। আমার দুঃখ এই যে মুসলমানদেরও ভাল হ'চ্ছে না। সেদিন থেকে ওদের সর্ব্বনাশ সুরু হ'ল, যেদিন থেকে ওদের মধ্যে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করার ঝোঁক চেপে বসল। প্রতিলোমে treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হবেই। প্রতিলোমের effect (ফল) হ'চ্ছে, সে evil-এ (অসতে) integrated (সংযুক্ত) হ'য়ে পড়ে। অনুলোমে good-এ (ভালতে) integrated (সংযুক্ত) হয়। মুসলমানরা প্রতিলোম বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের সর্ব্বনাশের বীজ পুষ্ট করেছে। শুধু মুসলমান ব'লে কথা নয়, যারাই প্রতিলোমের দিকে ঝুঁকবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি নিজেরা ডেকে আনবে। এমন সর্ব্বনাশা জিনিষ আর নেই। অনুলোম বিবাহ হ'ল সেই সনাতন mechanism (মরকোচ), যার ভিতর-দিয়ে যা'-কিছু সমাজদেহে assimilate (আত্মীকৃত) ক'রে নেওয়া যায়, সবই যেন বিষ্ণুশরীরে গুপ্ত হওয়ার মত হয়। এইটে ছিল হিন্দুদের হজমের নাড়ী। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়ে দিয়ে সেই নাড়ীটা আমরা কেটে ফেলেছি। আজ তাই আমরা বিস্তারের পথে চলতে পারি না, পরকে আপন ক'রে নিতে পারি না। তারপর আমাদের বড় দোষ আমরা একজনকে মেনে চলতে পারি না। আমরা integrated (সংহত) নই। আমরা যদি এক আদর্শকে অবলম্বন ক'রে বান্ধব-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে না পারি তাহ'লে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যার যত গুণপনাই থাক্, আমরা কখনও শক্তিমান হতে পারব না। পরস্পরে রেষারেষি ক'রে আমাদের শক্তি ক্ষয় করতে পারব মাত্র। আর একটা কথা, শাশ্বত আদর্শ ও নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে গোঁজামিলের মিল সৃষ্টি করাটা কখনও সুফলপ্রসূ হয় না। আমি

দাশদাকে (সি. আর. দাশ) বলেছিলাম—"Pact (চুক্তি) যে করলেন এই করলেন সর্ব্বনাশ।" উনি বললেন—"ভুল করেছি। আমি ঘুরে আসি, আপনি যেমন-যেমন বলবেন তেমন-তেমন করব।" অল্প যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন, করেছিলেনও তাই। তবে বিশেষ কিছু করার সময় পেলেন না।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতগুলি মানুষ হয়তো চ'লে আসবে। যারা থাকবে তাদের অনেকে হয়তো কৃষ্টিচ্যুত হবে। তার ফল যা' হ'তে পারে তাই হবে। নিষ্ঠা নিয়ে চলাই ভাল।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—আপনার নির্দ্দেশ কিছু আছে যা' নেহেরুজী প্রভৃতির কাছে বলতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতির নিয়ম দেখেছেন ? কোন disease (রোগ) হ'লে, white corpuscles (শ্বেত কণিকাগুলি) বেড়ে যায় to resist the disease force and defend the system (রোগের শক্তিকে প্রতিরোধ করতে এবং শরীরকে রক্ষা করতে)। এই defence-force (প্রতিরক্ষা শক্তি) দেশে বাড়ান লাগে। উন্নয়ন ও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এই দুই দিকেই নজর থাকা চাই। কুশল-কৌশলী হ'য়ে ইংরেজদের সঙ্গে এমনতর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ভাল, যাতে তারা আমাদের সহায়ক হয়। আর, যে-দল বা সম্প্রদায়ই হোক না কেন, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে, নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা যেন কাউকে খুশী করতে না যাই। অশান্তি এড়াবার জন্য আমরা অনেক সময় অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেছি। অকল্যাণকর তোষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এটা কিন্তু আদৌ ঠিক হয়নি। তার বিষময় ফল আজ সকলকেই ভোগ করতে হচ্ছে। সত্তাবিরোধী যা', তা' mould (নিয়ন্ত্রণ) করবেন, resist (নিরোধ) করবেন, কিন্তু কারও বিরুদ্ধে দ্রোহবুদ্ধি পোষণ করবেন না।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—পূর্ব্ববঙ্গে কি কিছু করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী যা' সমীচীন ও সত্তা-সংরক্ষণী তাই করতে হয়। আগে বলেছিলাম safety zonal rehabilitation (নিরাপদ এলাকায় পুনর্ব্বাসন)-এর কথা। তা' তো কেউ করল না।……পরমপিতার দয়ায় আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠলে হয়।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—এসেছি যখন আপনার কাছে নিশ্চয়ই ভাল হব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হওয়াই লাগে। এমন দুঃসময় আর দেখা যায় না। পাঁচজন মানুষ যদি উঠে-প'ড়ে লাগে, নিজেরা moulded (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে

সকলকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করে, তাহ'লে হয়। বাংলায় আজ poverty of man (মানুষের দারিদ্র্য) বড় বেশী হয়েছে। সেইটেই সবচেয়ে ভাবনার কথা। আগে সব সময় প্রত্যেক field-এ (ক্ষেত্রে) একদলের পর আর একদল উপযুক্ত মানুষ ready (প্রস্তুত) হ'য়ে থাকত। কিন্তু আজ উপযুক্ত একজন গেলে তার অভাব পূরণের জন্য আর একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না!

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—আমাদের university education (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটা) failure (ব্যর্থ) হ'য়ে গেছে। আমার মনে হয়, আপনি যদি মানুষ গড়ার জন্য এবং আপনার ভাবধারা প্রচারের জন্য একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) করেন, তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা করণীয় বটে, কিন্তু সব জিনিষেরই সময় আছে, ক্রম আছে। সেই পারম্পর্য্য ঠিক রেখে করণীয়গুলি করা লাগে। এখন চাই লোক-সংগ্রহ আর খবরের কাগজের মাধ্যমে daily knocking (দৈনিক প্রচার)। সাধারণ মানুষ forgetful ও ignorant (ভ্রান্তি-প্রবণ ও অজ্ঞ), তাই জোর যাজন চাই রোজ—এবং সেটা নানা মাধ্যমে। তবে লোকের মাথা খুলবে।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) নামে মানুষ খুব সাড়া দেয়। আপনি সুশিক্ষার একটা পরিকল্পনা ক'রে দিয়ে যান। এমন করুন যাতে মানুষ তৈরী হয় এবং ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হয়। Science (বিজ্ঞান), Technology (প্রযুক্তিবিদ্যা), Agriculture (কৃষি) ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই বলা আছে, তবে এই কাজে হাত দিতে হবে আরও পরে। মানুষ-চাষের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। বিবাহ-বিধান যদি ঠিক না করা যায়, ভাল মানুষের জন্ম যদি না হয় তাহ'লে শুধু শিক্ষা দিয়ে বড় কিছু করা যাবে না। সুজননের পদ্ধতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মাথা আজ ঠিক নেই, তাই আবোল-তাবোল ভাবধারা আমাদের দেশে শিকড় গাড়ে খুব ভাল। সতীত্বের নামে আজকাল অনেক মেয়েরা পর্য্যন্ত হাসে। অনেকেই যেন ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিদায় দেবার জন্য একপায় খাড়া হ'য়ে আছে! এখন আমাদের কাজ হ'ল ছোটকে বড় করা, বড়কে ছোট করা নয়। বড় যারা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাদের বড়ত্বের সার্থকতা ছোটকে বড় করায়। প্রত্যেকে যাতে প্রত্যেকের হয়, সেইভাবে সকলকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা লাগবে। হিন্দুকে আজ বোঝাতে হবে খাঁটি হিন্দু হ'তে গেলে তাকে কী মানতে হবে এবং কী করতে হবে। হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু ক'রে তুলতে হবে। মুসলমানকেও খাঁটি

মুসলমান ক'রে তুলতে হবে। প্রত্যেকে যদি যথাযথভাবে ধর্ম্মপরায়ণ হয় তাহ'লেই পরস্পরের মধ্যে মিল হবে। আর, মানুষকে ধর্ম্মপরায়ণ ক'রে তোলার জন্যই তাকে ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ-স্বরূপ আদর্শে যুক্ত ক'রে তুলতে হবে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা সমাজের জন্য কিছু করিনি। বক্তৃতায় নিজেদের মাথায় লাখো পদাঘাত করেছি। বর্ণাশ্রম যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এই কথাই মানুষকে শুনিয়েছি। কিন্তু এর তাৎপর্য্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করিনি। উচ্চ যারা তারা বুকের রক্ত দিয়ে, ঘরের অন্ন দিয়ে, অক্ষমদের বাঁচিয়েছে। সে-সব কাহিনী লোকের সামনে বলার জো নেই। যাতে বড়র উপর শ্রদ্ধা জাগে, সেই কথা প্রাণ খুলে বলতে গেলে চাপড় দিয়ে দাঁত উড়িয়ে দেবে। অশ্রদ্ধার কথা, বিভেদের কথা, ভাঙ্গনের কথা বলুন, লোকে বাহবা দেবে, হাততালি দেবে। পদে-পদে suicidal policy (আত্মঘাতী নীতি) অবলম্বন ক'রে চলেছি আমরা। Pulverised (চূর্ণবিচূর্ণ) হবার জন্যই যদি আমরা সব-কিছু করি, তাহ'লে crystallised (স্ফটিকীকৃত) হব কি ক'রে? এমন তো কেউ নেই যে হিন্দুকে উন্মুক্ত ক'রে দেখায়—কী সোনার মানুষ এরা, কী অপূর্ব্ব এদের কৃষ্টি, কী অনন্যসাধারণ এদের ইতিহাস। হিন্দুর গৌরবগাথা তো কানে শুনতেই পাওয়া যায় না। আপনারা ছাড়া কে শোনাবে সেই গান? বর্ম্মা, চীন, জাপান এরা সবাই তো আমার মনে হয় বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অংশ। বুদ্ধদেবকে দশাবতারের এক অবতার ব'লে মানি আমরা। বুদ্ধদেব আমাদের ঘরের ঠাকুর, ঘরের ছেলে। বুদ্ধদেবকে যারা ভালবাসে, অনুসরণ করে, তারা আমাদের বান্ধবই বটে। ধর্ম্ম অর্থাৎ সপারিবেশ বাঁচাবাড়াই সকলের কাম্য। তা' realise (উপলব্ধি) করেন যিনি, তিনিই আমাদের আদর্শ। জীবনবৃদ্ধিকে অধিগত করতে গেলে তাঁর চলনায় চলার initiative (প্রারম্ভসূচক পদক্ষেপ) নিতে হবে, আর একেই বলে initiation (দীক্ষা)। তাঁকে গ্রহণ ক'রে তাঁর পথে চলতে হয়। প্রত্যেকের তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করতে হয় instinctive activity (সহজাত সংস্কার-সম্মত কর্ম্ম) দিয়ে। এই কর্ম্মের ভিত্তিতে different groups-এর (বিভিন্ন শ্রেণীর) সৃষ্টি হয়। এইগুলিকেই বলা যায় বর্ণ। এক আদর্শকে অনুসরণ ক'রে চলার দরুণ তারা normally inter-interested (স্বভাবতঃই পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত) হয়। এ-থেকেই আসে সংহতি ও ঐক্য। এই সংহতি এবং ঐক্য থেকেই আসে শক্তি। শক্তির ভেতর-দিয়ে আসে সমৃদ্ধি ও সম্বর্দ্ধনা। এই তো মোদ্দা ব্যাপার।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আপনার মত মহাপুরুষরাই পথ দেখাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৌলানা রুমের গুরু প্রার্থনা করতেন—"হে পরমপিতা! আমাকে একখানি মুখ দেও।" পরে মৌলানা রুম এলেন। তিনিই তঁার মুখ হ'লেন। তঁার কথা লোকের সামনে তুলে ধরলেন। দাশদার মধ্যে আমি একখানি মুখ পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি অকালেই চ'লে গেলেন। অমন আর পাইনি। অমন devoted (অনুরাগী)—কাঁটায়-কাঁটায় clock-এর (ঘড়ির) মত কাজ করতেন, শুনতেন। বড় কাজ করতে গেলে উপযুক্ত আধার চাই। তবে আমার যারা আছে তারাও সাধ্যমত চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে যেমন যা' হ'তে পারে তা' হচ্ছেও। মানুষ নিজ খেয়াল-মত অনেক-কিছু করতে পারে। কিন্তু অহঙ্কার ও খেয়াল বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টের খুশীর দিকে চেয়ে ধীরস্থিরভাবে দুঃখ, কষ্ট, নিন্দা, বিদ্রূপ স'য়ে ক্রমাগতি নিয়ে তীব্রভাবে পরমপিতার কাজে লেগে থাকা কঠিন ব্যাপার। সে সৌভাগ্য সবার হয় না। ভিতরে নানারকম ambition (গর্ব্বেপ্সা) ও desire (কামনা) থাকলে এ-কাজে টিকে থাকাও মুশকিল। বিশেষ-বিশেষ অবস্থা, পরিস্থিতি ও সংঘাতের মধ্যে প'ড়ে তাদের মন যে-কোন সময় বিগড়ে যেতে পারে, তাই পরমপিতার কাজের জন্য শুদ্ধ আত্মার দরকার হয়।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—ভাবধারার প্রচার চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য কাগজের কথা বলি।...আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম হিন্দুমহাসভা নাম না রেখে আর্য্যমহাসভা নাম দেওয়ার কথা। আর্য্যকৃষ্টি explain (ব্যাখ্যা) করলে যীশুখৃষ্ট, রসুল প্রভৃতি সবাই এর মধ্যে প'ড়ে যান। একটা world-wide platform-এর (বিশ্ববিস্তৃত মঞ্চের) সৃষ্টি হয়। সকলকে নিয়ে সবার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সমবেত অভ্যুত্থানের পথে চলতে হয়। তাতে কাজ ভাল হয়। কাউকে বাদ দিয়ে আমাদের চলার জো নেই। আর, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়, কারণ, ধর্ম্ম হ'ল সকলেরই জীবনদাঁড়া। নিজে ধর্ম্মের পথে চলতে হয় আর বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে ধর্ম্মকে সঞ্চারিত করতে হয়। তাতে সকলেরই মঙ্গল অবধারিত হয়। একদিকে চাই ধর্ম্মের পোষণ আর একদিকে চাই ধর্ম্মের পরিপন্থী যা', অসৎ যা' তার নিরোধ ও নিরসন। ধর্ম্মের নামে আমরা যেন কখনও অধর্ম্মকে প্রশ্রয় না দিই। প্রকৃত ধর্ম্ম যা' তার মধ্যেই নিহিত আছে সকলের মঙ্গল। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্য-দিয়েই সকলের মঙ্গল ও মিলন সাধিত হ'তে পারে। আমি বলি—আপনি সুস্থ হ'য়ে এই mission (উদ্দেশ্য) নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমি বহুদিন আগেই আপনাদের বলেছিলাম যে গদাই-লস্করী চালে চললে চলবে না। সত্যিই তাই, এখন খুব তীব্রভাবে কাজ করতে হবে। দেশে যে মানুষ নেই সে-কথা আমার মনে হয়

না। তাদের খুঁজে বের করতে হবে। হীরে যখন কয়লার গাদার সঙ্গে মিশে থাকে তখন সাধারণ মানুষ তা' টের পায় না। জহুরী যখন বের ক'রে দেখায় তখন সকলেই বুঝতে পারে। আপনারা জহুরীর মত হ'য়ে মানুষ টেনে বের করুন। শচীনদাকে বলেছিলাম পাঁচজন বামুন হ'লে দেশ রক্ষা পায়। অবশ্য, বামুন মানে বিপ্র নয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে। ব্রহ্মজ্ঞের যেমন থাকে একত্বের জ্ঞান, তেমনি থাকে ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান। এক কোথায় কার ভিতর কী রূপ নিয়ে আছেন, কী তার কর্ম্ম ও উপযোগিতা তা' তিনি জানেন। তাই, প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিচালিত করাই হয় তাঁর স্বভাব। রামদাস শিবাজীকে দিয়ে কী কাণ্ডটাই না করালেন! রামকৃষ্ণ ঠাকুর সেদিনকার মানুষ—অবতার বলতে তাঁর কথাই মনে পড়ে সর্ব্বাগ্রে—তিনি পানের থলে হাতে ক'রে নিয়ে মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে অজ্ঞাতসারে কেমন ক'রে দেশের হাওয়াটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁদের কথা লোকে জানতে পারে কতটুকু। মহাপুরুষদের কথা যদি মানুষ জানতে না পারে তাহ'লে মানুষ বাঁচবে কী ক'রে, বড় হবে কী ক'রে, ঐক্যবদ্ধ হবে কী ক'রে! তাই বলি, মহাপুরুষ-পরিবেষণী সংঘ করুন, খবরের কাগজের সঙ্গে ব্যবস্থা করুন, fund (তহবিল) সৃষ্টি করুন, মহাপুরুষদের কথা লোকে যাতে ভাল ক'রে জানতে পারে তার বন্দোবস্ত করুন। তারপর বিবাহে যাতে গোলমাল না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া লাগে। সবর্ণ বিবাহ কী ধরণে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তা' ভাল ক'রে explain (ব্যাখ্যা) করা লাগে, অনুলোম খুব ক'রে চালানো লাগে, প্রতিলোম stop (বন্ধ) করা লাগে। এগুলি একান্ত প্রয়োজন। বিবাহে গোল ঢুকলে পরে শত চেষ্টায়ও জাতির মঙ্গল করা যাবে না। আর, আমার ইচ্ছা ছিল ঋষিদের নামে university (বিশ্ববিদ্যালয়) হোক, যেমন শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়), ভরদ্বাজ university (বিশ্ববিদ্যালয়), কাশ্যপ university (বিশ্ববিদ্যালয়) ইত্যাদি। ওতে অতীতের সম্বন্ধে, কৃষ্টির সম্বন্ধে একটা sentiment (ভাবানু-কম্পিতা) জাগে।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—নাম যা' ভাল বোঝেন দেবেন ; তবে প্রধান জিনিষ হ'ল মানুষ গঠন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ গড়তে গেলেই চাই তার শ্রদ্ধার উদ্বোধন। ঋষি-মহাপুরুষদের শিক্ষা, দীক্ষা ও বিধান যে কত সুষ্ঠু, সুন্দর ও কার্য্যকরী তা' আমরা জানি না। তাই, আমরা কাঙ্গালের মত কেবল বিদেশের দিকে চাই। ঋষিরা জীবনের কোন দিকটাই বাদ দিতে বলেন নি। সামগ্রিক উন্নতির পথ নির্দ্দেশই

ক'রে গেছেন তাঁরা। আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে একপেশে হ'য়ে পড়েছি, বহু গলদ জমিয়ে তুলেছি। যা'হোক, গ্লানি যা' ঢুকেছে, ময়লা যা' জমেছে তা' মেজে-ঘষে সাফ ক'রে নিতে হবে। এইটে লোককে বোঝাতে হবে যে ঋষিদের বিধান ঠিকমত না-মানার দরুনই আমাদের ক্ষতি হয়েছে। সেজন্য তাঁদের বিধান দায়ী নয়। দায়ী আমরা, দায়ী আমাদের প্রবৃত্তিপরায়ণ চলন। সেগুলি অপসারণ ক'রে আমাদের এমনভাবে চলতে হবে যাতে ছোটবড় প্রত্যেকেই ভালভাবে বাঁচতে পারে ও উন্নতির পথে চলতে পারে। উঁচুকে নীচু করা ভাল নয়, বরং উঁচুর প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে উন্নত হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা উন্নত তাদের দায়িত্ব নিতে হবে যাতে তারা সেবায় সকলকে উন্নত ক'রে তুলতে পারে। পারস্পরিক প্রীতি যদি না থাকে, তবে দ্বেষ-বিদ্বেষের ভিতর-দিয়ে কখনও দেশে সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'তে পারবে না।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—সবরকম অকল্যাণকর প্রবণতা ও ভাবধারার বিরুদ্ধে systematic campaign (বিধিবদ্ধ অভিযান ও প্রচার) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বললেন—আগেই rival (প্রতিদ্বন্দ্বী) হ'য়ে দাঁড়িও না। Fulfilment (পরিপূরণ) দেখিয়ে convincing way-তে (প্রত্যয়-সন্দীপীভাবে) ছোট-ছোট বই লেখ—এমন বই যা' ট্রেনে ব'সে পড়া যায়। প্রত্যেকেই ভাল চায়। বাস্তব সব সমস্যার সমাধান ক'রে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ যদি যুক্তি-বিচার-সহ সুসংগত বিন্যাস-সহকারে লোকের সামনে তুলে ধরা যায়, তখন মানুষ তা' গ্রহণ করবেই। এমনি ক'রে শুভ সম্বেগের প্লাবন এসে যাবে। লোকে ভালর পথই ধরবে। যারা অবুঝ তাদের বুঝিয়ে ভালর পথে আনার দায়িত্ব আমাদের। কাউকে দোষ দিয়ে বা গাল পেড়ে লাভ নেই। যারা মানুষের ক্ষতি ক'রে নিজেরা লাভবান হ'তে চায় তাদের সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বজ্রকপাট সৃষ্টি করা লাগে। কিন্তু সব-কিছু করতে হবে সুকৌশলে, শুভ বুদ্ধি নিয়ে এবং অযথা সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে। বাংলার fall (পতন) থেকে India-র (ভারতের) fall (পতন) সুরু হয়েছে, আমার বিশ্বাস—বাংলা rise করলে (জাগ্রত হ'লে) India (ভারত) rise করবে (জাগ্রত হবে), দুনিয়া rise করবে (জাগ্রত হবে)। কারণ, বাংলার অসাধারণ complications (জটিলতা) solved (সমাহিত) হ'লে, ভারত ও জগতের complications (জটিলতা) solved (সমাহিত) হওয়ার পথ খুলে যাবে। সবচেয়ে বড় দরকার হ'চ্ছে সকলকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ ক'রে তোলা। বাংলার ও বাঙ্গালীর সম্ভাবনা অসাধারণ। চাই তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

প্রচার-সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের একটা দোষ—বাপ, বড় বাপকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে অন্যকে পূজো করতে গেলাম। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের condensed (সংক্ষিপ্ত) দান কম নয়—সে-দান সনাতন দান—নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন জীবনের পথ—তা' আমরা মানুষের সামনে ধরলাম কতটুকু? তলছা মেরে রেখে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আকুল করা প্রাণমাতানো কথায় সকলেই বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেকেই প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোল ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। সুশীলদার সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

এমন সময় প্যারীদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সেদিন কবিরাজ মহাশয়কে একজন যাজন করছিলেন—'আপনি যদি সৎসঙ্গী হতেন তবে আমাদের খুব কাজ হ'ত।'

সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তারা বোধহয় নিজেরা মনে করে যে তারা সৎসঙ্গকে ধন্য করছে এবং ভাবে তাদের মত অপরে এসেও সৎসঙ্গকে ধন্য করবে। একে কয় anti (বিরুদ্ধ) যাজন।

পরমপিতার সেবা ক'রে মানুষ ধন্য হয়, পরমপিতাকে কেউ কখনও ধন্য করতে পারে না। ভিতরে ভক্তি থাকলে মানুষের কথাই বেরোয় এমনতর যে তা' শুনে মানুষ ভগবদ্ভজনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

১৪ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ২৭।২।১৯৪৮)

আজ খবর পাওয়া গেল যে ছোড়দার রামকানালীতে কয়েকবার পায়খানা ও বমি হয়েছে। প্যারীদা একবার যেন যান। সেই খবর পেয়ে জীপে ক'রে পূজনীয় বড়দা, সুরেনদা (দাস), শচীনদা (গাঙ্গুলী), প্যারীদা, (নন্দী), নলিনীদা (যশোহরের) ওষুধ-পত্র নিয়ে রওনা হ'ন। মাঝ রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা ঘটায় প্রায় প্রত্যেকে আহত হ'ন। সুরেনদা আহত অবস্থায় অতি কষ্টে গাড়ি চালিয়ে আশ্রমে ফেরেন। একে ছোড়দার সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ ছিল। তারপর এই ঘটনায় তিনি খুবই মুষড়ে পড়েন। রাত্রে বলছিলেন—আমি যেন কিছুতেই দাঁড়াতে পারছি না। একটু ঠিকঠাক হ'য়ে আসতে লাগলে এমন-এমন সব ধাক্কা আসে যে সব গোলমাল হ'য়ে যায়।

ঘটনাচক্রের উপর আমার কোন হাত নেই অথচ suffering (কষ্ট)-টা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত মনে বার-বার গোলাপবাগে লোক পাঠিয়ে বড়দা এবং অন্যান্য সবার সংবাদ নিতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে 'মা-গো! বাবা-গো!' ব'লে আর্ত্তস্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন।

এমন সময় কলকাতা থেকে একটি দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

দাদাটি বললেন—এখন গিয়ে খাব। আমার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। সম্ভব হ'লে আপনার কাছে ব'লে আপনার নির্দ্দেশ নিয়ে আজই রাত্রে রওনা হ'য়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনটা আজ খুব ভাল নেই। বড় খোকা, প্যারী ওরা বড় কাতর। যা'হোক তোমার যখন একান্ত প্রয়োজন, যা' বলার আছে বল।

দাদাটি বললেন— থাক্, এ-অবস্থায় তাহ'লে আর বলব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যগ্র হ'য়ে বললেন—তা' কেন? তোমার প্রয়োজনের সময় তোমার কথা যদি না শুনতে পারি তাহ'লে তাতেও আমার উদ্বেগ বাড়বে। সারারাত মনে সোয়াস্তি পাব না। তোমার কথা তুমি বলতে পারলে তোমার মনটা হাল্কা হবে। তাতে আমারও ভাল লাগবে। তাই, ব'লে ফেল।

এরপর দাদাটি নিভৃতে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করলেন।

দাদাটি বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত কণ্ঠে আপন মনে বললেন—আমি পড়েছি উভয় সঙ্কটের মধ্যে। আমার মনটা সকলেরই ভাল চায়। কারও কোন কষ্ট দেখলে বেদনা বোধ করে। কিন্তু মানুষ ঠিক পথে না চললে তার কষ্ট তো মুছে ফেলবার নয়। আবার, অপরের কষ্ট না ঘুচলে আমারও কষ্ট ঘুচবার নয়।

১৫ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৮।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর ছোড়দার কোন খবর না পেয়ে নিদারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় মণিভাই (সেন) গোটা এগারোর সময় টেলিগ্রাম-সহ হাজির হ'লেন। টেলিগ্রামে খবর পাওয়া গেল যে ছোড়দা ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর আপন মনে সুশীলদার কাছে বললেন—একটু খারাপ খবরের আভাস পেলে আমার যেন

একটা obsession-এর (অভিভূতির) মত হয়। ভালটা যে ভাবতেই পারি না। এমনটা আমার আগে ছিল না।

সুশীলদা—আগে দেখেছি আপনি সব অবস্থাতেই অসাধারণ optimistic outlook (আশাবাদী মনোভাব) নিয়ে চলতেন। কিছুতেই টলতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আতঙ্ক, শোক, অত্যাচারের অবিশ্রান্ত আঘাত স'য়ে-স'য়ে এমন হয়েছে। ফাঁকই যে পেলাম না। কিছুদিন ফাঁক পেলে হয়তো nerve (স্নায়ু)-টা ঠিক হ'ত। আমার environment (পরিবেশ)-ই এমন যে সব সময় আমাকে যেন টেনে নামাতে চায়। আমার অবস্থা বুঝে যে চলবে তা' আর পারে না। আর, সবটা আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দেয়। খবরগুলি দেয়ও এমনভাবে যে আমার anxiety (উদ্বেগ) তাতে বাড়ে। Anxiety (উদ্বেগ) যে বাড়ায় অথচ প্রতিনিয়ত সংবাদ দিয়ে যে তা' কমাবে সে ব্যবস্থা করে না। আমার যে কী severe strain (দারুণ চোট) পড়ে তা' বুঝতে পারে না। কিছুদিন আমাকে অবকাশ দিলে আমি পারতাম ঠিক হ'তে। পরিবেশ যদি বুঝে চলত তাহ'লেই হ'ত। দশরথ যে শোকে মারা গিয়েছিলেন সেটা আমি বুঝতে পারি। আমার যা' অবস্থা হয় তার চাইতে আর একটু বেশী হ'লেই বোধহয় কাম সারা হ'য়ে যায়। এতখানি psychical disturbance (মানসিক বিক্ষেপ) হয় nerve-এর (স্নায়ুর) ভিতরে যেন spasm (আক্ষেপ) হ'তে থাকে। নরেনদার অসুখের সময় আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি? আমাকে খবর দিল খারাপ। আমার হাত-পা যেন আর চলে না। আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় সারা হ'য়ে গেছি কয়দিন।

এরপর কজলভাই খেলতে-খেলতে একটা কলকের ঠিকরির উপযোগী জিনিষ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে খুব খুশী হলেন, বললেন—একেই বলে জিনিষ। আমাকে ভালবাসে, আমি তামাক খাই, ভাল ঠিকরির প্রয়োজন হ'তে পারে। তাই দেখামাত্র আমার কথা মনে ক'রে নিয়ে ছুটে এসেছে। ওতেই ওর তৃপ্তি। এইরকম ব্যবহারে আমারও ভাল লাগে। এই হ'ল ইষ্টভৃতির প্রাণ।

নরেনদা (মিত্র)—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এটা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি। কথা হ'ল মাথা ঘামানো, শরীর খাটানো জিনিষ দিয়ে ইষ্টের তৃপ্তিসাধন। আর, সেই আকুল ধান্ধা নিয়ে চলা। প্রত্যেক মা-বাবার ছেলেপেলেকে এমনটা শেখানো লাগে, ভালবাসার জনকে দেওয়ান অভ্যাস করানো লাগে। মার উচিত ছেলেকে দিয়ে ছেলের বাবাকে দেওয়ান, আবার বাবার উচিত ছেলেকে দিয়ে তার মাকে দেওয়ান, এতে বাপ-মার

উপর টান বাড়ে। বাপ-মার উপর যাদের টান হয় গুরুর উপরও তাদের টান হয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এতখানি উদ্বেগের পর সুখবর পেয়ে শরীরটা এখন অবশ ও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৯।২।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় আমতলায় চাঁদোয়ার তলে বিছানায় ব'সে আছেন। ডাক্তার কালিদা (সেন) তাঁকে কয়েকজন রোগীর খবর বলেছেন। এমন সময় শ্রীযুত এন. সি. চ্যাটার্জ্জী, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রভৃতি আসলেন।

সবাই প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বললেন—আপনারা কলকাতার কাছাকাছি একটা বড় জায়গা নিন। এখন ভাল ক'রে প্রচার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসীমবাবু জমি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা নেওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—সত্বর অন্ততঃ একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ism (বাদ)-ই হোক, সমস্ত ism (বাদ)-ই যাতে এদিকে converge করে (কেন্দ্রীভূত হয়) সেইভাবে লেখা লাগবে। যে যে-মত নিয়ে চলেছে, সে সেই মত নিয়েই চলুক, শুধু তার মোড়টা ঘুরিয়ে দেওয়া লাগবে। সপরিবেশ সত্তাসম্বর্দ্ধনা না হ'লে যে কিছুই হ'ল না, এইটে ধরিয়ে দিতে হবে। তাই basic factor (মৌলিক উপাদান) হ'ল সদ্দীক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণী তপস্যা। মানুষ তৈরী না হ'লে কোন movement (আন্দোলন)-ই দাঁড়াতে পারে না। তাই জোর দিতে হবে আদর্শ-অনুসরণের উপর—যার ভিতর-দিয়ে ব্যক্তি-চরিত্র গঠিত হ'য়ে ওঠে। এমন factfully ও convincingly (তথ্যপূর্ণ ও প্রত্যয়সন্দীপী রকমে) লিখতে হবে, যাতে কারও মনে কোন সংশয় বা প্রশ্ন না থাকে। দেশের চলতি কাগজগুলির ভিতর-দিয়েও এই সব ভাবধারা পরিবেষণ করতে হবে। তাতে কাজ আরো ভাল হবে। যা' যা' করণীয়, তা' করতে হবে quickly and efficiently (ক্ষিপ্রভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে)। আর একটা কথা আমার মনে হয় যে শক্তিমান দেশগুলিকে ভারতের বান্ধব ক'রে তোলা লাগে। বিশেষ ক'রে ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার। নচেৎ বাইরে থেকে যদি কোন বিপদ ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়ে, তখন মুশকিল আছে।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Politics-এ (রাজনীতিতে) adjustment (বিন্যাস) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। Rigid (অনমনীয়) হ'লে হয় না। আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করা লাগে। আর চাই দূরদৃষ্টি। কোন্ কাজের ফল দূরে ভবিষ্যতে গিয়ে কী দাঁড়াতে পারে, তা' বোধ করার ক্ষমতা চাই। ভাল করতে গিয়ে কোন্ দিক দিয়ে কী কী খারাপ আসতে পারে তা' আঁচ করা চাই। সেগুলির প্রতিবিধান কিভাবে করা যায় তা'ও ভেবে রাখতে হয়। আর, সব দিকে নজর রেখে চলা লাগে। All sided, co-ordinated move (সর্ব্বতোমুখী সুসমন্বিত চেষ্টা) না হ'লে হবে না। (একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—Danger (বিপদ) কিন্তু পট ক'রে আসতে পারে।

কেষ্টদা—করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের হাতে প্রতিকারের ক্ষমতা আছে, তাদের সচেতন ক'রে দেওয়া লাগে।

কেষ্টদা—আমাদের কথায় কি কাজ হবে? উনি (শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়) যদি লাগেন, তবে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁকেও বলছি, আপনাকেও বলছি।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—হ্যাঁ! আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত। উনি একজন seer (দ্রষ্টা)। ওঁর কথাটা জানান দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতের উপর বিপদ আসতে পারে, সে-সম্বন্ধে সজাগ থেকে আত্মরক্ষামূলক ও কূটনীতিমূলক প্রস্তুতি ঠিক রাখা লাগে। আমি যেমন যা' যা' বলেছি ঘটে গেছে, পরেও তাই হ'তে পারে। না করলে কিন্তু উপায় নেই। শুধু আলোচনায় হবে না। আলোচনায় understanding (বুঝ) clear (পরিষ্কার) হয়, এই যা'। তারপর চাই কাজ। জনসাধারণের মাথা ঠিক ক'রে দেওয়া একটা প্রধান কাজ। তার জন্য এ্যাণ্টনির মত কথা কইতে শেখা লাগে। সেই tone (স্বর), সেই pose (ভঙ্গী), সেই procedure (পদ্ধতি)। (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে ও কণ্ঠস্বরে মনোমদ ভাবের দ্যোতনা ফুটে উঠলো) তবে মনে রাখতে হবে লোকমঙ্গলই যেন আমাদের একমাত্র স্বার্থ হয়।

কেষ্টদা—এ কাজে নানা দিক দিয়ে বাধা আসতে পারে। আর্য্যকৃষ্টির বিরোধী যারা, তারা মরণকামড় দিতে ছাড়বে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে কইতে জানলে আপনারা আদর-অভ্যর্থনাও পেতে পারেন। আমি বলি, আপনারা করুন, পরমপিতার দয়ায় উনিও সুস্থ হ'য়ে

উঠুন। যাতে লোকের সব দিক দিয়ে মঙ্গল হয় এবং অমঙ্গল নিরুদ্ধ হয় সেই শুভবার্ত্তা সর্ব্বত্র চারিয়ে দিন।

এরপর শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বিদায় নিলেন।

তিনি উঠে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার কালীদার খোঁজ করতে লাগলেন যাতে তিনি এখন একবার শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের হার্টের অবস্থা পরীক্ষা ক'রে দেখেন। কারণ, বেরিবেরির দরুন তাঁর হার্ট খুব দুর্ব্বল। রঙ্গনভিলা পর্য্যন্ত হেঁটে যাবার পর তাঁর হার্টের অবস্থা কেমন হয় শ্রীশ্রীঠাকুর তা' জানতে চান।

শোনা গেল কালীদা গোলাপবাগে গেছেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে লোক পাঠালেন। সেখান থেকে খবর আসল—কালীদা বাজারের দিকে গেছেন। তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সহরে লোক পাঠালেন কালীদাকে তাড়াতাড়ি ডাকতে।

তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুত সুশীলদাকে বারবার পাঠাতে লাগলেন শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় কেমন বোধ করছেন তা' জানবার জন্য। সুশীলদা এসে খবর দিলেন—'একটু খারাপ বোধ করছেন।'

তাতে দয়াল ব্যস্ত হ'য়ে হরিপদদাকে (সাহা) ডেকে পাঠালেন। হরিপদদা আসার পর দয়াল তাঁর কাছে কী যেন একটা ট্যাবলেট চাইলেন। হরিপদদা প্রথমটা তা' খুঁজে পেলেন না, তাতে দয়ালের সে কী উদ্বেগ! পরে হরিপদদা সেই ট্যাবলেট পেলেন। দয়ালের নির্দ্দেশমত রেণুমা ক্র্যাটিগ্যাস এনে দিলেন।

তিনি ঐ দুইরকম ওষুধসহ হরিপদদা ও সুশীলদাকে পাঠিয়ে দিলেন। নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন কেমন বোধ করলে কোন্‌টা খাওয়াতে হবে। পরে আবার কেষ্টদাকেও পাঠিয়ে দিলেন, বললেন—কেষ্টদা। আপনি তো ক্র্যাটিগ্যাস খেয়েছেন, আপনিও যান, যেয়ে বলুন আপনি খেয়ে কেমন ফল পেয়েছেন।

একটু পরে সুশীলদা ফিরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জী ভাল তো?

সুশীলদা—হ্যাঁ! কালীদা দেখছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হার্টের palpitation (ধুকধুকানি) এখন ক'মে গেছে তো? ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন? ক্র্যাটিগ্যাস!

সুশীলদা—ক'মে গেছে, ওষুধ আর খাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচনটা খেলে ভাল হ'য়ে যাবে।

সুশীলদার সঙ্গে দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বড় খোকা ওরা কেমন আছে?

দক্ষিণাদা—খুব ভাল।

১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২।৩।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমগাছের ছায়ায় চাদর গায় দিয়ে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ক্ষিতীশদা (দাস) প্রভৃতি এবং কালিদাসীমা ও আরও দুই-একজন মা কাছে আছেন।

এমন সময় খবরের কাগজ (আনন্দবাজার পত্রিকা) আসল। সুশীলদা কাগজ প'ড়ে শোনালেন।

খানিকটা পরে একজন সাধু এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি অনেক ওষুধ করলাম কিছুতে আমার অর্শ সারল না। আপনার তো হোমিওপ্যাথি জানা আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে একটি ব'লে দেন, আমি খেয়ে দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবি ডাক্তারকে দেখালে হয়।

সাধু—বড় ডাক্তার আমি ঢের দেখিয়েছি। আপনি একটা ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বলতে পারি না, দেনেওয়ালা যদি দয়া ক'রে দেন তাহলে হবে।

সাধু—আপনি মুখ দিয়ে বললেই কাজ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ তিলবাটা খাওয়া ভাল, আর টোটকা হিসাবে শুনেছি দু-একটা ওষুধে ভাল কাজ হয়—

১। জঙ্গী হরিতকী, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, দুর্ব্বামূল ও পিপুল মূল, সমভাগে একত্রে আমলা ভিজান জলে পিষে কুল আঁটির মত বড়ি ক'রে শুকিয়ে রাখতে হয়। এই বড়ি ঘোলের সঙ্গে দুবেলা দুটি সেবন করলে অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলি—দুই রকমের অর্শই আরোগ্য হয়।

২। একরতি আফিং, চার রতি কর্পূর ও আট রতি সাজিমাটি একত্রে গাওয়া ঘি-এর সঙ্গে মেড়ে প্রলেপ দিলে অর্শের ব্যথা নিবারণ হয় ও বলি শুকিয়ে যায়।

১৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ৩।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় চৌকিতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন। এমন সময় এন. সি. চ্যাটার্জ্জী আসলেন। ছোট তিনখানি বেঞ্চ একত্র ক'রে তার উপর একটা সতরঞ্চ বিছিয়ে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে বসতে দেওয়া হ'ল। তিনি প্রণাম ক'রে ওখানেই বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—মানুষের যদি ভালও করতে যান এবং সেই চেষ্টা যদি well manipulated (সুকৌশলে বিন্যস্ত) না হয় তাতেও

খারাপ হ'তে পারে। মানুষের মগজের অভাব অত্যন্ত। প্রজনন-পরিশুদ্ধি না হ'লে কোন ভাল কাজ করা যাবে না। মনুতে আছে—

'যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥'

দেশে প্রতিলোম-বিবাহ যদি প্রশ্রয় পায়, তাহ'লে জনগণ-সহ রাষ্ট্রের এই বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। তাই প্রতিলোম বন্ধ করাই লাগে। আর, সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বিহিতভাবে যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার ভিতর-দিয়ে ভাল মানুষের culture (কর্ষণ) হবে। আজকাল ভাল মানুষের আমদানি কমই হ'চ্ছে। আপনি একজন বড় মানুষ, এটাই বর্ত্তমান environment (পরিবেশ)-এর মধ্যে প'ড়ে দোষের ব্যাপার হ'তে পারে। শ্রেষ্ঠের প্রতি একটা aversion (বিতৃষ্ণা) জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ছোট ক'রে দেখান হয়েছে। ফলে তারা ignored (অবহেলিত) হ'চ্ছে। তাই, প্রকৃত বড় হওয়ার আগ্রহ আজকাল মানুষের ক'মে যাচ্ছে। কারণ, বড় হওয়াটা মানুষের অশ্রদ্ধা ও ঈর্ষ্যা কুড়ানোর কারণ যদি হয়, তা' মানুষের ভাল লাগে না। আগে শিক্ষকতার কাজে পয়সা না থাকলেও সম্মান ছিল। তাই দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নিয়েও অনেকে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিত। কিন্তু আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ছাত্রদের নকল করায় বাধা দিতে গেলে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হ'তে হয়। এ অবস্থায় তারা ছাত্রদের ভাল করবে কি ক'রে? আজ efficiency (দক্ষতা) অর্জ্জনের জন্য সাধনা গেছে ক'মে। দাঁ মেরে বড় হওয়ার বুদ্ধি হয়েছে প্রবল। এ-সব শুভ লক্ষণ নয়। এ-সবের প্রতিকার করতে গেলে শুভ-সংস্কারসম্পন্ন মানুষ যাতে বেশী সংখ্যায় জন্মায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর শিক্ষাদীক্ষা তো চাই-ই।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—স্বরাজ সম্পর্কে আপনার চিন্তাধারা আমার খুব ভাল লাগে। Independence-এর (স্বাধীনতার) মানে বোঝে মানুষ উল্টো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Independence (অনধীনতা) কথাটাই সোনার পিতলে ঘুঘুর মত। মানুষের life and growth (জীবন এবং বৃদ্ধি)-ই depend (নির্ভর) করে অন্যের উপর। তাই interdependence (পরস্পর-নির্ভরশীলতা) বাদ দিয়ে independence (স্বাধীনতা) ব'লে কিছু বুঝি না।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় ছোড়দা আসলেন। অসুখের পর তাঁর শরীরটা শীর্ণ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ স্নেহ-করুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। পরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন ক'রে সব খবর শুনলেন।

বললেন—এখন খুব সাবধানে থাকবি।

এর একটু পরেই প্যারীদা 'গোলাপবাগ' থেকে গাড়ী ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। প্যারীদাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বললেন—তুই আসলি ?

প্যারীদা অতি কষ্টে এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে মমতার আর্ত্তি। প্যারীদার দৃষ্টিতে আনন্দ-উচ্ছল কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

প্যারীদার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর একের পর এক প্রশ্ন ক'রে চললেন।

প্যারীদা উত্তর দিতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—কানে শুনি না। কানটা যায় নাকি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর অতখানি vital urge and energy (প্রাণন-আকূতি ও উৎসাহ), তাই ঠিক আছিস। তোর মত অমন strong brain (সবল মস্তিষ্ক) ক'জনের আছে ? সোজা কথা ? তোর কান যাবে কী ক'রে ? ওই অবস্থায় তুই নাম করেছিস। ওষুধপত্র ঠিক ক'রে দিয়ে কালীকে রামকানালী পাঠিয়ে দিয়েছিস। তোর মত ক'জন পারে ? পরমপিতার দয়ায় তুই সেরে উঠলি ব'লে। আর তোর কত কাজ, তোর কি প'ড়ে থাকলি চলে ? তাড়াতাড়ি ঠেলে ওঠ্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণ-মাতান কথাগুলি শুনতে-শুনতে প্যারীদা যেন দেখতে-দেখতে চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন। তাঁর চেহারা বদলে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ খেলে কেমন হয় ?

প্যারীদা—ভালই হবে মনে হয়।

প্যারীদা কেষ্টদাকে বললেন—আমার খুব অবনতি হয়েছে, নইলে ঠাকুরের কথা কখনও বিস্মরণ হবার মত হয় ? মাঝে কিছুই যেন আমার মাথায় ছিল না। সবই যেন ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সবিস্ময়ে)—বলিস কী ? শুনিস পরে—কী অসম্ভব কাণ্ড তুই করেছিস। আরো ভাল হ', তখন শুনবি।

প্যারীদা—আপনার মাথাধরা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে, তুই ভাল হ'।

প্যারীদা—আমি ভাল হ'লে তো আপনার মাথাধরা কমবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ভাল হ'লে, আমাকে ভাল ক'রে দেখতে পারবি।

কাজলভাই সামনের জীপ গাড়ীতে বসে নড়াচড়া করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজল! ওখান থেকে নামাই তো ভাল। হঠাৎ যদি কিছুতে লেগে-টেগে যায়।

কাজলভাই তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বই আনিয়ে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখের গুণাগুণ দেখতে লাগলেন। চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ সম্বন্ধে প'ড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধটি অনুমোদন করতে পারলেন না। তখন বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—'বাত চিন্তামণি' কেমন হয় দেখেন তো! আমাকেও দেখাবেন।

বীরেনদা—আপনি যেটা মুখ দিয়ে বলবেন, সেইটেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন-কিছু সম্বন্ধে investigation (গবেষণা) করতে গেলে খোলা মন নিয়ে করতে হয়। আগে থেকে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মনের মধ্যে কোন সংস্কারপ্রসূত ধারণা বা ঝোঁক পুষে রাখলে বিষয় সম্বন্ধে বাস্তব বোধ বা অনুভূতিই ঠিক-ঠিক মত হয় না। ওতে ঠ'কে যেতে হয়। ঐ অভ্যাসটা ভাল নয়। কোনকিছু সম্বন্ধে যখন আপনাদের study (অধ্যয়ন) করতে বলি, তখন যেমন ক'রে study (অধ্যয়ন) করতে হয়, তেমন ক'রেই তা' করবেন। আর, লোকের সঙ্গে চলার ক্ষেত্রে judicial frame of mind (বিচারকসুলভ মনোভাব) নিয়ে চলবেন। অপরের কথা শুনে কাউকে ভাল বা মন্দ ব'লে ধ'রে নেবেন না। অরঞ্জিল দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সব দেখে-শুনে তার অবস্থা ও পরিস্থিতি পূর্ব্বাপর সম্যকভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ক'রে তবে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবেন। তবে কার master-complex (প্রভু-বৃত্তি) কী সেটা বোঝা লাগে। মোদ্দা কথা, সব ব্যাপারেই সর্বদা uncoloured keen and thorough observation (অরঞ্জিল তীক্ষ্ণ ও সম্যক পর্য্যবেক্ষণ) চাই-ই কি চাই।

প্যারীদা—একটা hopeful sign (আশাপ্রদ লক্ষণ) এই যে বরাবর এমন নয়। প্রথমটা বেশ কানে শুনতাম। আজ দু'দিন কানের মধ্যে খুব ভোঁ-ভোঁ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই সাক্ষী যে ভিতরে damage (ক্ষতি) হয়নি। আর, তুই তো ওদের ছোট কথাও শুনতে পাচ্ছিস, আমার বড় কথাও শুনতে পাচ্ছিস।

প্যারীদা—হ্যাঁ! তা' ঠিক।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে সন্ধ্যার পর বিদায় নিলেন।

২৬শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।৩।১৯৪৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলি), প্রকাশদা (বসু), মণিদা (সেন), ভোলানাথদা (সরকার), উমাদা (বাগচী),

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (মিত্র), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রভৃতি। শ্রী এন. সি. চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিচিত একজন ভদ্রলোকও এই সময় আসলেন। তাঁরা এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বললেন—একটা মানুষগড়ার university (বিশ্ববিদ্যালয়) করা একান্ত প্রয়োজন। সেখানে একটা কলেজ অফ ডিভিনিটি থাকলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথাগুলি ও'কে প'ড়ে শুনালে হয় ফাঁক মত।

কেষ্টদা—Education (শিক্ষা) সম্বন্ধে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু তা' কেন ? সব-কিছুই। একটা ছাড়া তো আর একটা নয়।

কেষ্টদা বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ঋষিদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করার কথা। যেমন, শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্যপ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। ওর ভিতর-দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ এবং অতীত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সঞ্জীবিত হ'তে পারে। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের যোগসাধন ক'রে যুগোপযোগী-ভাবে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে হবে। আর, শিক্ষার ভিত্তি হবে শ্রদ্ধা ও সেবা। প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হবে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। Theoretical (তত্ত্বগত) ও practical (বাস্তব) দুই রকম training-এর (শিক্ষার) উপরই সমান তালে জোর দিতে হবে। দেখতে হবে প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক দিয়ে উন্নত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কী গোত্র ?

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—কাশ্যপ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নবাগত ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ?

তিনি বললেন—শাণ্ডিল্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—We are men of same sperm (আমরা একই বীজের মানুষ)। আমিও শাণ্ডিল্য।

কেষ্টদা পূর্ব্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বললেন—শিক্ষার মধ্যে হলকর্ষণ থাকবে compulsory (আবশ্যিক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজা জনকের সময় থেকে ছিল হলকর্ষণোৎসব। এটা বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেই করত। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রের biological habits and traits-এর (জৈবী অভ্যাস ও গুণাবলীর) উপর লক্ষ্য রাখা লাগে।

কেষ্টদা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমের different variety (নানা জাত) আছে, তার মধ্যে একটা specific specification (বিশেষ বৈশিষ্ট্য) হ'ল ন্যাংড়া। ন্যাংড়া আমগাছের nurture (পোষণ) দিতে গেলে তার বিশিষ্ট রকমেই দিতে হবে। তবেই গাছ ও সেই সঙ্গে তার ফল ও তার স্বাদ ভাল হবে। যার জন্য যা' যে-মাত্রায় যখন যেমন প্রয়োজন, তার জন্য তা' সে-মাত্রায় তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে হবে না। জল দেওয়ারও সময় আছে, সার দেওয়ারও সময় আছে। আবার, তার পরিমাণও আছে। বিহিত রকমে না করলে করাটা বরবাদ হয়ে যাবে। সেই জন্য যাকে শিক্ষা দিতে হবে, তাকে ঠিকমত অনুধাবন করা চাই। আর চাই, তার প্রয়োজনগুলি ঠিকমত পূরণ করা। এই প্রয়োজনের নানা রকমারি আছে। সময় বিশেষে কারও হয়তো অসুবিধার মধ্য-দিয়ে চলা তার পক্ষে মঙ্গলজনক। সেখানে তাকে struggle (সংগ্রাম) করতে সুযোগ না দেওয়া মানে তার ক্ষতি করা। যার যাতে ভাল হয়, তার জন্য তা' করাই education ও nurture-এর (শিক্ষা ও পোষণের) অঙ্গ।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় কেষ্টদাকে বললেন—নানা-প্রসঙ্গের ভিতর আর্য্য হিন্দুদের সম্বন্ধে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেটা দেখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দু-সম্বন্ধে আমার কী দেওয়া আছে যেন।

সেই কথার পর প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি উক্তি প'ড়ে শুনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের অত্যন্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য-দিয়ে জীবনযাপন করা লেগেছে। তাদের existence (অস্তিত্ব) ছিল at stake (বিপদাপন্ন), তার জন্য তাদের খুব fight (সংগ্রাম) করা লেগেছে to exalt existence (অস্তিত্বকে উন্নীত করতে)। সেইজন্য তারা বরাবর অভিজাত নেতা অর্থাৎ গুরুকে মেনে চলার সংস্কারটিও লাভ করেছে। শ্রেয়-আনুগত্য, অস্তিত্ব-পোষণী সংগ্রাম ও অসৎ-নিরোধী প্রবণতা তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে অল্প-বিস্তর গেঁথে গেছে। এগুলি biological evolution-এর (জৈবী বিবর্ত্তনের) মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই, এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে nurture (পোষণ) না দিয়ে ignore (অবজ্ঞা) করা ঠিক নয়। বর্ণগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য মানার একান্ত প্রয়োজন আছে। কারণ, ঐ বৈশিষ্ট্য দেহবিধানের সঙ্গে জড়ানো থাকে। যখন biological reversion (জৈবী অধগমন) হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না তখনই হয় উন্নত বর্ণে অধিগমন। সাধনার ভিতর-দিয়ে যে-কোন বর্ণের মানুষই এক-জীবনেই হয়তো ব্রাহ্মণ হ'তে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে।

কিন্তু বিপ্রবর্ণে উন্নীত হ'তে গেলে কোন বর্ণের পাঁচ পুরুষ, কোন বর্ণের সাত পুরুষ, আবার কোন বর্ণের পর-পর চোদ্দ পুরুষ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া লাগে, তাদের বলে অধিকারী বামুন। ফলকথা, জন্মগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে শিক্ষা বা সাধনা সুরু করলে তাতে সিদ্ধি আসার সম্ভাবনা থাকে কমই।

কেষ্টদা—Psychologist (মনোবিজ্ঞানী)-রা বলেছেন children must first be bread and then educated, you can not have silk out of cotton (শিশুদের আগে জন্ম দিতে হবে তারপর শিক্ষিত করতে হবে। তুলো থেকে তোমরা রেশম পেতে পার না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য বিয়ের উপর অত জোর। বিয়ে ঠিকমত না হ'লে ভাল সন্তান জন্মাতে পারে না। সংহিতার বিধান, ব্যাৎস্যায়নের কামসূত্র ইত্যাদি সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা ভাল ক'রে খতিয়ে দেখি না, তাই গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার চেষ্টা করি। ফলে কোন চেষ্টাই সার্থক হ'য়ে ওঠে না। আমি বলি (শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য ক'রে) ব্যাৎস্যায়ন যা' পেরেছেন কাশ্যপ তা' পারবেন না কেন? দৈন্য যে আজ কত বেশী তা' ভেবে পাওয়া যায় না। বাইরের দৈন্যের চাইতে ভিতরের দৈন্য আরও ভয়াবহ। এ দূর করতে গেলে খাটুনির অন্ত নেই।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—সাধারণতঃ দেখা যায় যারা সামান্য লেখাপড়া শেখে তারা যদি চর্চ্চার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে কিছুদিন পর যা' শিখেছে তা'ও ভুলে যায়। তাই সারা দেশের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

কেষ্টদা—প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকে তাদের জীবিকামূলক কর্ম্মের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। তাহ'লে তা' সহজে ভোলে না। আর, modern psychology (বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব) বলছে educability (শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা) দেখে শিক্ষা দেওয়ার কথা। অনেকের অনেক জিনিষ শেখাই সম্ভব নয়। এই বাস্তব সত্যটা মনে রেখে চললে অর্থ ও উৎসাহের অপব্যয় নিবারিত হ'তে পারে। মানুষের প্রকৃতিগত সীমারেখাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ভিতর-দিয়ে যাকে যতটা উন্নত করা যায় সেই চেষ্টাই করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিজনদের সেবা করা সম্বন্ধে আমার মনে হয়, বিহিত শিক্ষা, দীক্ষা ও আচার-আচরণের ভিতর-দিয়ে ওদের উন্নত ক'রে তোলা সঙ্গত। হরিজন ব'লে আলাদা একটা ছাপ মেরে ওদের মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা ভাল নয়। মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা জাগে যাতে তা' করা ঠিক নয়।

কেষ্টদা—আজকাল অনেকে দাবীর কথা ভাবে কিন্তু করণীয়ের কথা ভাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে inefficiency (অযোগ্যতা) বেড়ে যায়। সমাজে যারা বড় হয়েছে তাদেরও দায়িত্ব হ'ল অনুন্নত যারা তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তা'দিগকে উন্নত ক'রে তোলা। বড় যদি ছোটকে ভাল না বাসে এবং ছোট যদি বড়কে শ্রদ্ধা না করে তাহ'লে কিন্তু ফল ভাল হয় না।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় কেষ্টদাকে বললেন—গীতার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর কী বলেন সে-সম্বন্ধে আপনি যদি একটা ছোট বই লিখে দেন তাহ'লে আমাদের পক্ষে সুবিধে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক দেওয়া আছে। চতুর্ভুজ কথা নিয়ে কতজনে কত ব্যাখ্যা করেছে তার অন্ত নেই। অথচ এর মানে হ'ল—হে কৃষ্ণ! তুমি সীমায়িত হ'য়ে দেখা দেও। বাসুদেব ব'লে যেখানে বলেছেন সেখানেও বসুদেবের ছেলে এই অর্থ গ্রহণ না ক'রে আমরা নানা দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছি। ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করার একটা ঝোঁক আমাদের পেয়ে বসেছে। অকাম যে কত করিছি তার ইয়ত্তা নাই—বহু কিছু undo (প্রতিকার) করা লাগিব।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—গীতা যেন আজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাত্রার মত হয়েছে। প্রকৃত গীতা কোথায় তলিয়ে গেছে।

কেষ্টদা—সমত্ববোধের কথা কতজনে কত ব্যাখ্যা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমজ্ঞান যদি হয় আর অসমজ্ঞান যদি না থাকে তবে তা' insanity (বাতুলতা)। মানুষে-মানুষে যেমন আছে সমতা তেমনি আছে বৈশিষ্ট্য-প্রসূত পার্থক্য বা অসমতা। এই দুটো দিক জানলে জানাটা সম্পূর্ণ হয়। তাকেই কয় ব্রহ্মজ্ঞান। সম মানে equitability (বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সমীচীন ব্যবস্থা), তথাকথিত equality (সমতা) নয়কো। সমদর্শী ব্রাহ্মণ যে মুদ্দফরাসকে ঘৃণা করবে তা' নয়। বরং তাকে ভালবাসবে ও তার যাতে ভাল হয় তাই করবে। কিন্তু তাই ব'লে সে তার অন্ন খেতে যাবে না সদাচারের বিধি লঙ্ঘন ক'রে। সদাচার মানে বাঁচাবাড়ার আচার। আমরা চারটে রেকাবী নিয়ে বাবার পাশে খেতে বসতাম। কিন্তু বাবার পাতা ছোঁবার জো ছিল না। এতে কি বুঝতে হবে তিনি আমাদের ঘৃণা করতেন? তা' নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর বামনাই আচার পালন করতেন। আপনার যখন সর্দ্দি হবে তখন কিন্তু আপনি untouchable (অস্পৃশ্য)। কারণ, তখন আপনার হাতে জল

খেলে দু'দিনেই সর্দ্দি লেগে যাবে। যেখানে-সেখানে খেয়ে বহু লোকে infected (সংক্রামিত) হয়। তাই সমীচীন সাবধানতা অবলম্বন ক'রে চলা কি ভাল নয় ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন সত্যিকার উদার। তাঁদের মধ্যে অনুদারতা নেই কোথাও।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আমার মা যে আমার এত আপন তাঁর কাছেই তো আমি বাইশ ঘণ্টা untouchable (অস্পৃশ্য)। কোর্ট থেকে এসে তাঁকে ছোঁয়া যাবে না যতক্ষণ স্নান না করি।

মনুর বিধান-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, মনুর মধ্যেই আছে দেশকালপাত্রোপযোগী ক'রে বিধানগুলি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার কথা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই এই যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধনের মালিক। তিনি হলেন normal dictator (স্বাভাবিক নিয়ন্তা)। তাঁর অবর্ত্তমানে শিষ্যদের পরিষৎ তাঁর নীতি-অনুযায়ী work (কাজ) করবে। মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত না হ'লে মেধানাড়ী খোলে না। মেধানাড়ী না খুললে proper conception (যথাযথ ধারণা) হয় না। আর, যাদের conception (ধারণা) clear (স্পষ্ট) নয়, তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সম্বন্ধে ঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। তাই কোন লোক-কল্যাণকর পরিষদের সদস্য হ'তে গেলে চাই আদর্শনিষ্ঠ সুশাসিত চরিত্র ও অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীমত্তা।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—মানবধর্ম্মশাস্ত্র বহুদিন থেকে চ'লে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মশাস্ত্র মানে that which upholds life and growth (যা' জীবন ও বৃদ্ধিকে ধারণ করে)। এটা একটা সোনার পিতলে ঘুঘু নয়।

স্মৃতিশাস্ত্র-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্মৃতি মানে সেই স্মারিণী—যা' স্মরণ ক'রে জীবনের পথে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বুদ্ধদেবের Budhism (বৌদ্ধধর্ম্ম) এবং অশোকের Budhism (বৌদ্ধধর্ম্ম)-এর মধ্যে তফাৎ আছে। শুনেছি, বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রমের মূল সত্য মানতেন। গৃহীদের জন্য তিনি যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন তার সঙ্গে প্রামাণ্য হিন্দু-সংহিতার কোন বিরোধ নেই।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—যুদ্ধবিগ্রহ ক'রে অশোকের মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাঁর পরবর্ত্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এক জীবনে তিনি করেছেন ঢের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশোক যদি রাজা না হতেন তাহ'লে অতখানি করতে পারতেন

না। তাঁর সমগ্র রাজশক্তিটা ছিল তাঁর ধর্ম্মাভিযানের পিছনে। যাহোক, আমরা যদি চেষ্টা করি তাহ'লে বৌদ্ধই হোক, শিখই হোক, হিন্দুই হোক, এমন-কি মুসলমান, খৃষ্টান পর্য্যন্ত হোক না কেন—সবাইকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ক'রে তুলতে পারি। ধর্ম্ম কখনও এক বৈ দুই হয় না। ঈশ্বরও এক, তাঁর বার্ত্তাবাহী মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে কোন বিরোধ নেইকো। আর, conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ) জিনিষটা ঠিক নয়। হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয় এবং মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয় তবে ধর্ম্মপ্রাণতার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে মিল হ'তে পারে। কারও সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ভাল নয়। পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করাও মহা-অপরাধ। আমাদের spine (মেরুদণ্ড) ভেঙ্গে গেল সেইদিন যেদিন থেকে আমরা পঞ্চবর্হির মূল নির্দ্দেশ অবজ্ঞা করতে সুরু করলাম। তখন থেকে আমরা অপরের খোরাক হলাম, কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরকে আপন ক'রে নেবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেললাম।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—সাধারণতঃ দেখা যায় বর্ণাশ্রম যেখানে অটুট ছিল সেখানকার হিন্দুরা বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মধ্যে নীচুকে উঁচু করার পন্থা ছিল, কিন্তু উঁচুকে নীচু করেনি এরা। তাই অনুলোমের প্রচলন ছিল কিন্তু প্রতিলোমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। পুরুষের বহুবিবাহও চালু ছিল। আমার মনে হয় বিহারের ভূঁইহার বামুনদের মা ছিল ক্ষত্রিয়। রাজপুতদের মধ্যে, মারাঠাদের মধ্যে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ খুবই চলত। অনুলোমক্রমে বাইরের সমাজ থেকে মেয়ে ঘরে আনলেও ভাল বই মন্দ হয় না। এতে সমাজ বৃদ্ধির দিকে চলে। Ideal (আদর্শ) ও eugenics (সুপ্রজনন) এই দুটো ঠিক রেখে চলতে পারলে বড় হওয়ার পথ এন্তার খোলা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সকলেই খুব উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন। এবং প্রসন্ন অন্তরে একে-একে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আমতলায় এসে বসেছেন। চোখে তাঁর অপার্থিব আনন্দের দ্যুতি, মুখে তাঁর প্রাণকাড়া মৃদুমধুর হাসি, সর্ব্ব-অঙ্গ ঝলমল করছে এক অপরূপ রূপলাবণ্যের আলোয়। ভক্তবৃন্দ বিভোর হ'য়ে তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্ত্তি দর্শন করছেন আর শুনছেন তাঁর শ্রুতিসুখকর, সর্ব্বসন্তাপহারী মধুর বচন।

একটি বাণীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা অনেক সময় মনে করি, যে ভাল-ভাল কথা বলতে পারে ও উপরপালিশ সেই বুঝি জ্ঞানী। কিন্তু মানুষের ঐ বলার সাথে তার চলার মিল আছে কিনা, আত্মবিচার ও আত্ম-সংশোধনের প্রয়াস আছে কিনা, সেই বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা যায় সে জ্ঞানী কিনা। যে জ্ঞানী, যে বুদ্ধিমান, সে কখনও অপরের দোষ দেখে দুষ্ট হয় না। দোষ দেখে দুষ্ট হওয়ার একটা প্রধান লক্ষণ হ'ল দোষীর উপর বিদ্বিষ্ট হওয়া। যে জ্ঞানী সে বুঝতে চেষ্টা করে কেন মানুষ দোষ করে। তার rectification (সংশোধন) যাতে হয়, সেইদিকেই তার লক্ষ্য থাকে। তার শাসনের মধ্যেও love (ভালবাসা) ও sympathy (সহানুভূতি) থাকে পুরোমাত্রায়। কিন্তু নিজের প্রতি সে হয় অত্যন্ত কঠোর। অক্লান্ত চেষ্টায় সে আচরণসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে, সদভ্যাস পাকা ক'রে ফেলে। তাই বলে, habit is second nature (অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব)। আর, এই অভ্যাস, ব্যবহার ও স্বভাব যার যত সঙ্গতিশীল সে তত জ্ঞানী।

কেষ্টদা—এমন কোন অবস্থা কি আছে যেখানে আর পতন হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত প্রবৃত্তি ইষ্টে thoroughly interested (সম্পূর্ণভাবে অন্তরাসী) হ'লে তখন পতনের ভয় থাকে না। যে-সব প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে না, সেগুলিকে প্রশ্রয় দিলে বেঘোরে প'ড়ে যেতে হয়। সেগুলি নাকে দড়ি দিয়ে যে কোন্ ভাগাড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে, তার ঠিক নেই। অহঙ্কার, অভিমান ও নিজ খেয়ালের এলাকা পার হ'য়ে যে ইষ্টের চির-অনুগত দাস হ'য়ে তাঁর মর্জ্জিমত চলতে রাজী থাকে, পরমপিতার দয়ায় সে রেহাই পেয়ে যায়। যে হয় তাঁর, সে পায় নিস্তার। সত্যিকার টান থাকলে, সাময়িক স্খলন-পতন হ'লেও আবার ঠেলে ওঠে। অনুতাপ তাকে এমন ক'রে ঠেসে ধরে, যে সে নিজেকে সংশোধন না ক'রেই পারে না।

কেষ্টদা—বলা হয়, এমন বস্তু আছে যা' জানলে জানার আর কিছু বাকী থাকে না, আবার বলা হয়, বেদ অনন্ত—এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানার বাকী থাকে না, কিন্তু করার বাকী থাকে। যেমন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিন লোকে আমার কিছু করণীয় নেই এবং আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নেই। তথাপি আমি লোককল্যাণের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি। যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্য করা ফুরোয় না। তার জন্য যত করা যায়, ততই তাকে উপভোগ করা যায়। করার ভিতর-দিয়ে আবার বোধ ও জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। সৃষ্টির মূলসূত্রকে জানলে সৃষ্টি-সম্বন্ধে জানতে

কিছু বাকী থাকে না। এ-কথা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও ঠিক যে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ মূলসূত্র কিভাবে work (কাজ) করছে, তা' না জানলে ঐ জানা পূর্ণ হয় না। তাই দুই-ই ঠিক।

কেষ্টদা—হিন্দুদের মধ্যে সহস্র-সহস্র লোকের সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করার প্রথা আগে তেমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বড়-বড় যজ্ঞ ও ধর্ম্ম-উৎসবাদিতে রকমফের-ভাবে এর প্রচলন ছিল, otherwise (অন্যথা) individual (ব্যক্তিগত) সাধনা প্রধান ছিল। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এর প্রচলন করা হয়েছিল সংহতির জন্য। ব্যক্তিগত সাধনার কাজ সমবেত প্রার্থনায় সিদ্ধ হবার নয়। তাই ব্যক্তিগত সাধনা করাই লাগে। সেই সঙ্গে সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করাও দরকার। ওতেও উদ্দীপনা লাভ করা যায়।

কেষ্টদা—একটা দেশ হয়তো অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, সেই দেশের লোক যখন যুদ্ধ-জয়ের আশায় সমবেতভাবে প্রার্থনা করে, তখন তাকে ভণ্ডামি ব'লেই মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোশ খবরের ঝুটোও ভাল, ধর্ম্মের ভানও ভাল। যেমন ক'রেই হোক, পরমপিতার কথা ভাবতে অভ্যস্ত হ'লেই ক্রমে-ক্রমে মানুষ শুদ্ধ ও সৎ হবার তাগিদ অনুভব করে।

কেষ্টদা—শুধু সামরিক শক্তির বলে রাষ্ট্র গড়লে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টেকে না। ভেঙ্গে যায়। জনসাধারণের বাঁচাবাড়ার জন্য যা'-যা' প্রয়োজন সেই প্রয়োজনগুলির পরিপূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্র গড়তে হয়। আর তার প্রতিবন্ধক যেগুলি হ'তে পারে, সেগুলির নিরসনের ব্যবস্থাও রাখা লাগে রাষ্ট্রের মধ্যে।

কেষ্টদা—একটা দেশেও যেমন, সারা বিশ্বেও তেমনি অজস্র বৈচিত্র্য থাকবেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা বা বিশ্ব-সংস্থার মধ্যে এগুলিকে কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ক'রে তোলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবীর প্রত্যেকে যদি অবিকল একরকম হ'ত, তাহ'লে কেউ কাউকে বোধ করতে পারত কিনা সন্দেহ। আবার, অপরের থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিজেকেও হয়তো চিনতে পারতো না। সবাই একাকারতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত। আর, ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব নষ্ট হ'লে সেই সঙ্গে-সঙ্গে সব-কিছুরই নষ্ট হবার উপক্রম হ'ত। তাই, সৃষ্টির রচনাই এমনতর যাতে ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব নষ্ট না হয়। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব থেকে যখন সমষ্টিব্যক্তিত্ব গজিয়ে ওঠে, তখন কিন্তু ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব

নষ্ট হয় না, বরং ওর ভিতর-দিয়েই ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করে।

কেষ্টদা—ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব থেকে সমষ্টিব্যক্তিত্ব গজিয়ে ওঠা বলতে কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আছে, নিজেকে সকলের মধ্যে দেখা এবং সকলকে নিজের মধ্যে দেখা। এই অনুভূতি জাগলে সমষ্টিব্যক্তিত্ব গজিয়ে ওঠে। তখন সেই ব্যক্তি সবার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে, কা'রও বৈশিষ্ট্য সে নষ্ট করতে চায় না, সে কারও ক্ষতি করতে পারে না, কাউকে খাটো করার বুদ্ধি তার হয় না, অপরের উন্নতিতে সে আত্মোন্নতির আনন্দ অনুভব করে, কেউ তার অপকার করলেও সে তার প্রতি দ্রোহভাব পোষণ করে না। তাই ব'লে সে অন্যায়কেও বরদাস্ত করে না। প্রীতি ও পরাক্রমের সঙ্গেই সে তা'র প্রতিকার করে অক্ষুব্ধ অন্তরে। এমনতর মানুষ স্বভাবতঃই দূরের ও নিকটের সকলেরই বান্ধব হ'য়ে ওঠে। সে এমনতর শুভসংহতির হোতা হ'য়ে ওঠে, যার ফলে দেশ-বিদেশের মানুষ আত্মীয়-আলিঙ্গনে দানা বেঁধে ওঠে। তাই নিজের দেশের ও সারা জগতের মঙ্গল যদি চাই তাহ'লে প্রত্যেকটি individual (ব্যক্তি)-কে goad (চালনা) করতে হবে সমষ্টিব্যক্তিত্বের প্রতীকস্বরূপ আদর্শের দিকে, যাতে তাঁকে ভালবেসে তাদের ভিতরও সমষ্টিব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে। এই হ'ল পথ। এতে শুধু মানুষকেই আপন মনে হয় না, প্রতিটি জীব, প্রতিটি সত্তাকেই পরমাত্মীয়ের মত মনে হয়। নিজ সত্তা দিয়ে এটা বোধ করা যায়। আমি যেমন out of sympathy (সহানুভূতি থেকে) শকুন হলাম, শকুন হ'য়ে মরাগরু খাওয়ার স্বাদ পর্য্যন্ত টের পেলাম, আবার শিয়াল হলাম, শিয়ালের মত আচরণ করলাম, নিজেকে সজ্ঞানে শিয়াল ব'লে বোধ করলাম, অথচ আমি আমিই আছি। এ-সব তো গল্প কথা নয়। সব জিনিষের পরিষ্কার স্মৃতি মাথায় আছে, যার জন্য আমি বলি পাখী-মানুষ, ঘোড়া-মানুষ, ব্যাঙ-মানুষ ইত্যাদি। অর্থাৎ according to complex (প্রবৃত্তি-অনুযায়ী) shape (আকার) নিয়েছে প্রত্যেকে তার মত ক'রে। আত্মারই ব্যাং-রূপ, ঘোড়া-রূপ বা মানুষ-রূপ ইত্যাদি। একা আমিই যেন এত হয়েছি, এত রূপ ধ'রে আছি। কাকে বাদ দেব বলুন ? এইটে হ'লো বাস্তব সত্য। তাই, প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি প্রদেশ, প্রতিটি দেশের স্ববৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য সবার সঙ্গে inter-interested (পরস্পর অন্তরাসী) হ'য়ে চলা ছাড়া পথ নেই। এটা বাদ দিয়ে যে চেষ্টাই হোক তাতে failure (অকৃতকার্য্যতা) অনিবার্য্য।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আপনি যেভাবে সব জিনিষ স্পষ্ট ক'রে ব'লে গেলেন, এমন আর দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটি সরিয়ে নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে বললেন—চাবি-কাঠি আপনাদের হাতে এসে গেছে, ইচ্ছা করলে আপনারা খুলবারও পারেন আবার বন্ধ করবারও পারেন। এখন আর না-বোঝার দরুণ খানায় পড়বার জো নেই।

কেষ্টদা—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি, ধনৈরপি'—এ-কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থাৎ, স্ত্রী-পুত্র ধন-জনের প্রতি আসক্তি বা মমতা যেন সত্তাসংরক্ষণের প্রয়োজনকে উল্লঙ্ঘন না করে। এর মানে এই নয় যে আর একজনের বিনিময়ে নিজে বাঁচতে হবে। আবার, এটাও ঠিক নয় যে আমার বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজন হ'লেও মায়াবশতঃ আমার আপনজনকে আমার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে দেব না। ধন তো জীবনের জন্যই, আর প্রিয়জনরা পরস্পরের জন্য এমনভাবে করবে, যাতে একের করা অপরের জীবনরক্ষার সহায়ক হয়। একক কেউ বাঁচতে পারে না। পারস্পরিক করা ও আদান-প্রদানের উপর দাঁড়িয়েই প্রত্যেকের বাঁচাটা বেঁচে থাকে। অপরকে যত বেশী পারি সেবা দেব, কিন্তু অপরের সেবা যথাসম্ভব নেব না, এ-বুদ্ধি ভাল। তবে অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'লেও অপরের সেবা নেব না, এ জিদ ঠিক নয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বলাগুলিকে testa-maxim (পরীক্ষিত নীতি) নাম দেবার কই, কারণ সব tested fact (পরীক্ষিত তথ্য)।

সুশীলদা (বসু) ও ডাক্তার এস. কে. নাগচৌধুরী এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

তাঁদিগকে কয়েকটি বাণী প'ড়ে শোনান হ'ল। তার মধ্যে একটি বাণী ছিল—Love-shock is the shock that shakes the source of vital flow. (প্রীতিসংশ্লিষ্ট সংঘাত হ'ল সেই সংঘাত যা' জীবনপ্রবাহের উৎসকে বিচলিত করে)।

এই বাণীটি পড়ার পর উভয়েই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন একজন হয়তো শোকে প্রাণত্যাগ করল। মানুষ বাঁচে ভালবাসার উপর দাঁড়িয়ে। সেই ভিত্তিমূলে কঠোরভাবে আঘাত পড়লে প্রাণ-রক্ষা করা দায় হয়। শুনেছি চৈতন্যদেবের একজন ভক্ত সঞ্চয়-হিসাবে হরীতকী রাখায় তিনি তাকে ত্যাগ করেছিলেন, তাই সে পরে মারা গেল। আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ করার মুহূর্ত্তেই তার মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য, ইষ্টবিরহপূত এই মৃত্যুতে তার আত্মার কল্যাণই অবধারিত হয়েছে। আবার, দেখা যায় লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর রামচন্দ্রের আর বাঁচার ইচ্ছা রইল না। তাঁর প্রাণত্যাগ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠলো।

সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের দিকে মুখ ক'রে পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সবাই স্তব্ধ হ'য়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর ভাবসমাহিত মূর্ত্তি দর্শন করতে লাগলেন।

কিছু সময় চুপচাপ কাটলো।

তারপর ডাক্তার নাগচৌধুরী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন—মনে হয় সব লাইন পাতা, যার যে-রাস্তায় চলতে হবে, সব ঠিক আছে, তার নড়চড় হবার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ভগবানের বাচ্চা। ভগবান যেমন all-sided (সর্বাদিক-ওয়ালা), almighty (সর্ব্বশক্তিমান), মানুষও তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অল্পবিস্তর তেমনি। তার বহুদিক খোলা। সব-কিছু পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত নয়। লোকে প্রবৃত্তির অধীন হ'য়ে চলে ব'লে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে থাকে, ছোট হ'য়ে থাকে। যখন সে পরমপিতার অধীন হ'য়ে চলে, তখন তার গণ্ডী প্রসারিত হ'তে থাকে, সে ব্রাহ্মীজীবনের দিকে এগিয়ে চলে। জ্যোতিষীর হাতে প'ড়ে অনেকে নষ্ট হয়। সব-কিছুর পরিসমাপ্তি পরমপিতায়। আর, পরমপিতা অনন্ত, তাই মানুষের পারগতা-সম্বন্ধে গণ্ডী টেনে দেওয়া ভাল নয়। আরোর পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। আপনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু পারেন।

ডাক্তার নাগচৌধুরী—ইচ্ছা হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাহিদা থেকে। অবশ্য, চাহিদা-অনুযায়ী করা চাই। আর, সে করণেওয়ালা বা কর্ত্তা আপনিই।

ডাক্তার নাগচৌধুরী—যদি আমিই কর্ত্তা হই, তাহ'লে তো আমি যা' ইচ্ছা করি, তাই-ই হওয়া উচিত; কিন্তু তা' তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা করি না, তাই হয় না। যেমন ক'রে যা' করতে হয়, তেমন ক'রে তা' করি না, তাই হয় না। অর্থাৎ, বিধিমাফিক করি না, তাই হয় না। সেই বিধিটাই জানার জিনিষ ও পালন করার জিনিষ। কী ক'রে করতে হয়, সে এক-একটা aspect-এ (দিকে) এক-এক রকম। গলার কায়দায় নাক পরীক্ষা করতে পারবেন না। নাক পরীক্ষা করার আলাদা কায়দা আছে। আবার, কান পরীক্ষা করতে গেলে তারও আলাদা ধরণ আছে। সেইজন্য বলে বেদ অনন্ত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Environment (পরিবেশ)-টা মাটির মত। মাটির মধ্যে যেমন অনুকূল উপাদান থাকলে বীজের বিকাশে সাহায্য করে, environment (পরিবেশ)-ও তেমনি ভাল হ'লে মানুষের সহজাত সদ্‌গুণের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।

ডাক্তার নাগচৌধুরী—মানুষে-মানুষে এত পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা প্রত্যেকে পূর্ব্বজন্মে যে-ভাব নিয়ে দেহত্যাগ করেছে এবং সেই ভাব অনুপাতিক এই জীবনে যে-ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তার এই জীবনের পরিবেশ ও তার নিজের চলনটাও তার উপর ক্রমাগত ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চালায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লিখবি নাকি ?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

সুষ্ঠু দেওয়ায় বাড়ে মায়া
সু-আহারে পুষ্ট কায়া।

একটু পরে বললেন—

মানুষ কেনে গুণে
দ্রব্য মেলে ধনে।

তারপর বললেন—যে চারিত্রিক গুণপনা, সেবা-সহযোগিতা ও ভালবাসা দিয়ে মানুষ উপায় করতে পারে, তার আর ভাবনা থাকে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর-সহ সকলেই ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

১লা চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৪।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে রঙ্গনভিলায় এসেছেন শ্রীযুত এন. সি. চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজ-খবর নিতে। তিনি একখানি ইজিচেয়ারে বসেছেন। সামনে পাতা একখানি সতরঞ্চের উপর বসেছেন শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়, শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), ডাক্তার এস. কে. নাগচৌধুরী প্রভৃতি।

প্রাথমিক কথাবার্ত্তার পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ প্রকৃত বামুন চাই। প্রকৃত বামুন হ'লেন normal representative of society (সমাজের স্বাভাবিক প্রতিনিধি)। প্রত্যেকটি community (সম্প্রদায়)-এর প্রত্যেকটি interest (স্বার্থ)-ই তাঁর interest (স্বার্থ), প্রত্যেকটি individual-এর (ব্যষ্টির) interest (স্বার্থ)-ই তাঁর interest (স্বার্থ)। এইটে দেখতে গেলেই প্রত্যেককে তাঁর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী nurture (পোষণ) দিতে হয়। কারণ, দুনিয়ায় কেউ কারও মত নয়। আর, বামুন যে লোকের সেবা করেন, তার পিছনে তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রত্যাশা থাকে না। অপরের ভাল ক'রেই তাঁর আত্মপ্রসাদ, তাতেই তাঁর আনন্দ। আর, এই করাই ডেকে নিয়ে আসে

মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-অবদান। এই দেওয়ার ভিতর-দিয়েই লোকের কল্যাণ হয়, তাদের যোগ্যতা ও দেবভাব বেড়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—দেবভাব বাড়ে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবগুণসম্পন্ন মানুষের জন্য যত করা যায়, ততই তাঁর উপর টান বাড়ে। তাঁর উপর টান বা অনুরাগ যত বাড়ে, ধীরে-ধীরে চরিত্রও তাঁর ভাবে তত অনুরঞ্জিত হয়—প্রত্যেকের তার মত ক'রে। তাই বলে, ভালবাসায় রং ধরে।

দেশের স্বাধীনতা-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রকৃত স্বাধীনতা ব'লে কিছু হয়নি। প্রভু-পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র। আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে পরস্পর পরস্পরের আপন হ'য়ে না উঠলে প্রকৃত স্বাধীনতা হয় না।

সংবিধান-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইংল্যাণ্ডের constitutional monarchy (নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র)-টা আমার খুব ভাল লাগে। ওতে রাজা ও রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্যের ভিতর-দিয়ে একটা sentimental binding (ভাব-বন্ধন) ঠিক থাকে। অথচ ministry (মন্ত্রিসভা) ও parliament (লোকসভা) থাকায় রাজা যা' খুশী তা' করতে পারেন না। অর্থাৎ, তিনি ভাল ছাড়া মন্দ করতে পারেন না। আবার, তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হ'লেও জনমনে তিনি যে শ্রদ্ধার আসন অধিকার ক'রে থাকেন, তার একটা শুভ প্রভাব হয় জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে। এর ভিতর-দিয়ে জাতির কল্যাণকর প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলার বুদ্ধি জাগে মানুষের মনে। আর, অতীতের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যুগোপযোগী চলনায় চ'লে শুভ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃষ্ট পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর মমতামধুর কণ্ঠে আবদারের সুরে ডাঃ নাগচৌধুরীকে বললেন—আপনারা ওকে (শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে) তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে দিন, যাতে খুব ছুটতে পারেন।

ডাঃ নাগচৌধুরী—সে তো আপনার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যাকুলভাবে)—আমি তো চাই-ই। আমি ভিক্ষা চাইছি, ক'রে দেবেন তো আপনারা।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আমার মনে হয় ঠাকুরের দেওয়া পাঁচনটায় খুব কাজ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন খুব ভিড় stand (সহ্য) করতে পারবেন, তখনই বুঝবেন যে ঠিক হয়েছেন। ভিড় কিন্তু সইতেই হবে, কাজ করতে গেলে।

—দেও, এক কলকি তামুক দেও, তামুক খেয়ে উঠি।—সহাস্যে বললেন ঠাকুর।

হরিপদদা (সাহা) তামাক সেজে দিলেন।

তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দিকে রওনা হ'লেন। গাড়ু-গামছা, পিকদানি, সুপারির কৌটা, গড়গড়া, টিকে, তামাক, দেশলাই, জলের ঘটি ইত্যাদি নিয়ে পিছনে-পিছনে কয়েকজন আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে-হাঁটতে মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানি মাজার উপর রেখে চুপিসারে কী যেন বললেন সুশীলদাকে।

২রা চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১৫।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে যেন এক অপার তৃপ্তি, শান্তি, প্রীতি ও আনন্দের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাছে আসলেই মন আপনা থেকে ঊর্দ্ধমুখী হয়।

শচীনদা (গাঙ্গুলী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), প্যারীদা (নন্দী), মহিমাচরণ দে প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তদ্গতচিত্তে তাঁর কাছে ব'সে আছেন।

শচীনদা তাঁর ছেলে অখিলদার বিষয় বললেন—সে ইচ্ছা করলে রামকানালীতে কৃষি ইত্যাদি করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'তে পারে সব। ক'রে নেওয়া লাগবে। একটা জিনিষ গ'ড়ে তুলতে গেলে যা' যা' লাগে, মাথা খাটিয়ে দায়িত্ব-সহকারে সে-সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে নিতে হবে। ভাগ্যের মধ্যে আছে ভজনা—অনুরাগপূর্ণ সেবা। অনুরাগের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু সেবা নিয়ে চললে ভাগ্য খুলে যায়। চাকরি না হ'লে বাঁচব না। এমনতর ধারণা মানুষকে আবদ্ধ ক'রে রাখে। চিন্তা ক'রে দেখা লাগে, আমি কী পারি এবং সেই পথেই মানুষের সেবার জন্য চেষ্টা করা লাগে। সক্রিয় সেবাবুদ্ধি প্রবল হ'লে আর ভাবনা নেই।

প্রফুল্ল—মানুষ যে-কোন বড় কাজই করতে যাক না কেন, তার জন্য মানুষ অর্জ্জন করার ক্ষমতা তো একান্ত প্রয়োজন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো ঠিকই। আর, যে যত ইষ্টার্থে লোকস্বার্থী হয়, তার তত মানুষ অর্জ্জন করার ক্ষমতা গজায়।

৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৪ (১৭।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। কুষ্ঠিয়া থেকে ননীদা

(সরকার) ও তোয়েব হোসেন নামক একটি ভাই এসেছেন। উভয়ে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও'দের পেয়ে খুশীমনে পাকিস্তানের খবরাখবর শুনলেন। পরে সস্নেহে ননীদাকে বললেন—তুমি তো পুরোণ মানুষ আছ, দেখো ওর (তোয়েব হোসেন) যেন কোন কষ্ট না হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের ঈশ্বর দু'জন নন, একই। প্রেরিত সবাই সেই একই ঈশ্বরের, তাঁদের নীতির কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য স্থান, কাল, পাত্র-অনুযায়ী পরিবেশনের হয়তো রকমারি আছে। প্রেরিতের উপর ভালবাসার লক্ষণই হ'ল তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদের ভালবাসা। প্রেরিত ভালবাসেন পূর্ব্বতন প্রেরিতদের এবং তাঁদিগকে অনুসরণ করে যারা তাঁদের। যে যে-সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি-মাত্রই ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিতগণের অনুমোদিত পথে চলে। তাই তাদের মধ্যে মিল হ'য়েই আছে। হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হ'লে, মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হ'লে তারা inter-interested (পরস্পর অন্তরাসী) হবেই।

তোয়েব হোসেন—কলকাতার দাঙ্গায় আমার কত ক্ষতি হ'ল, কিন্তু আমি আমার পাড়ার একজন হিন্দুরও ক্ষতি হ'তে দিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লাসের সঙ্গে)—খুব ভাল করেছ। মানুষকে বাঁচালে, মানুষকে রক্ষা করলে খোদাতালা তুষ্ট হন। ত'ার দয়া তোমাকে অযুত হস্তে রক্ষা করবে। মানুষ ভুল ক'রে টাকা উপায় করবার যায়। মানুষের উপায় করা উচিত মানুষ। আর, এই মানুষ কেনা যায় নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সেবায়।

হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের প্রতিকার-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দু মুসলমানের নামে নাক সিটকায়, মুসলমান হিন্দুর নামে নাক সিটকায়—তার মানে তারা ভগবানকে, ধর্ম্মকে, প্রেরিতকে ভালবাসে না। আর্য্যরা মানে এক অদ্বিতীয়কে, পূর্ব্বতন ঋষি মহাপুরুষদিগকে, তারা মানে পূর্ব্বপুরুষকে ও জন্মগত বিশিষ্ট গুণসম্পদকে অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম'কে, সর্ব্বোপরি তারা মানে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে। এগুলি মালার মত গাঁথা আছে। যাদের দেখার চোখ আছে ও দেখতে চায় তারাই দেখতে পায়। বেদ, কোরাণ, বাইবেল ঘে'টে দেখ, সব জায়গায় ঐ একই জিনিষ রকমারিভাবে পাবে। অন্ততঃ ওগুলির উল্টো কথা পাবে না। কোরাণে স্পষ্ট ক'রে আছে পিতৃপুরুষকে স্বীকার করার কথা। আমি ইসলামের ভক্ত হ'লে আমার নাম গোলাম সোফান হবে কেন ? অনুকূল চক্রবর্ত্তীই তো থাকা উচিত। কারণ, খোদাতালা যেমন,

সকলের, রসুল যেমন সকলের, ইসলামও তেমনি সকলের। মুসলমানদের মধ্যেও বংশগত আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা দিয়ে চলার কথা আছে। ওর ভিতর দিয়েই তো বর্ণধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে সমর্থন পাওয়া যায়। আজ আমরা বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করতে চাই কেন? রসুলের কি তেমন কোন কথা আছে? আর, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে যদি বজায় রাখতে চাই, তবে অপরের বৈশিষ্ট্য যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা লাগে। অপরের বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে, কালে-কালে নিজের বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গার পথই প্রশস্ত হয়।

আমি বলি, আমি যদি হজরতকে ভালবাসি এবং তাঁর নীতিবিধি মেনে চলি, তবে আমি হিন্দু থাকব না কেন? পরমপিতার পথে চলতে গিয়ে পিতৃপুরুষের পরিচয় খোয়াতে হবে কেন? আমি তো বুঝি হিন্দুও আর্য্য, মুসলমানও আর্য্য। উভয়েরই পন্থা ও গন্তব্য এক। হজরত পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানেন, পরবর্ত্তীকে মানার ইঙ্গিতও তিনি দিয়ে গেছেন, তিনি যা' মানেন, আমরা যদি তা' না মানি, তার মানে আমরা তাঁকে মানি না। মুসলমানের পীরের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া লাগে, হিন্দুরও গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া লাগে, সেই একই তো কথা। শুধু ভাষা আলাদা। কতকগুলি নীতি আছে দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা সবার পালনীয়, আবার কতকগুলি আছে বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ও দেশকালে পালনীয়। এই দু'টোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলতে নেই। Fundamental (মৌলিক) ও universal (সার্ব্বজনীন) জিনিষ হ'ল—এক অদ্বিতীয়কে মানা, পূর্ব্বতন ঋষি-মহাপুরুষকে মানা, পিতৃপুরুষকে মানা, বৈশিষ্ট্য মানা, পূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে অনুসরণ ক'রে চলা। তুমি হিন্দুই হও বা মুসলমানই হও, এগুলি যদি না মান, তুমি হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, এক-কথায়, তুমি ম্লেচ্ছদলভুক্ত, ম্লেচ্ছ মানে সংস্কৃতির উল্টো চলে যারা। আর, যে এইগুলিকে মেনে চলে, সে যে-সম্প্রদায়েরই লোক হোক না কেন, তাকে তুমি কখনও কাফের বলতে পার না। কাফের মানে যে ধর্ম্মবিরোধী চলায় চলে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রশ্রয় না দিয়ে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ চলনের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা করা লাগে। তা'ই করা লাগে যাতে প্রতিপ্রত্যেকে ঈশ্বরপ্রেমী হ'য়ে ওঠে, ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এ দায় হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মিলিত দায়। তাই এই কাজে হিন্দুর মুসলমানকে সাহায্য করা উচিত, মুসলমানেরও হিন্দুকে সাহায্য করা উচিত। আমি বুঝি সৎসঙ্গ যেমন হিন্দুর, তেমনি মুসলমানের, তেমনি বৌদ্ধের, তেমনি খ্রীষ্টানের, তেমনি অন্যান্য সকলের। সব মানুষই পরমপিতার, তা' তারা জানুক বা না-জানুক, মানুক বা না-মানুক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণমাতান কথাগুলি শুনতে-শুনতে সকলেরই মন এক নূতন প্রত্যয় ও প্রেরণায় ভরপুর হ'য়ে উঠলো।

ননীদা বললেন—আমাদের ইসলামের বিষয় আলোচনা করতেই বাধা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—ধর্ম্মের কথা বলার অধিকার সকলেরই আছে। ধর্ম্ম থেকে কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। যদি কেউ দীক্ষা নিতে চায়—তা' যে-বুদ্ধি নিয়েই হোক না কেন,—তাকে দীক্ষা দিতে হবে। ধর্ম্ম এসেছে ধৃ-ধাতু থেকে, ধৃ-ধাতু মানে ধারণ। যা' সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে ধারণ করে তাই ধর্ম্ম। বাঁচার অধিকারের মত ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মসঞ্চারণার অধিকার মানুষের অচ্ছেদ্য।

তোয়েব হোসেন—মুসলমানরা বলেন, হজরত শেষ নবী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কালে তিনি তো শেষতম নবী। যে-কালে যিনি আসেন, তখনকার মত তিনি তো শেষতম ও চরম। তাঁর মধ্যে যেমন পূর্ব্বতনরা থাকেন, তাঁর পরবর্ত্তী আবির্ভাবের মধ্যেও আবার তিনিই থাকেন। পরবর্ত্তী আসলে পূর্ব্বতনরা মুছে যান না; বরং তাঁরা জীয়ন্ত মূর্ত্তিতে একদেহে সংহত হ'য়ে থাকেন তাঁর ভিতর। নবীন প্রাচীনেরই নবকলেবর। যেন একেরই দেহান্তর গ্রহণ। "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" বর্ত্তমান প্রেরিতপুরুষের মধ্যে পূর্ব্বতনরা তো থাকেনই, আরো থাকে যুগোপযোগী বিবর্ত্তন ও পরিপূরণ। যীশু বলেছেন, "I am come to fulfil and not to destroy" (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)। তাই, বর্ত্তমানের গুরুত্ব এত বেশী, কারণ তিনি পূর্ব্বতনদেরই আরোতর পরিণতি। তা'ছাড়া, আতস পাথরের মধ্য-দিয়ে যেমন সূর্য্যের রশ্মি converge ক'রে (কেন্দ্রীভূত হ'য়ে) আগুন জ্বলে, বর্ত্তমানের মধ্য-দিয়ে তেমনি পূর্ব্বতনরা জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন আমাদের কাছে। বর্ত্তমান ইমামের মধ্য-দিয়েই রসুলকে বোঝা যায়। রসুলগতপ্রাণ মানুষের ভিতর-দিয়ে ছাড়া রসুলকে বুঝি কী ক'রে? যে ভগবানকে কায়মনোবাক্যে বরণ ক'রে, ভগবান তাকে তাঁর ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রস্বরূপ মনোনয়ন করেন, তাকে আশ্রয় ক'রে ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়। ভগবান মানে materialised man (মূর্ত্ত মানুষ), ষড়ৈশ্বর্য্যবান পুরুষ। তিনি যাঁর কথা বলেন, তাঁকে ব্রহ্ম, আল্লা, আত্মা ইত্যাদি বলতে পারি। দয়াবানকে বাদ দিয়ে দয়া উপলব্ধি করার জো নেই। ক্রোধী ছাড়া ক্রোধের প্রকাশ পাওয়া কঠিন। রসুলকে বাদ দিয়ে আল্লা মিলবে না। তবে আমার কথা এই যে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"। তাই, ব্রহ্ম বা আল্লাকে যিনি

পেয়েছেন, জেনেছেন, এমন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর শরণাগত হ'তে পারলে আর ভাবনা নেই। তিনি প্রত্যেককেই তাঁর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চালনা করেন। তাই তাঁকে পেলে চলার পথ সহজ হ'য়ে যায়। আর, অমনতর মানুষের আশ্রয় পেলে বুক ফুলিয়ে দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা ঘোষণা করাই লাগে।

একটি দাদা বললেন—মুসলমানদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কালী ভগবান, সরস্বতী ভগবান এত দেবতা ভগবান—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতা মানে দীপ্তিমান সত্তা। সেবা, শক্তি ও প্রেরণাসঞ্চারের ভিতর-দিয়ে যিনি মানুষের অস্তিত্বকে সমুন্নত ক'রে তুলে তার অন্তরের শ্রদ্ধার আসনে স্থির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পান তাঁকে মানুষ দেবতা আখ্যায়আখ্যায়িত করে। দেবকল্প মানুষকে যেমন মানুষ দেবতার মত শ্রদ্ধা করে,বিশেষ-বিশেষ ভাব ও শক্তির প্রতীক-কেও মানুষ তেমনি দেবদেবী হিসাবে ভক্তি করে। তদ্ভাবসিদ্ধ সাধকের উপলব্ধিতে তাঁরা ধরা দেন। আর, প্রত্যেক দেবদেবীর মধ্যেই ভগবত্তার attribute (গুণ) রকম-রকমে উপলব্ধি করা যায়। তাই, মানুষ তাঁদের ভগবান বলতে দ্বিধা করে না। এর মানে এই নয় যে ভগবত্তা বলতে যা'-যা' বুঝায় তার সবখানি প্রতিটি দেবকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান। তাই, আত্মা বা ব্রহ্ম বলতে যা' বুঝায় দেবতা তা' ননকো। আমি বুঝি, ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরেই পক্ষপাতশূন্যভাবে বিদ্যমান, কারণ তিনিই প্রত্যেকের অস্তিত্ব। কিন্তু যে যত এগিয়ে যায় তাঁর দিকে, তাঁর glow (দীপ্তি) তত সেই মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে। আলো সবার প্রতিই সমান, কিন্তু যে আলোর দিকে যত এগিয়ে যায় সে তত আলোকবান হ'য়ে ওঠে। রসুল একজন আলোকবান পুরুষ, তাই মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। দেবতাদের বেলায়ও ঐ কথা। তাঁরাও ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত—প্রত্যেকে তাঁর মত ক'রে। আবার, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" (দেব-উপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন)। যার যেমন অভিরুচি, সে সেই পথেই চলে।

৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ১৮।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষের উপর শুভ্র শয্যায় প্রসন্নবদনে ব'সে আছেন। ননীদা (সরকার) ও তোয়েব হোসেনদাকে দেখে একটু মিষ্টি হেসে আদরে হাতছানি দিয়ে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। উভয়ে আনন্দে ডগমগ হ'য়ে কাছে এসে প্রণাম ক'রে মাটিতে বসলেন।

পাকিস্তানের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গরীব-দুঃখী, দীনমজুর, কৃষক, কারিগর ইত্যাদির দিন কেমন কাটছে সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন।

তোয়েবদা—গরীবের সুখসুবিধা যে বিশেষ কিছু হয়েছে তা' মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্য হঠাৎ কিছু করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় দেশের নগণ্যতম মানুষটি পর্য্যন্ত যাতে খুশী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে। আর, লোকের ভাল করতে গেলে তাদের পিছনে রাখালী করা লাগে। সে কাজের দায়িত্ব তোমার উপর।

ননীদা—মুসলমান-ভাইদের সঙ্গে এমনি মেলা-মেশা করা যায়, রসুলের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও করা যায়, কিন্তু শেষ নবীর কথা নিয়েই খটকা বেধে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কথায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সে-কথা তোলার দরকার কী? নবী না আসুন, ইমাম তো আসতে পারেন। নবীকে পরিবেষণ করেন যিনি, তিনিই ইমাম। নবীকে ভালবাসা, মানা ও পরিবেষণ করা মানে সব মহা-পুরুষকে ভালবাসা, মানা ও পরিবেষণ করা। একজনকে ভালবাসি, আর-এক-জনকে ভালবাসি না, এ হয় না। আমার এত ভাল লাগে রসুলকে, তাঁর প্রত্যেকটা footstep (পদক্ষেপ)-ই পরম সুন্দর। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের কথা তাঁর চরিত্র ও জীবন দিয়ে এমনভাবে পরিবেষণ ক'রে গেছেন, fulfil (পরিপূরণ) ক'রে গেছেন যে তা' দেখে মনে হয় যে তিনি নিজে যেন তাঁর fore-runner (পূর্ব্ববর্ত্তী)-দের একজন concentrating agent (কেন্দ্রায়নী কর্ম্মাধ্যক্ষ)। আমরা follow (অনুসরণ) করব তাঁকে যিনি পূর্ব্বতনের সঙ্গে সঙ্গতিসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে তাঁদের fulfil (পরিপূরণ) ক'রে চলেন। তা' বাদ দিয়ে যদি glowing truth (দীপ্ত সত্য) ব'লেও কেউ কিছু জাহির করেন, তা' জানতে পারি কিন্তু তা' follow (অনুসরণ) করতে পারি না। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' Evolution (বিবর্ত্তন)-এর মধ্যে একটা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক আছে, ধারাবাহিকতা আছে, পারম্পর্য্য আছে। নবীনের মধ্যে যতই নূতনত্ব থাক না কেন, তার বীজ নিহিত থাকে প্রাচীনে। মোটকথা, fundamental truth (মৌলিক সত্য) নিয়ে deal (কারবার) করলে পূর্ব্বতনের সঙ্গে বিরোধ থাকতে পারে না। Fundamental (মূলতত্ত্ব) বাদ দিয়ে মন-গড়া অবান্তর উপপথে চললে conflict (দ্বন্দ্ব) অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। একটা কথা আমার কাছে স্বতঃ-সিদ্ধের মত মনে হয়। সেটা হ'চ্ছে forefather (পূর্ব্বপুরুষ)-কে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) ক'রে blood (রক্ত)-কে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) ক'রে, কোন prophet

(প্রেরিত)-কে ভালবাসতে গেলে সেই prophet (প্রেরিত)-কেই betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করা হয়। তাই, আমি proper initiation-এ (বিহিত দীক্ষায়) বিশ্বাস করি, কিন্তু conversion (ধর্ম্মান্তরগ্রহণ বা ধর্ম্মান্তরকরণ)-এর তাৎপর্য্য কী তা' বুঝতে পারি না। আমার ধারণা, একজন খাঁটি হিন্দু, একজন খাঁটি মুসলমান ও একজন খাঁটি খ্রীষ্টানের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তরের মিল না থেকে পারে না। কারণ, এরা সবাই যে এক পথের পথিক। পরমপিতাকে মানুষ যে-নামেই ডাকুক, যে-রূপেই ভজুক, পরমপিতাকে ভজনা করার একটা প্রভাব আছে। তাঁর দিকে এগুতে থাকলে মানুষ প্রেমী হ'য়ে ওঠে, জ্ঞানী হ'য়ে ওঠে, সবার প্রতি দরদী সেবামুখর হ'য়ে ওঠে, সবাইকে স'য়ে-ব'য়ে আপন ক'রে নিতে শেখে। চরিত্রই ব'লে দেয় কে ধর্ম্মপথে চলছে বা চলছে না। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে পথে-পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, অথচ যদি দেখ সে রসুলকে মানে না, যীশুখ্রীষ্টকে মানে না, তা হ'লে তখনই ধ'রে নেবে —He is not properly adjusted, he is not fit to be followed because he does not love all the prophets with a single eye and so he is a man of incomplete knowledge. (সে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়, সে অনুসৃত হবার যোগ্য নয়, কারণ, সে সব প্রেরিতকে একদৃষ্টিতে ভালবাসে না। আর, তাই সে অসম্পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ)। যার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি, তাকে অনুসরণ করায় বিপদ আছে।

তোয়েবদা—প্রেরিতের পথে চলতে-চলতে মানুষ সে-পথ থেকে স'রে যায় কেন? ধর্ম্মের মধ্যে বিকৃতি আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরিতের পথে চলা মানে তাঁকে ভালবেসে নিরন্তর চেষ্টায় স্ব-স্ব প্রকৃতি-অনুযায়ী তাঁর চলন-চরিত্র imbibe (আত্মীকৃত) করা, inherit (উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ) করা। এইটেকে মুখ্য না ক'রে আমরা বৃত্তিস্বার্থী হ'য়ে যখন নামকাওয়াস্তে তাঁর পথে চলি, তখনই গোলমাল সুরু হয়। সাধারণ মানুষ যেমন-তেমন, ধর্ম্মসঞ্চারক যারা, ধর্ম্মরক্ষক যারা, তারা যদি ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠার অছিলায় আত্মস্বার্থ-আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশায় পাগল হ'য়ে ওঠে এবং তারই রসদ সংগ্রহের জন্য অজান মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে, তাহ'লে সেইটেই হ'য়ে ওঠে সর্ব্বনাশা। তাই fundamentals (মূলতত্ত্ব)-সম্বন্ধে জনসাধারণকে এমনভাবে educate (শিক্ষিত) করা লাগে, যাতে তাদের ভুল বোঝান সম্ভব না হয়। অবশ্য, ধর্ম্মটা শুধু বুঝের ব্যাপার নয়, আচরণের ব্যাপার। প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণে অনেক সময় বুঝমান মানুষও

কুৎসিত পথে চলে। এমনতর চলন যখন বেশীর ভাগ মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে, তাকেই কয় ধর্ম্মগ্লানি, আর তখনই পরমপিতা তাঁর দূত পাঠান—মানুষকে তার চলার পথ ধরিয়ে দিতে।

মনোরঞ্জনদা (ব্যানার্জী)—খ্রীষ্টানদের মধ্যে কি শব্দ-সাধনা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! শুনেছি বাইবেলে আছে—"In the beginning was the word and the word was with God and the word was God" (আদিতে বাক্ ছিল, বাক্ ছিল ঈশ্বরে এবং বাক্ই ঈশ্বর)। তাই ঈশ্বর-আরাধনা করতে গেলে আদিবাক্ বা নাম বা বীজমন্ত্রের কথা এসেই পড়ে। তাই আছে 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। আবার, নাম ও নামী অভিন্ন। তাই শুধু নাম করলে হয় না, নামের যিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই নামী পুরুষের প্রতি অকাট্য অনুরাগ-সমন্বিত নিবিষ্ট ধ্যানও চাই সঙ্গে-সঙ্গে। তিনিই ধ্যেয়, তিনিই অনুসরণীয়, তিনিই গতি, তিনিই গন্তব্য। তাঁকেই প্রথম ও প্রধান ক'রে চলতে হয় এবং তাঁর তুষ্টি, পুষ্টি, সেবা, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করতে হয়। শব্দ-সাধনা মানে এতখানি। শব্দ-সাধনা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবার মধ্যেই আছে। এটা universal (সার্ব্বজনীন)। মুসলমানরা বলে আওয়াজের কথা। কেষ্ট ঠাকুরের হাতে বাঁশী, বাঁশী নাকি বলে 'রাধা রাধা'। গান আছে —'রাধা নামে সাধা বাঁশী'। তার মানে He is the representative of universal বাক্ (তিনি সার্ব্বজনীন বাক্-এর প্রতিনিধি)। ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে যেই-ই নিয়মিতভাবে নাম-সাধন করে, সেই-ই এগুলি উপলব্ধি করে। এ পথ সবার জন্য খোলা। শুধু শুনলে হয় না, প্রাণমন ডুবিয়ে দিয়ে একরোখা হ'য়ে লেগে থাকতে হয়। যখন নেশা জমে ওঠে, তখন আর পায় কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবেগ-সমন্বিত কথাগুলি শুনতে-শুনতে উপস্থিত প্রত্যেকের মনে যেন একটা গভীর সাধনশীলতার তীব্র আগ্রহ সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। একটা অন্তর্ম্মুখীনতার ঝোঁক তখনকার মত সকলকে যেন পেয়ে বসল। সকলের চোখ-মুখের চেহারা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি থেকে তা' স্পষ্টই মালুম হচ্ছিল। একটু পরে ধীরে-ধীরে সকলে গাত্রোত্থান করলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে তক্তপোষে উপবিষ্ট। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীযুত এন. সি. চট্টোপাধ্যায়, শচীনদা (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গ তুললেন—সুশীলবাবুর কাছে সেদিন শুনছিলাম

ভৃগু ও জাতিস্মরের কথা। কেমন ক'রে হয় তাই ভাবি—brain-ট্রেন (মস্তিস্কাদি) সবই তো মৃত্যুর সঙ্গে চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ectoplasmic being (লিঙ্গ শরীর) impression (ছাপ)-গুলি ধ'রে রাখে। লিঙ্গ শরীর এতই সূক্ষ্ম জিনিস যে স্থূল দেহের মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই পরজন্মেও ঐ স্মৃতি অব্যাহত থাকে।

কেষ্টদা—যৌগিক সাধন করলে বোধহয় ঐ স্মৃতির জাগরণের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উষানিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।

এই এতটুকু যদি অভ্যাসের মধ্যে আসে, তাতেই অনেকখানি হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কিছুই বিশ্বমনের অগোচর নয়। ইষ্টের সঙ্গে যার চলা, বলা, ভাবার tuning (সমতানতা) হয়, তার মনের উপর বিশ্বমনের আলো অল্পবিস্তর প্রতি-ফলিত হয়। আর, সেই আলোর ঝলকে সে অনেক-কিছু দেখতে পায়। তা'ছাড়া, পশ্চাদপসারিণী চিন্তা করতে-করতে পূর্ব্বের অনেক জিনিস প্রতিভাত হয়।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আমি যখন বিলেত যাই, স্যার আশুতোষকে প্রণাম ক'রে যাবার সময় তিনি বললেন—তোমাকে আমার নাম রাখতে হবে, তোমাকে ফার্ষ্ট হ'তে হবে। আমারও বিশ্বাস ছিল ফার্ষ্ট হবই। আমি পরীক্ষার সময় অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে একটা paper (পত্র) subconscious state-এ (অবচেতন অবস্থায়) লিখেও full marks (পুরো নম্বর) পেয়েছিলাম। Result (ফল) বেরোবার বহু পূর্ব্বেই আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—পত্রিকায় কোন্ পাতায় কোন্ জায়গায় আমার নাম বেরিয়েছে। বাস্তবেও তাই হ'ল। অবশ্য এটা জাতিস্মরের সঙ্গে জড়িত নয়। হয়তো এমন বহু ব্যাপার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তি থাকে, বৃত্তিরই শরীর। প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এরই ectoplasmic state (সূক্ষ্ম অবস্থা) আছে। মৃত্যুর পরও সেই ectoplasmic cell (সূক্ষ্ম কোষ)-গুলি intact (অক্ষত) থাকে। তাকে বলে চিন্ময় দেহ, ভাবদেহ। তার মধ্যেও complex (বৃত্তি)-গুলি থাকে, আর সেই অনুপাতিক হয় পরজন্ম। মৃত্যুর সময় প্রথমে গভীর আঁধার আসে, তারপর dazzling light (চোখ-ধাঁধান আলো) আসে, তারপর প্রচণ্ড ঢং-ঢং শব্দ হয়। ওই শব্দের চোটে

সব-কিছু disconnected (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে যায়। ওখানে যে stand (সহ্য) করতে পারে, তার continuity of consciousness (চেতনার ক্রমাগতি) ঠিক থাকে। নচেৎ কেটে যায়। ইষ্টের উপর গভীর টান থাকলেই, তখন consciousness (চেতনা) retain করতে (বজায় রাখতে) পারে। আমাদের জীবদ্দশায়ও আমরা দেখতে পাই, ইষ্টের উপর অত্যন্ত নেশা থাকলেই রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান, আশাভঙ্গ, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকের দুরন্ত সংঘাত ও প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনার সম্মুখীন হ'য়েও ইষ্টচেতনার জোরে আমরা অনেকখানি আত্মস্থ ও অবিচলিত থাকতে পারি। নইলে, আমাদের বিবেকবুদ্ধি, চেতনা ও নীতিবোধ কোথায় যেন ভেসে চ'লে যায়। তাই, আমার মনে হয়, বাস্তবজীবনে পছন্দবিরুদ্ধ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েও যে যতখানি সাম্য-ভাব বজায় রেখে চলতে পারে, তার ইষ্টনিষ্ঠাও ততখানি দৃঢ়মূল হয় এবং পরবর্ত্তী জন্মে স্মৃতিবাহী চেতনালাভের সম্ভাবনাও তার তত বেশী থাকে। শরীর নিয়ে অমরত্ব আর স্মৃতিবাহী চেতনার ভিতর-দিয়ে অমরত্ব, এই দুইভাবে অমরত্ব লাভ সম্ভব হ'তে পারে। স্মৃতিবাহী চেতনালাভ খুব কঠিন ব্যাপার ব'লে মনে হয় না। এর প্রথম ধাপ হ'ল ইষ্টস্মৃতিকে ছেদহীন ক'রে তোলা।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমাত্মা হ'ল সেই জিনিস যার উপর যাবতীয় জীবাত্মা দাঁড়িয়ে থাকে। পরমাত্মা যেন সমুদ্র আর জীবাত্মাগুলি যেন তার রকমারি তরঙ্গ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ। জীবাত্মা মানে being with complexes (প্রবৃত্তি-সমন্বিত সত্তা)। পরমাত্মার মধ্যে কোন বিকার নেই। মানুষ যখন প্রবৃত্তিগুলির সত্তা-পোষণী বিনিয়োগে সিদ্ধ হয়, প্রবৃত্তিগুলি যখন তাকে বিকার-বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, তখন তার জীবনগতি পরম স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। এমনতর চলনের ভিতর-দিয়েই হয় পরমাত্মার উপলব্ধি।

কেষ্টদা—গীতায় আছে—

'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।'

এ কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তম সাধারণ মানুষের মতই জরাব্যাধি ও মরণশীল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর অব্যয়, অক্ষয় স্বরূপের স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হন না। তাই তিনি ক্ষর অর্থাৎ নাশশীল হ'য়েও তার অতীত। আবার, অক্ষর পুরুষের যে অব্যক্ত অবস্থা, তার থেকে অক্ষরত্বের বাস্তব চেতনবিগ্রহরূপী পুরুষোত্তমের ব্যক্ত-

সত্তা ঢের বেশী গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। ফলকথা, পুরুষোত্তমের আবির্ভাব যখন হয় তখন তাঁর মধ্যে যুগপৎ জীবের শ্রেয়-আকূতির চরম বিকাশ ও ঈশ্বরের ধারণ-পালনী সম্বেগের পরমপ্রকাশ একাধারে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুরুষোত্তম মানে the best fulfiller (সর্ব্বোত্তম পূরণকারী)।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়— স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, দেবত্বই মানুষের সত্তা।

কেষ্টদা—ত'ার realisation-এর (উপলব্ধির) উপর দাঁড়িয়ে তিনি এ-কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণদেবের মধ্য-দিয়েই তিনি realise (উপলব্ধি) করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের তুলনা মেলে না। অমন কথা আর কেউ বলতে পারেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আজকাল অনেকে অদ্বৈতের কথা বলে, বেদান্তের কথা বলে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন অদ্বৈত-মূর্ত্তি, তিনি ছিলেন বেদান্তকৃৎ। তাঁকে বাদ দিয়ে অদ্বৈত বা বেদান্ত ঠিক-ঠিক বোধের মধ্যে আসে ব'লে মনে হয় না। অনেক জিনিস mathematically (গাণিতিকভাবে) সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিলেত গিয়ে বিলেত দেখা ও map-এ (মানচিত্রে) বিলেত দেখা, এই দুইয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ আছে।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—দ্বৈত বাদ দিয়ে অদ্বৈতে পৌঁছান মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই-ই তো। আমি দিনকতক ও-রকম করেছিলাম। ওতে শুকিয়ে যায়, কড়া হ'য়ে যায়, peevish egoistic (খিটখিটে অহঙ্কারী) মতো হয়। এ-যেমন একদিক। আর একদিকে আছে দীনতার বাড়াবাড়ি। তাও ভাল নয়। আমি এক সময় বলতাম—'আমি পরমপিতার সন্তান, আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, পবিত্র, ত'ার শক্তিতে আমি শক্তিমান, দোষ-দুর্ব্বলতা-পাপ আমাকে স্পর্শও করতে পারে না।' প্রাণের আবেগে এই ধরণের অনেক কথাই বলতাম। একজন গ্র্যাজুয়েট বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন— 'ও-সব কথা ব'লো না, ওতে অহঙ্কার হয়। বরং কাতরভাবে ব'লো— হে ভগবান! আমি পাপী, তাপী, অভাজন, মোরে কেশে ধ'রে কর হে উদ্ধার।' তার কথামত আমি রোজ তাই করতে লাগলাম। দিন-দিন কেমন যেন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লাম। মনে স্ফূর্ত্তি পাই না, আনন্দ পাই না। নিজেকে বড় ছোট মনে হ'ত। নিজের উপরই নিজের সন্দেহ হ'ত। কা'রও ঘরে ঢুকতে সাহস পাই না, কোন মেয়েছেলের মুখের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারি না। আমি যেন সঙ্কোচের পীড়নে কুঁচকে গেলাম। সে বড় দুঃসহ অবস্থা। একদিন বিকালে পদ্মার ধারে গেছি, তখন সূর্য্য ডোবে-ডোবে। আমি আকুলভাবে চিৎকার ক'রে

বললাম 'পরমপিতা ! আমি তোমার সন্তান, আমি পাপী নই, দুর্ব্বল নই। আমি জ্যোতির তনয়, আমি চিরপবিত্র।' এইভাবে তোড়ের সঙ্গে অনেক কথা বললাম। বলতে-বলতে আমার বুকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। প্রাণে বল পেলাম। তারপর থেকে আর কখনও ঐ সব দুর্ব্বলতাসূচক ভাব নিজের উপর আরোপ করিনি। ও যে কী সর্ব্বনাশা জিনিস তা' আমি ভালভাবে টের পেয়েছি। মন থেকে ঐ অবান্তর অবসাদ-উৎপাদক ভাবগুলি ঝেড়ে না ফেললে গিয়েছিলাম আর কি !

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বললেন—রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেও এই রকমের কথা পাওয়া যায়। Semitic religion (আরব, ইহুদি প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মমত)-গুলি original sin (আদিম পাপ)-এর উপর stress (গুরুত্ব) দিয়েছে। রামকৃষ্ণদেব সবটার একটা সামঞ্জস্য ক'রে গেছেন। তিনি বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন, যেমন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয় ইত্যাদি ! এ-গুলির তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের কতকগুলি সত্তাসঙ্গত চিন্তার ধারা থাকে, সেগুলি যত adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তত তার একটা central solution (কেন্দ্রিক সমাধান) হয়, সেই সব নিয়ে যেন এক-একটা স্তর। চালতে দেখেছেন তো ? এক-একটা খোসা এক-একটা স্তর। পেঁয়াজের মতো। খোসার পর খোসা। সবটা মিলে পেঁয়াজ। Matter (বস্তু) ও spirit (আত্মা) আলাদা নয়। যা' matter (বস্তু), তাই-ই spirit (আত্মা), যা' spirit (আত্মা), তাই-ই matter (বস্তু)।

কেষ্টদা—দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদ বড়, এ ভাব সমাজের মধ্যে আসলো কোথা থেকে ? অথচ দেখা যায়, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে কোন বাস্তব বোধই মানুষের গজায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা শঙ্করাচার্য্যের পরিবেষণের প্রভাব। তবে তাঁর দিক থেকে সব ঠিক আছে। তিনি সাধনার ব্যাপারে গুরুকরণ ও গুরুভক্তি বাদ দিতে বলেননি। শুনেছি তিনি বলেছেন 'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' এতেই বোঝা যায় গুরুনিষ্ঠার উপর তিনি কতখানি জোর দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ এ-সব কথার ধার ধারে না। তারা ভাবে অদ্বৈতবাদ মেনে চলতে গেলে কারও কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করার বালাই থাকবে না, সুতরাং আর চাই কি ? বেশীর ভাগ মানুষই নিজ-নিজ খেয়ালমত চলতে পারলেই খুশী। তাতে তাদের ভাল হবে কি মন্দ হবে, তার ধার ধারে না। এইভাবে নানা

প্রবৃত্তির নানান খেয়াল চরিতার্থ করতে যেয়ে মানুষ শুধু নিজের সর্ব্বনাশ করে না, সমাজেরও ক্ষতি করে অঢেল। যারা শক্তিধর মানুষ, তাদের ভাল করার ক্ষমতাও যেমন প্রবল, ক্ষতি করার ক্ষমতাও তেমনি প্রচুর। তাই, তারা যদি surrendered (আত্মনিবেদিত) চলনে না চলে, তবে পরিবেশের পক্ষে তা' বেজায় বিপদেরই কথা। আর, সমাধির কথা বলছিলেন, সমাধি মানে সম্যক্ ধারণ। সমাধির বিভিন্ন স্তর আছে। নির্ব্বিকল্প মানে—মন সৃষ্টি করে না কিছু তখন। বোধে বোধময় হ'য়ে থাকে। সত্তা যেন তার বিশাল উৎসের মধ্যে লীন ও একীভূত হ'য়ে অবস্থান করে। গুরুর উপর খুব টান চাই। নচেৎ ঐ অবস্থায় নিজেকে ধ'রে রাখা ও পরে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সক্রিয় জীবন যাপন করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। জীবের জীবনের মূল হ'ল লিবিডো বা সুরত। Sperm (শুক্র) ও ovum (ডিম্বাণু), positive (ঋজী) ও negative (রিচী), male (পুরুষ) ও female (নারী) উভয়ে affinity (আকর্ষণ)-বশে মিলিত হয়, তাদের ভিতর থাকে একটা cohesive urge (সংসক্তিমূলক আকূতি) এবং তার দরুনই উভয়ের মিলনের ফলে গজিয়ে ওঠে একটা zygote (বীজকোষ), সেইটেই cell-division (কোষ বিভাজন) হ'তে-হ'তে গ'ড়ে ওঠে শরীর। সমগ্র ব্যাপারটা সুরতের প্রেরণাতেই সংঘটিত হয়। তাই, মানুষ ভালবাসার জন্মগত সম্বেগ নিয়েই মা'র পেট থেকে পৃথিবীর মাটিতে পড়ে। এই ভালবাসার সম্বেগের দোলতেই মানুষ যা'-কিছু হয়, যা'-কিছু করে। এই সম্বেগের সার্থকতা আসে প্রেষ্ঠের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ভিতর-দিয়ে। সে নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে চায়, সাবাড় ক'রে দিতে চায় তাঁর জন্য। চরম জীবনীয় নেশা ব'লে যদি কিছু থাকে, তা' এই। সে নিজের ভাল বোঝে না, মন্দ বোঝে না, সুখ-দুঃখ বোঝে না, লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা করে না—তার প্রাণের একমাত্র চাওয়া হ'ল বাঞ্ছিতকে খুশী করা। কারণ, তাঁকেই সে তার অস্তিত্ব ক'রে নেয়। তাঁর সুখে তার সুখ, তাঁর দুঃখে তার দুঃখ, তাঁকে নিয়েই তার দুনিয়া। সর্ব্বদা চেষ্টা যাতে প্রিয়ের গায় একটা কাঁটার আঁচড়ও না লাগে। Beloved (প্রেষ্ঠ)-কে নিয়েই জীবনভোর যে এমন সক্রিয়ভাবে বিভোর হ'য়ে কাটিয়ে দিতে পারে, যার কাছে তাঁর স্বার্থ, তাঁর চাহিদা ও তাঁর চিন্তা ছাড়া নিজের আলাদা স্বার্থ, আলাদা চাহিদা বা আলাদা চিন্তা ব'লে কিছু না থাকে, নরকুলে তার মত সুখী মানুষ আর হয় না।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ ও উদ্দীপনায় পাগলপারা হ'য়ে উঠলেন। কেষ্টদার সুকৌশল প্রশ্ন আগুনে ঘৃতাহুতির মত কাজ করতে লাগল।

কেষ্টদা বললেন—আপনি যে ভালবাসার কথা বলছেন সে তো মানুষের উপর মানুষের ভালবাসা। এই-ই কি সব?

শ্রীশ্রীঠাকুর আসন গেড়ে ব'সে কোলবালিশটা পায়ের উপর রেখে তার উপর কনুই দুটিতে ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জোরের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ওর উপরই সব। তিনিই কীল। তাঁকে পাকড়েই জীবন। ভক্ত তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানে না। ব্যাপারটা ওই। মানুষ না হ'লে সত্তা সহ্য করতে পারে না। তাই দেখেন গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর কাতরকণ্ঠে বলছেন—হে প্রভু! আমি আর পারি না, আমার মন ভয়বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে আমার সামনে আপনার স্বাভাবিক সীমায়িত মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করুন। অর্জ্জুনের কিন্তু এখন বোধের মধ্যে এসেছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বমূর্ত্তি। উপযুক্ত সসীম মানুষকে ধ'রেই মানুষের কাছে অসীমের বাস্তব অনুভূতি ফুটে ওঠে। ঐ-ই পথ। নইলে হাওয়ার নাড়ুর মত ব্যাপার হয়। তার মধ্যে কোন সারবস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণদেবের কাছে পাথরের কালী ব'লে বলেন তো! তাতে তাঁর মনে ব্যথা লাগবে। কারণ, মা তাঁর কাছে পাষাণ-প্রতিমা নন, তিনি চিন্ময়ী, জীবন-সর্ব্বস্ব তাঁর। সেই মা-ই তাঁর চেতনার স্তম্ভ। তাই ভেবে দেখুন দ্বৈত-অদ্বৈত যে যাই বলুক—ঐ beloved (প্রেষ্ঠ)-কে দিয়েই। ঐ beloved (প্রেষ্ঠ)-কে নিয়েই যা'-কিছু সব।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আজকাল বেশীর ভাগ লোক ধর্ম্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি করার পক্ষপাতী। তাদের ধারণা—রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে তাই যা' বাঁচাবাড়াকে ধ'রে রাখে—ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে—সর্ব্বতোমুখী সম্বর্দ্ধনায়। ধর্ম্মের এলাকার মধ্যে পড়ে না—অথচ তা' জীবনীয়, এমন কোন বিষয় বা ব্যাপার দেখা যায় না। রাজনীতিরও লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। তাই তা' ধর্ম্মসম্মত হ'তে বাধ্য। ধর্ম্মবিরুদ্ধ যা'-কিছু তা' প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতিকূল। তাই, কোন ক্ষেত্রে আমরা ধর্ম্ম বাদ দিয়ে চলতে পারি না। ঈশ্বরপরায়ণতাই স্বস্তির পথ। যেমন ক'রেই হোক ঐ পথে চলা চাই। সকল সম্প্রদায়েরই ঐ এক লক্ষ্য। তাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যেকে যাতে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ধর্ম্মনিষ্ঠ চলনে চলে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। ওতে মানুষগুলি সংযত হয়, সেবাপরায়ণ হয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই সব গুণের বিকাশ না হ'লে সমাজ, রাষ্ট্র কিছুই টেকে না। বিশেষ ক'রে নেতা যাঁরা হবেন তাঁদের

চাই প্রকৃষ্টভাবে নীত হওয়া। নইলে, লোক-পরিচালনার অত বড় দায়িত্ব পালন করা কি সোজা কথা ? যে শ্রেয়কে মেনে চ'লে তাঁর অনুশাসন মাথা পেতে নিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেনি, তাকে মানতে যাবে কে ? তার বোধ-বিবেচনাই বা কতখানি uncoloured (অরঙ্গিল) ? এমনতর মানুষ যদি নেতা হয়, তাহ'লে সাবাড়ের পথই তো পরিষ্কার হবে। রামদাসের অনুগত থেকে শিবাজী যেভাবে রাজনীতি করেছে, রাজ্য পরিচালনা করেছে, তার কি তুলনা মেলে ? ধর্ম্মের উপর না দাঁড়ালে, গুরুর উপর না দাঁড়ালে জোর হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বললেন—শঙ্কর অধ্যাস বোঝাতেই সাত-আট পৃষ্ঠা নিয়েছেন। শঙ্করের মত ঠিক মায়াবাদ নয়, তাঁর মূল কথা অধ্যাস, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভ্রম এড়াতে গেলে সর্পও জানা চাই, রজ্জুও জানা চাই। জানা যত নিখুঁত হবে, ভুলও তত কমবে। মায়া মানে পরিমাপিত হওয়া বা পরিমাপিত করা। মা কই, তার মানে তিনি সন্তানকে measure ক'রে (মেপে) দেন। বাবা মানে যিনি সন্তানের বীজসত্তা বপন ক'রে দেন।

এরপর সবাই তখনকার মত বিদায় নিলেন।

খানিকটা পরে তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—জ্যোৎস্না-পক্ষ, তবে আকাশটা একটু মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কেষ্টদাকে ডেকে বলছেন—ও কেষ্টদা! ওই দেখেছেন উজ্জ্বল তারার উপর মেঘ ? ব্রাহ্মী মানুষকে অমনি দেখায়। ঐরকম উদ্ভাসিত।

কেষ্টদা একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন।

থেকে-থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তখন নিঃশব্দ, মধুর, মন-ভোলান হাসির ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। যেন এক অন্তহীন আনন্দের জীয়ন্ত প্রস্রবণ লীলায়িত ভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে।

৬ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫৪ (ইং ১৯।৩।১৯৪৮)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

Loyal unicentric love-leaning
in thoughts and deeds
acts like opsonin
that leads one to fulfil

the principle of life
in accordance with the wishes
of Beloved the Great.

(বাক্ ও কর্ম্মে আনুগত্যপূর্ণ এককেন্দ্রিক প্রীতি-পরায়ণতা এমন একটি অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে, যা' মানুষকে প্রিয়পরমের ইচ্ছা-অনুযায়ী জীবননীতি অনুসরণে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে।) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে opsonin (অপ্সনিন্) কথাটির মানে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—Opsonin (অপ্সনিন্) হ'ল blood-এর (রক্তের) সেই relishing agent (আস্বাদনকারী শক্তি) যার দরুন phagocyte (ফ্যাগোসাইট)-গুলি bacteria (রোগজীবাণু)-গুলিকে খেয়ে ফেলার জন্য লোলুপ হ'য়ে ওঠে। ভক্তি থাকলেও তাই ইষ্টকাজে যত বাধাবিঘ্ন ও কষ্টই আসুক না কেন, সেগুলি অতিক্রম করার প্রেরণা জাগে, তাতে ইষ্টার্থপূরণী সব ক্লেশই সুখকর মনে হয়, আনন্দদায়ক মনে হয়, উপভোগ্য মনে হয়, কষ্টের বা strain-এর (কঠোর প্রচেষ্টার) বোধ থাকে না। কিন্তু জ্ঞানমার্গে ঐ strain-এর (ক্লেশের) sensation (বোধ) থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ, শুষ্ক জ্ঞানবিচার মানুষের মনে রসের যোগান দিতে পারে কমই। অবশ্য, ভক্তি থাকলে সব সময় একটা anxiety (উদ্বেগ) লেগে থাকে, যাতে প্রিয়র কোন ব্যথা না লাগে, বিপদ না হয়, কষ্ট না হয়। ঐ উদ্বেগ থেকে কিন্তু সে রেহাই পেতে চায় না।

একটি মা কাতরকণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—বাবা! আমি বড় গরীব, আমার উপর একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, যাতে আমি একটু শান্তি পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করলেন—ভাবিস নে মা! পরমপিতার নাম করিস, কাম করিস, কারও অশান্তির কারণ হ'স না, বরং যতটুকু পারিস মানুষকে সুখ-শান্তি দিস। তাতে নিজেও শান্তি পাবি।

আর-একটা বাণী বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ধূর্জ্জটিদাকে (নিয়োগী) বললেন—মানুষের ভিতর inferiority (হীনমন্যতা) ও ingratitude (অকৃতজ্ঞতা) থাকলে কারও কাছ থেকে কিছু নিয়ে বা পেয়ে তা' লোকের সামনে প্রাণ খুলে স্বীকার করতে পারে না। ধর, আমি হয়তো তোমার কাছ থেকে মাঝে-মাঝে কিছু নিই, কিন্তু লোকের কাছে তা' প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করি। ভাবি—তাতে আমি ছোট হ'য়ে যাব। হয়তো বললাম—'নেই না বিশেষ কিছু, এক-আধ সময় ঠেকেঠুকে গেলে ক্বচিৎকদাচ কিছু দেয়'—অর্থাৎ, একেবারে অস্বীকারও করছি না, আবার প্রাণ খুলেও বলতে পারছি না।—এই বা কেমন?

আর, যদি আমি তোমার কাছ থেকে একটা লঙ্কাও পেয়ে থাকি, আর সেই কথা যদি উচ্ছ্বসিতভাবে মানুষের কাছে বলি—'ধূর্জ্জটি আমাকে ছাতু খাওয়ার সময় লঙ্কাটা দিয়েছিল। সেই লঙ্কাটা ড'লে কেমন relish (স্বাদ) ক'রেই না ছাতুটা খেলাম !' তাহ'লে তাতে কিরকম আনন্দ হয় উভয়ের ? গ্রহীতা যে তার মধ্যে যদি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, তবে তার ফলে দাতা-গ্রহীতা উভয়েরই প্রাণের প্রসার হয়, ability (যোগ্যতা) বেড়ে যায়। আবার, দাতা যে তারও এমনতর দম্ভ থাকা ভাল নয়, যাতে গ্রহীতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ঐরকম দেখলে কৃতজ্ঞতাবোধ স্তব্ধ হ'য়ে যেতে চায়। অবশ্য, যদিও তা' সমীচীন নয়।

ঐ প্রসঙ্গে পরে আবার বললেন—কত রকমারি ধাঁজ যে আছে, তার কি ঠিক আছে ? তুমি হয়তো বলছ—ঠাকুরের কাছ থেকে কিছুই নিই না, অথচ পাকে-পাকে তোমার লাগে। নেও না—লোকের সামনে সেইটে দেখাতে যা' করা লাগে, তা' বজায় রেখে অনেক রকম কায়দা-করণ ক'রে undesirable way-তে (অবাঞ্ছিতভাবে) নেও, এতে তোমার সব sobriety-র (গাম্ভীর্য্যের) show (লোক-দেখান ভাব) সত্ত্বেও ওর মধ্য-দিয়েই অধোগামী হ'তে থাকবে।

শচীনদা (গাঙ্গুলী)—মানুষের আকাঙ্ক্ষা না থাকা সত্ত্বেও যদি দীক্ষা দেওয়া হয়, তাতে কি কোন কাজ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের একটা কথা আছে—পিত্তাধিক্য হ'লে নাকি মিশ্রী খেতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু মিশ্রী খেতে-খেতে নাকি আবার মিশ্রীর রুচি হয়। এটা রামকৃষ্ণ ঠাকুরেরই কথা।

৭ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ২০।৩।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল ইংরাজীতে একটি বাণী দিয়েছেন, ঐ ভাব অবলম্বনে বাংলায় একটি বাণী দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান হ'ল।

তাতে তিনি বললেন—আমি যে বলি, বলার উপর আমার কোন control (দখল) নেই, আস্‌লে বলতে পারি, ইচ্ছা ক'রে পারি না। তাই ভৃগুতে আছে মহাপণ্ডিত আবার মহামূর্খ।

কেষ্টদা—আপনার এতখানি control (অধিকার) আছে যে মনে হয় control (অধিকার) নেই।

পূজনীয় বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—শরীর ভাল তো?

বড়দা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

একটু বাদে বড়দা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওদের সবারই মা'র উপর খুব নেশা।

ইতিমধ্যে শচীনদা (গাঙ্গুলী) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে এসে উপবেশন করলেন। উপস্থিত সকলে গাড়ু, গামছা, গড়গড়া, তামাক, টিকে ইত্যাদি নিয়ে পিছনে-পিছনে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে পূর্ব্ব-প্রার্থিতমত বাণীটি বললেন—

ভণ্ড সৌজন্যে দয়ার অবদান অস্বীকার করাই
সৌজন্যপূর্ণ অকৃতজ্ঞতা,
আর, তা' সৌজন্যের সহিতই
অধঃপাতে নিয়ে যায়,
কিন্তু উচ্ছলমুখর কৃতজ্ঞতা
মানুষকে উচ্ছলই ক'রে তোলে।

বাণীটি বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে?

সকলে একবাক্যে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! ইংরেজী বাণীটির মতই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের রকম আছে একটু উপকার পেলে দশমুখে কয়। শুধু ক'য়ে ক্ষান্ত হয় না, এৎফাঁক খোঁজে কী ক'রে করবে। এ বড় রাজলক্ষণ। শচীনদার habit (অভ্যাস) আছে—একটা পেঁপে যদি খাওয়াই, ৩০ জনের কাছে ক'ন। অনেকে আবার নিজেদের inferiority-র (হীনমন্যতার) nurture (পোষণ) দেয়, তাদের behaviour (ব্যবহার)-ও তদনুপাতিক হয়। তারা কাউকে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করতে পারে না, ভাবে তাতে বুঝি নিজেরা খাটো হ'য়ে যাবে। এর ফলে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ভাব, ভালবাসা বা প্রশংসার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি দিতে ইচ্ছা করলেও, তারা তা' ঠিকমত পেরে ওঠে না। তাই, মানুষকেও আপন করতে পারে কমই। বদভ্যাস পুষে রাখলে তা' অমন ক'রেই আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে। অনেক মেয়েরা ছাওয়াল-পাওয়াল ও চাকর-বাকরদের সঙ্গে খিটমিট করতে-করতে অভ্যাস এমন খারাপ ক'রে ফেলে যে পরে স্বামীর সঙ্গেও ভালমুখে কথা বলতে পারে না।

শরৎদা—অনেক ঋত্বিক্ বলেন, 'যজমানের কাছে আমি ঋত্বিকীর কথা বলতে পারব না।' এটা কেমন কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যে-জীবিকা তোমার পক্ষে সব চাইতে গৌরবজনক, যাতে তোমার মঙ্গল, সবার মঙ্গল, যেটা তোমার ঠাকুর চারাতে চান, সে কথা তুমি লোকের কাছে বলতে পারবে না কেন? পরমপিতা যেভাবে চালাতে চান, সেইভাবে চলতে রাজী থাকাই ভাল, সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ। অহঙ্কার, অভিমানবশতঃ বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে তার উল্টো পথে চলতে চাইলে বিধ্বস্তি, হয়রানি, দ্বন্দ্ব ও অশান্তিই হয় সম্বল। ইষ্টের প্রতিটি নির্দ্দেশ honourably embrace (সসম্মানে আলিঙ্গন) ক'রে তার বাস্তব রূপ দান করতে চেষ্টা করাই ভাল। এর মধ্যে আত্মাভিমান, লজ্জা, সঙ্কোচ বা সংশয়ের স্থান নেই। আপনি যাদের দীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন, শুধু তাদেরই যে ঋত্বিকী করার কথা ক'বেন, তা' নয়, প্রতিটি সৎসঙ্গী যাতে ঋত্বিকী করে সেদিকে আপনি ও আপনারা সবাই নজর রাখবেন। ঋত্বিকীটা চালু হ'লে দেখেন যেন কাজের কত জোর হয়।

একটা কুকুর বারান্দার পশ্চিম দিকে ব'সে-ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখছিল। একজন তাকে তাড়াতে চেষ্টা করলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোল করিস না। ও আমার কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। তাড়িয়ে দিলে ওর মন খারাপ হ'য়ে যাবে।

করুণাবিগলিত ছলছল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুর এক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কুকুরটির পানে। কুকুরটিও আর চোখ ফেরায় না

এইভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে কাতর কণ্ঠে বললেন—'মা'!

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধি অকর্ত্তারমব্যয়ম্।' এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণ কথাটার মানে instinctive habit and traits (সহজাত সংস্কার-প্রসূত অভ্যাস ও বিশেষ লক্ষণ), দেখেন তো dictionary (অভিধান)!

অভিধান দেখে বলা হ'লো—গুণ্-ধাতু মানে অভ্যাস, গুণন, পূরণ, আমন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণ মানে traits (বিশেষ লক্ষণ)। কিরকম trait (বিশেষ লক্ষণ)? যা' নাকি মুখর হ'য়ে থাকে, existence-এর (অস্তিত্বের) দিকে lean ক'রে (ঝুঁকে) inclined (আনত) হ'য়ে থাকে। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে গুণগুলি আবার আরো হ'য়ে ওঠে, এবং সেগুলি মানুষের প্রয়োজন পূরণ ক'রে, মানুষকে সেবা দিয়ে, তাদিগকে প্রীতি-আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত করে। আবার, যার যে-দিকে সহজাত ঝোঁক, সে সেইদিকেই যায়। সে সেই ঝোঁকওয়ালা লোক-কেই চায়। গাঁজেল গাঁজেলকেই আকর্ষণ করে। এইভাবে সহজাত ঝোঁকওয়ালা

মানুষরা স্বভাবতঃই গুচ্ছ বেঁধে ওঠে। আর, অভ্যাস বলতে আমি বুঝি তাই যা কিনা বিদ্যমানতা বা অস্তিত্বের সাথে থাকে। গুণের বীচিই হ'ল অভি-অস্ that which exists in in existence in favour of it (যা' অস্তিত্বের অনুকূল হ'য়ে অস্তিত্বে থাকে)। আর, কর্ম্ম হ'ল গুণের exposition (প্রকাশ)। মানুষের দেনাপাওনা চলে এই গুণকর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে। পেতে গেলে দিতে হয়, করতে হয়। সবাই সবটা পারে না। প্রত্যেকের পারগতা তার মত। যার গুণ-কর্ম্মের মেকদার যেমন—সে পারেও তেমন, পায়ও তেমন। সবার সবগুণ ও সবরকমের কর্ম্মদক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও সমাজের সকলেরই যে প্রয়োজন পূরণ হ'তে পারে, তার কারণ বিভিন্ন গুণ-কর্ম্ম-সমন্বিত মানুষের গুচ্ছীকরণ ও তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান। এদের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের দরকার। এক গুচ্ছের অভাব অন্য গুচ্ছকে দিয়ে পূরণ হবার নয়। যেমন ধরুন, ন্যাংড়া আমের বড়-ছোট, ভাল-খারাপ আছে, কিন্তু এর এমন একটা inherent specific specification (অন্তর্নিহিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য) আছে, যা একে distinctly (পরিষ্কার-ভাবে) mark out (চিহ্নিত) ক'রে দেয়, এবং তাতে মানুষ বুঝতে পারে এটা ন্যাংড়া, বোম্বাই নয়। ন্যাংড়ার স্বাদ, গন্ধ, চেহারা এবং বোম্বাইয়ের স্বাদ, গন্ধ, চেহারা কিন্তু আলাদা।

এই যে গুণকর্ম্মের বিভাগ-অনুযায়ী বর্ণ বিভাগ এটা বিধাতার শাশ্বত বিধান অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃতির কৃতিই এমনতর। তাই বিধাতা-হিসাবে তিনি যেমন এর কর্ত্তা, impersonal, universal, immutable law (নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন, অব্যয় বিধান)-এর working (ক্রিয়া) হিসাবে তিনি এখানে তেমনি অকর্ত্তা।

শরৎদা—বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি ভগবান দেখেছেন?' রামকৃষ্ণদেব তখন বলেছিলেন—হ্যাঁ! এই তোকে যেমন দেখছি তার চাইতেও ঘনীভূত রকমে তাঁকে দেখা যায় এবং তোকেও দেখাতে পারি। এই ভগবান দেখান জিনিসটার অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুর স্বয়ং ভগবান। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) যেমন বলেছেন—'You have seen me and you have not seen God!' (তুমি আমাকে দেখেছ অথচ পরমপিতাকে দেখনি, এ কেমন কথা!) অর্থাৎ, তাঁকে তেমনভাবে দেখলেই ভগবানকে দেখা হয়। অবতার পুরুষকে যারা অচ্যুত নিষ্ঠা-সহকারে ভালবাসে ও অনুসরণ করে সময়ে তাঁর ভূতমহেশ্বর রূপও তাদের কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এই হ'লো ভগবান দর্শনের বাস্তব তুক। শুধু তাঁকে

পেলে হবে না এবং তাঁর দয়া থাকলে হবে না। বিধিমত তাঁর পথে চলা চাই। তাঁর উপর প্রবৃত্তিছাপান টান যত হয়, ততই তাঁকে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করা যায়। একেই বলে ভগবান-দর্শন। আর, রামকৃষ্ণদেবের নিজের কাছে তো সারা জগৎই মা-ময়, ভগবান-ময়।

শরৎদা—সাকার নিরাকার কোন্‌টা primary (প্রাথমিক) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Primary (প্রাথমিক) হ'ল the life-force (প্রাণশক্তি)। নিরাকারেরই সাকার, সাকারেরই নিরাকার। চক্ষু দৃষ্টি-শক্তিরই সাকার রূপ, কিন্তু চোখ থেকেও যদি দৃষ্টিশক্তি না থাকে, তবে চোখের কোন অর্থ নেই। তাই fundamental (মৌলিক) হ'ল life-force (জীবনীশক্তি)।

প্রায় এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ইংরেজী বাণী দিলেন। তারপর তিনি স্নান করতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠার পর বিকেলের দিকে শ্রীযুত এন. সি. চট্টোপাধ্যায় এবং আসানসোলের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরাস্য হ'য়ে চৌকিতে উপবিষ্ট। পুরু তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে বসেছেন। তাঁর দিব্য অঙ্গ থেকে যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীরা সামনে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে মনের আনন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন।

অনেকটা কৃষি-জমি ও পঞ্চকোটের রাজবাড়ীটা প্রয়োজন হ'লে পাওয়া যেতে পারে কিনা সেই সম্পর্কে কথা হ'চ্ছে।

একজন বললেন—বরাকরের কাছে কল্যাণেশ্বর ব'লে একটা অতি সুন্দর জায়গা আছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম, অতি রমণীয়। আশ্রম করার পক্ষে সে জায়গাটি চমৎকার।

সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ললিতমধুর ভঙ্গিতে বললেন—

'থাক্ ভাই থাক্
কেন এ স্বপন,
এখনো সময় নয়।'

—কয়েক সেকেণ্ড থেমে চকিতে আগ্রহভরে বললেন—বড় লোভ হয় আপনাদের কাছে শুনে। মনে হয় ওখানে একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) যদি করা যেত। টোলের ধরণে education (শিক্ষা) হ'লে ভাল হয়, অর্থাৎ ছাত্রেরা আচার্য্যের বাড়ীতে থেকে হাতে-কলমে কাজকর্ম্ম করবে, শিখবে, পড়বে, মানুষ হবে। আজকের দুনিয়ায় দাঁড়াতে গেলে যা'-যা' শেখা লাগে, সবই শিখবে।

Science ও Technology (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা) থেকে সুরু ক'রে Arts Philosophy (কলা, দর্শন) কিছুই বাদ যাবে না। বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে যাতে all-round man (চৌকষ মানুষ) হ'য়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর, মনে রাখতে হবে মানুষকে যদি চরিত্র impart (দান) করা না যায় তবে education (শিক্ষা)-ই হ'ল না। তার জন্য শিক্ষককে যেমন আদর্শনিষ্ঠ শ্রদ্ধার্হ চরিত্রের মানুষ হওয়া লাগে, ছাত্রকেও তেমনি শ্রদ্ধাবান ও সেবাপরায়ণ হওয়া লাগে। আর, education (শিক্ষা)-টা হওয়া চাই thoroughly practical (সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী)। মানুষ যেখানেই দাঁড়াক সেখান থেকে যাতে মাথা খাটিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে, তেমনভাবে education (শিক্ষা) দিতে হবে।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—আশুতোষ কলেজের সঙ্গে আমি জড়িত আছি। সেখানে চার হাজার ছাত্রছাত্রী। কিন্তু দেখেছি তাদের বেশীর ভাগেরই ভারতের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তারও মূল কারণ হ'ল অজ্ঞতা। অনেকেরই ধারণা ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা বরাবর বৈষম্য ও বিভেদকেই জীইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সমাজ বৈশিষ্ট্যের বিলোপ চায় না এবং এই বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে চায় এমনভাবে যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাঁচাবাড়ার সহায়ক হয়। মানুষের বাঁচাবাড়া ব্যাহত হয় এমন কোন-কিছু করলে তাতে পাতিত্য আসে।

একজন কণ্ট্রাকটর বললেন—একটাও ভাল লোক পাচ্ছি না assistant (সহকারী) হিসাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকের বড় অভাব হয়েছে আজকাল, আজকাল মজুর খাটাতে গেলে কাজে কড়া, মুখে মিষ্টি লোক চাই। Tussling habit (বিবাদপ্রবণ অভ্যাস) হ'লে মুশকিল।

উক্ত ভদ্রলোক—Sincere (আন্তরিকতাসম্পন্ন) লোকেরই অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে, করার আকাঙ্ক্ষা নেই। এটা একরকমের pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি)।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন।

৮ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ২১।৩।১৯৪৮)

দুপুরে খেয়েদেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র-শয্যায় কাত হ'য়ে

শুয়ে আছেন। মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। কার বাড়ীতে কী রান্না হয়েছে সেই সম্বন্ধে গল্প হ'চ্ছে।

কালিষষ্ঠীমা সেই প্রসঙ্গে তাঁর বাড়ী-ঘরের অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংবাদ সরবরাহ ক'রে চলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঔৎসুক্য-সহকারে সব শুনছেন। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যা' ইংরাজী-বাংলায় বলেছি তার বৈজ্ঞানিক মরকোচের দিকটা তুলে ধরা আছে তো?

কেষ্টদা— হঁ্যা! তবে এই জিনিসই চারাতে গেলে এবং মানুষকে বোঝাতে গেলে আমাদের অনেক literature (সাহিত্য) লেখা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ সঞ্চারণার জন্য আমাদের বিশেষভাবে চাই মানুষ, paper (সংবাদপত্র), literature (সাহিত্য), যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদি। মানুষই বড় জিনিস। মানুষ পেলেই সব করা যায়।

কেষ্টদা—Organised (সংগঠিত) মানুষ দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organise (সংগঠন) করা শক্ত কিছু নয়। কয়েকটা মানুষ organised (সংগঠিত) থাকলেই হয়। দেখেননি চিনি জ্বাল দিয়ে তার মধ্যে সুতো দিলে কেমন মিশ্রী দানা বেঁধে ওঠে! ইষ্টে যারা thoroughly integrated (পূর্ণভাবে সংহত), তারাই integrating agent (সংহতি-সন্দীপী শক্তি) হিসাবে কাজ করতে পারে।

কাজের ধারা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রামকৃষ্ণ ঠাকুর এবং অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের খুব ভাল ক'রে পরিবেষণ করা লাগবে, তাহ'লেই আমাদের কথা বোঝার মত field (ক্ষেত্র) তৈরী হবে।

কেষ্টদা প্রফুল্লকে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—ঘুমের আগে বেশী সময় কথা বল্‌লে ঠাকুরের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে পারে। আমরা বরং এখন আস্তে-আস্তে উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমজড়ানো চোখে কাতরকণ্ঠে বললেন—এখন এ-সব কথা বেশী ভাবতে পারি না। মনে হয়—এত সোজা জিনিস, অথচ ভাল ক'রে করল না কেউ, যার দরুন সামনে এমন অনিবার্য্য দুর্দ্দৈব। জোর ক'রেই যেন বিপর্য্যয়ের দিকে যাওয়া হ'ল।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যার কাছ থেকে আমরা কেবল নিতে চাই, পেতে চাই, তার উপর আমাদের কখনও টান গজায় না। ওতে ভালবাসা

শুকিয়ে ওঠে। প্রত্যাশাহীন হ'য়ে যাকে যত দেওয়া যায়, যার যত পালন-পোষণ করা যায়, তার উপর তত টান বাড়ে।

৯ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ২২।৩।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। দূরের অশ্বত্থ গাছটিতে ব'সে কয়েকটি পাখী খেলা করছে। মাঝে-মাঝে পরম আগ্রহভরে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। আর ফাঁকে-ফাঁকে যাঁরা এসে প্রণাম করছেন, তিনি চোখবুজে হাতজোড় ক'রে তাঁদের প্রণাম গ্রহণ ক'রে পরমপিতার চরণে তা' পৌঁছে দিচ্ছেন। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে সবাই নীরবে তাঁর সান্নিধ্যসুখ উপভোগ করছেন। তাঁর করুণ কোমল প্রীতিমধুর দৃষ্টি সবার অন্তরে প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে।

এমন সময় ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) একখানি খবরের কাগজ হাতে ক'রে সেখানে আসলেন।

—কী রে, কী আনলি ? উল্লসিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ধূর্জ্জটিদা—বসুমতী পত্রিকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী আছে ওতে ?

ধূর্জ্জটিদা—এতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি কথা আছে। প'ড়ে ভাল লাগলো। আপনার কথার সঙ্গে খুব মেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়্ তো দেখি।

ধূর্জ্জটিদা প'ড়ে শোনালেন—'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না, ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না, ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান—এই ব'লে নাক সিটকে ঘৃণা ক'রো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে।' —ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সশ্রদ্ধচিত্তে কথাগুলি শুনে বললেন—এমন কথা আর কে বলবে ? এমন ছোট্ট ক'রে, এমন টোটকার 'পর। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা খুব চারান লাগে।

ধূর্জ্জটিদা—তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন—কথাটির মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার-মহাপুরুষের মধ্য-দিয়েই তো তাঁর আবির্ভাব। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন মানে prophet (প্রেরিতপুরুষ) যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-দের জীবন ও বাণীর ভিতরেই আমরা শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাই। তাঁরা স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী, তাই কারও ভাবে

ব্যাঘাত করেন না। আবার, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেও তাঁদের বাণী ও উপদেশ-গুলির ভিতর থেকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যপোষণী উপাদান সংগ্রহ ক'রে থাকে। আমার পক্ষে আমার বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, অপরের পক্ষে তার বৈশিষ্ট্যও তেমনি সত্য। নিজের বৈশিষ্ট্যে নিনড় থেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা ক'রে চলাই সঙ্গত। তাতেই পারস্পরিক প্রীতি ও সহনশীলতা বজায় থাকে। যার যে বৈশিষ্ট্যই থাক, তা' যদি তার নিজের ও অপর সকলের সত্তার পরিপোষণী হয়, তাহ'লে আর চিন্তার কারণ নেই। তার জন্য মানুষকে ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া লাগে।

রামকৃষ্ণদেবের কথা খুব চারাতে হয়। আর মাঝে-মাঝে একটু আঁশ ভেঙ্গে দিতে হয়, যেমন—"তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন''—সম্বন্ধে বলা হ'ল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। সামনে একখানি বেঞ্চিতে শ্রীযুত এন. সি. চট্টোপাধ্যায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), শচীনদা (গাঙ্গুলী), ডাক্তার কালীদা (সেন), প্যারীদা (নন্দী), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), সরোজিনীমা, কালিদাসীমা প্রভৃতি কাছে আছেন। এক আনন্দময় পরিমণ্ডলে সকলেই তৃপ্তিতে মসগুল হ'য়ে আছেন। সহজভাবে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

মহাত্মাজীর প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাত্মাজী যা' সত্য ব'লে বুঝতেন, তা' নিজ জীবনে কঠোর-ভাবে পালন করতে চেষ্টা করতেন। শুধু তা' ক'রেই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না, সমগ্র পরিবেশকে সেই পথে চালিত করতে চেষ্টা করতেন। কায়মনোবাক্যে একমুখী চলনে চলার ফলে তাঁর personality (ব্যক্তিত্ব) ও will-power (ইচ্ছাশক্তি) অতো প্রবল হ'য়েছিল, যার ফলে কিনা সারা দেশকে তিনি তাঁর মত ক'রে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এ-বড় কম কথা নয়। স্বাধীন দেশের এখন করণীয় ঢের। তবে আমরা যাই করি আর যে-অবস্থার মধ্যেই পড়ি, আমাদের দেখতে হবে আমরা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথে চলছি কিনা। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, রসুল, চৈতন্য-দেব, রামকৃষ্ণ ঠাকুর—ইত্যাদি অবতার-মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা গভীর একসূত্রসঙ্গতি ও পারস্পরিক সমর্থনের অনুরণন পাওয়া যায়। তাঁদের অনু-সৃত ধারা-অনুযায়ীই আমাদের সব দিক দিয়ে উৎকর্ষের পথে চলতে হবে। উৎসহারা ও বৈশিষ্ট্যবিলোপী চলনকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। পূর্ব্বতনের যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে আমরা যদি কিছু করি, তা' কখনও টেকসই হ'তে পারে না। সাময়িক জেল্লা দেখা গেলেও, তা' দু'দিন বাদে নিথর হ'য়ে নিভে যায়।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—Coherent philosophy of life (সঙ্গতিপূর্ণ জীবনদর্শন) আজকাল অনেকেরই নেই, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নীতি জোড়াতালি লাগিয়ে মানুষ চলে। Eclectic philosophy-র (নানা মতবাদের চিন্তাধারা-সমন্বিত দর্শনের) দিকেই আজকাল লোকের ঝোঁক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাণশক্তির একটা অখণ্ডতা আছে, যদিও তা' শরীরের নানা অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর-দিয়ে নানাভাবে ক্রিয়া করে। প্রাণশক্তির এই অখণ্ডতা বাদ দিয়ে জীবন যেমন জীবন্ত থাকে না, এককেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে তেমনি coherent living philosophy of life (সঙ্গতিপূর্ণ জীবন্ত জীবনদর্শন) গ'ড়ে ওঠে না। আবার, যে-কোন কাউকে কেন্দ্র ক'রে চললে হয় না, সেই মানুষটি হওয়া চাই solved man (সমাধানপ্রাপ্ত মানুষ), integrated man (সংহত মানুষ)। তাঁকেই আমারা বলি ইষ্ট। তাই ইষ্টগ্রহণ বা দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন এত অকাট্য আমাদের জীবনে। মানুষের জীবনের দাঁড়াটা যদি ঠিক থাকে, তবে সেই দাঁড়ার উপর দাঁড়িয়ে বাইরের অনেক-কিছুর গ্রহণ-বর্জ্জন চলতে পারে। কিন্তু ভিতই যদি হয় নড়বড়ে, তার উপর বিরাট গাঁথুনী তুলে ফয়দা হবে কী?

বর্ণবিধানের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে একজন নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কেষ্টদা বললেন—Varna is to create specialised heredity in different spheres of national activity. (জাতীয় কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী বিশিষ্ট বংশগতির সৃষ্টির জন্যই বর্ণবিধান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একে অন্য কথায় বলা যায়—Grouping of the varieties of similar instincts (বিভিন্ন ধরণের সদৃশ সহজাত সংস্কারের গুচ্ছীকরণ)। মানুষের instinct (সহজাত সংস্কার) ধরতে না পারলে বোঝাই যায় না কাকে দিয়ে কোথায় কী কাজ করান সম্ভব। এটা প্রতিপদক্ষেপেই essential (অতি প্রয়োজনীয়)।

এরপর অনেকেই বিদায় নিলেন।

১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ২৩।৩।১৯৪৮)

আজ অমৃতবাজার পত্রিকায় পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে কায়েদে আজম জিন্নার একটা উক্তি বেরিয়েছে। সেইটি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষ প্রকাশ ক'রে প্রফুল্লকে বললেন—কথাগুলি টুকে রাখ্। কথাগুলি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের স্মরণ থাকে তা' হ'লেই ভাল। ধর্ম্ম মানেই অপরের বাঁচার পথ প্রশস্ত করার ভিতর-দিয়ে নিজের বাঁচার ভিত শক্ত-সাবুদ করা। এই চলনে চলাটাই প্রত্যেকের প্রকৃত স্বার্থ।

কথাগুলি এই :—

"We assure them that in Pakistan their lives and properties are far more secure and protected than in India. We will protect and safeguard fully the interest, lives and property of every citizen in Pakistan without any consideration of caste, creed and irrespective of communities." (আমরা তা'দিগকে 'সংখ্যালঘুদের' নিশ্চিত কথা দিচ্ছি যে ভারতের চাইতে পাকিস্তানে তাদের জীবন ও সম্পত্তি অনেক বেশী নিরাপদ ও সুরক্ষিত। আমরা জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থ, জীবন, সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করবই।)

১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৪ (ইং ২৪।৩।১৯৪৮)

বেলা প্রায় দশটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। তাঁর কাছে আনন্দের হাট বসেছে। শরৎদা (হালদার), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—জগতে একটা ইচ্ছা ছাড়া কি দুটো ইচ্ছা আছে ? অনেকে তো বলেন—পরমপিতার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের পুরুষকারও পরমপিতারই দান। পুরুষকার যখন পরমপিতার অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে, তখনই তা' ভ্রান্তিকে এড়িয়ে পরমপিতার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করতে পারে। অবশ্য, পরমপিতার দেওয়া libido-র (সুরতের) will (ইচ্ছা)-কে মানুষ অন্যভাবেও চালনা করতে পারে। যে যেভাবে তাকে চালায়, সে সেই-অনুযায়ী তার ফল পায়। এই হ'ল বিধি। কিন্তু সত্তা চায় বাঁচতে, বাড়তে, বিস্তারলাভ করতে। এই ইচ্ছারূপে পরমপিতা প্রতিটি সত্তায় বিদ্যমান। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার misuse (অপব্যবহার) ক'রে সত্তাকে যখন বিপন্ন ক'রে তোলে, তখন পরমপিতার দেওয়া বাঁচাবাড়ার ঐ আদিম ইচ্ছা তার ভিতর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। আবার, অপর কেউ যদি তার বাঁচাবাড়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সেখানেও সে রুখে দাঁড়ায়। তাই, তাঁর ইচ্ছার আওতার বাইরে আমাদের স্বচ্ছন্দে চলার পথ খুব সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সে-পথ থেকে ফিরে আসতেই হয় বাঁচার তাগিদে। সত্তাপালী ইচ্ছারূপে তিনি প্রত্যেককে জড়িয়ে ধ'রে আছেন। তাঁর ঐ ইচ্ছাই জগতের নিয়ামক-শক্তি। তাই, মন্দকে অতিক্রম ক'রে আমরা ভালকে পাবার জন্য আকুল। মন্দের প্রতি আমাদের নুআসক্তি থাকতে পারে, কি সাধারণতঃ তাতে আমাদের তৃপ্তি নেই। আবার,

ভালর প্রতি আমাদের আসক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যেই আমাদের তৃপ্তি। ভাল চাই, ভাল চাই বললেই ভাল আপনা থেকে হেঁটে আসে না। Libido (সুরত) উপযুক্ত কাউকে ধ'রে ভালটা achieve (লাভ) করতে পারে। ঐ tension (টান) ভেঙ্গে গেলে মানুষ যষ্টিচ্যুত হ'য়ে যায়। Stand নেবার (দাঁড়াবার জন্য) prop (অবলম্বন) চাই-ই। বানর গাছের যে ডালটা ধ'রে ঝোলে, সেটা ভাঙ্গলে লাফিয়ে আর একটা ডাল ধরে, ঝুলতে গেলে ধরতেই হবে একটাকে। ইষ্ট হ'লেন আমাদের নিত্যকালীন আশ্রয়। আমাদের সব গেলেও কিছু যায় না, যদি ইষ্টনিষ্ঠায় ভাঙ্গন না ধরে। ঐ টানই determine (নির্দ্ধারণ) করে জীবন। তাই যা' ঘটে, তা যে inevitable (অবশ্যম্ভাবী) তা' আমার মনে হয় না। তবে কার্য্যকারণ-পারম্পর্য্যে অনেক সময় অনেক-কিছু inevitable (অবশ্যম্ভাবী) হ'য়ে ওঠে। নিজের ও পরিবেশের সময়োচিত বিহিত নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে অনেক-কিছু অমঙ্গলকে এড়ান যায় ব'লে আমার বিশ্বাস। আমরা সেইভাবে যখন ভাবিত ও সক্রিয় হই, তখন বুঝতে হবে পরমপিতার ইচ্ছাই আমাদের ভিতর জাগ্রত হ'য়ে আছে।

একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—মানুষ sensitive (অনুবেদনশীল) হ'লে কষ্ট পায়, sensitive (অনুবেদনশীল) না হ'লে hard-hearted (নিষ্ঠুরমনা) হয়। এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে আপনকরা আনন্দমধুর হাসির তরঙ্গ খেলতে লাগল। তিনি ছন্দোময় ভঙ্গীতে ডান হাতখানি ঘুরিয়ে বললেন—মানুষ sensitive (অনুবেদনশীল) না হ'লে বোধ করতে পারে না, কিন্তু বোধ ক'রে bewildered (বিহ্বল) হ'লে সত্তা টেকে না। তাই সব চাইতে ভাল হ'ল বোধ করতে পারা ও বোধজনিত বেদনা resist (প্রতিরোধ) করতে পারা অর্থাৎ overwhelmed (অভিভূত) না হওয়া। ধর, একজনের দুঃখ দেখে তুমি খুব ব্যথিত হ'লে, কিন্তু তার নিরাকরণের জন্য তোমার পক্ষে যা' করা সম্ভব তা' করলে না। ঐ ব্যথা-বোধ কিন্তু তোমার বন্ধ্যা। একজনের দুর্ব্ব্যবহারে তুমি হয়তো মনে খুব আঘাত পেলে। কিন্তু কেন সে অমন করলো, তা' তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা হয়তো করলে না। এগুলি হ'ল imperfect sensitiveness-এর (অপূর্ণ অনুবেদনশীলতার) লক্ষণ। সব সময় লক্ষ্য রাখা লাগে যাতে তোমার বোধগুলি সমগ্র ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'য়ে তোমার ও তোমার পরিবেশের দুঃখ লাঘব ও সুখ বৃদ্ধির হেতু হ'য়ে ওঠে। তবে মানুষের জীবনে অসহনীয় ও প্রতিকারের অতীত বহু কষ্টই আসে। মানুষের prop (অবলম্বন) বা যষ্টি যদি ঠিক থাকে, তাহ'লেই সেগুলি অনেক-

খানি সামাল দিতে পারে। একজন মানুষ থাকা চাই, যঁার কাছে গেলে exalted (উত্তোলিত) হ'তে পারি। তেমন একজন মানুষ যদি থাকেন, আর তাঁকে সমগ্র দুনিয়া দিয়ে fulfil (পূরণ) করার urge (আকূতি) যদি থাকে, তবেই মানুষ দুঃখ এড়াতে পারে। চাই সেই প্রেষ্ঠনেশা যা' সারা মনপ্রাণ সর্ব্বদার তরে মাতাল ক'রে রাখে। তাহ'লেই বাঁচোয়া। তখন আর দুঃখ-শোকের ভয় থাকে না। দুঃখের ভয়ে ভীত হ'য়ে চলা আর দুঃখকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ও overcome (অতিক্রম) করতে চেষ্টা করা—এই দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস।

উক্ত দাদা—বেঁচে লাভ কী? এতবড় পৃথিবী, এত মানুষ রয়েছে। আমি যদি মরি, তাতে কী এসে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু আমাদের বাঁচার আগ্রহ আছে। আমার মনে হয়, বাঁচাটাই স্বার্থ। বাঁচার যন্ত্রণাকে যে resist (প্রতিরোধ) করতে পারে না, সে ভাবে মরণই ভাল। বাঁচাটাও আমাদের প্রেষ্ঠের জন্য, তাঁর সেবার জন্য, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য। বাঁচাটা যখন কারও জন্য হয়, তখন সে-বাঁচাটার মধ্যে একটা সার্থকতা থাকে। তখন সব বাধা উত্তীর্ণ হ'য়ে মানুষ বাঁচতেই চায়। ভালবাসাই মানুষকে বঁাচতে বলে এবং প্রিয়ের প্রীতিজনক কর্ম্মে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুলতে বলে।

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ২৫।৩।১৯৪৮)

আজ দোল-পূর্ণিমা। কিন্তু দিনটা সকাল থেকে বাদলা। এই অবস্থার মধ্যেও দলে-দলে আবালবৃদ্ধবনিতা আবীর ও অর্ঘ্যসহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। অবশ্য, শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বাগ্রে মাতৃদেবী, পিতৃদেব, সরকার সাহেব ও হুজুর-মহারাজের উদ্দেশ্যে আবীর ও অর্ঘ্যসহ প্রণাম নিবেদন ক'রে নিয়েছেন। আজ থেকে ৪০ তম ঋত্বিক্-অধিবেশন শুরু। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ক্রমাগত লোকের ভিড় লেগেই আছে। তিনি সাদরে, সহর্ষে ও সোল্লাসে সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। তিন মাস অন্তে প্রেষ্ঠসন্দর্শনের সৌভাগ্যলাভে সকলের মনপ্রাণ এখন আলোকে, পুলকে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত, উদ্ভাসিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও ভক্তবৃন্দকে কাছে পেয়ে মহা খুশী, পরম পরিতৃপ্ত। তাঁর সর্ব্ব-অঙ্গ দিব্য দ্যুতি-বিভাসিত। দেখে-দেখে যেন আশা মোটে না। মোহিত হ'য়ে অপলকনেত্রে যুগ-যুগান্তর ধ'রে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে ব'সে আছেন।

মেণ্টুভাই (বসু) আসতেই তিনি বললেন—এই মেণ্টু! প্রফুল্লর কাছে একটা

লেখা দেওয়া আছে। তুই টুকে নিস ও মক্‌স করিস। ওতে কাজ দেবে।

মেণ্টুভাই তখনই ঐ ইংরেজী বাণীটি টুকে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নিজের দোষ খুঁজে বের করা ও তা' সংশোধন করার কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে তা' করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কাজে unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হ'লে দেখা লাগে কিজন্য unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হ'লাম। ভুলগুলি বিশ্লেষণ ক'রে বের করা লাগে। কিন্তু শুধু বুঝে চুপ ক'রে থাকলে হবে না। Adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা চাই। Adjust (নিয়ন্ত্রণ) না করলে depression (অবসাদ) আসে। আর, এই ব্যাপারে অন্যের যা' দোষ থাক্ না কেন, তা' কখনও বড় ক'রে দেখতে নেই। ধর, একজন কথা দিয়ে কথা ঠিক রাখেনি, এবং তার উপর নির্ভর ক'রে তুমি বেঘোরে প'ড়ে গেছ। এখানেও যদি তুমি নিজেকে দায়ী না কর, তাহ'লে ঠ'কে যাবে। কার উপর কখন, কোথায়, কতটুকু নির্ভর করা যায়, সেটুকু জানা চাই, বোঝা চাই। আবার, কারও উপর যদি নির্ভর কর, তাকে দিয়ে সে-কাজটা করিয়ে নেবার দায়িত্বও তোমার। সে যদি কোন কারণে না পারে, তাহ'লে বিকল্প ব্যবস্থাও ঠিক রাখা চাই। এইভাবে সব দিকে নজর রেখে চলতে হয়। কাজকর্ম্ম যত নিখুঁতভাবে, সময়মত, কৃতিত্বের সঙ্গে করা যায়, তত চরিত্র ঠিক হয়। দায়িত্বহীন অলস জীবন-যাপন করলে ধর্ম্ম হয় না। বেয়াড়া situation (পরিস্থিতি) ও বেয়াড়া মানুষকে কে কতখানি tactfully manage (সুকৌশলে পরিচালনা) করতে পারে, তাই দেখে বোঝা যায় সে কতখানি intelligent (বুদ্ধিমান) ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত)। যে তোমাকে মানে না, জবরদস্তি ক'রে বা ভয় দেখিয়ে যদি তার মান্য আদায় করতে চাও, তবে তুমি তাকে আরো হারাবে। সেখানে তোমাকে সহ্য-ধৈর্য্যসহকারে এমনভাবে চলা লাগবে, যাতে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে ও মান্য ক'রে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। সব চাইতে কঠিন কাজ অপরের ego (অহং)-কে tackle (পরিচালনা) করা। নিজের ego (অহং) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হ'লে এ কাজ পারা যায় না। আর, surrender (আত্মসমর্পণ) ছাড়া এটা হবারও নয়। জীবনে সব দিক দিয়ে সার্থক হ'তে গেলে প্রতি পদক্ষেপে চাই active surrender (সক্রিয় আত্মসমর্পণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে চেয়ে বললেন—উত্তরসাধক কথাটা বড় ভাল। উত্তরসাধক থাকলে মানুষ জোর পায়। যেমন, আমি যা' করি, আপনি আমার পিছনে আছেনই। আপনি যেন উত্তরসাধক। সব কাজেই

একজন উত্তরসাধক লাগে। তাহ'লেই মানুষ বুকে বল ক'রে দাঁড়াতে পারে। জানে, তাহ'লে তার আরব্ধ কাজের continuity (ক্রমাগতি) বজায় থাকবে। ব্যবসা করতে যান, সেখানেও একজন উত্তরসাধক চাই। যার tussling nature (ঝগড়াটে স্বভাব), সে কখনও ভাল উত্তরসাধক পায় না, কারণ, সে সওয়া-বওয়ার অভাবে কারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে স্ফুরিত ক'রে তুলতে পারে না। আর, ঐ একই দোষের দরুন, সে নিজেও ভাল উত্তরসাধক হ'তে পারে না। সেই হ'লো সত্যিকার উত্তরসাধক, যে আশা, ভরসা, মাভৈঃ-বাণী নিয়ে একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে কাজে সাহায্য করে, তার mission (উদ্দেশ্য) fulfil (পূরণ) করার ব্যাপারে তাকে সর্ব্বতোভাবে সামনে এগিয়ে দেয় ও তুলে ধরে। এতে উভয়ে progress (উন্নতি) করে। এ ছাড়া মানুষ এগুতে পারে না। মা ছিলেন আমার prop (খুঁটি)। মা চ'লে যাওয়ার পর থেকে আমার যেন আর কিছু ভাল লাগে না।

কেষ্টদা—প্রায় সব মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের জীবন যেন বিষাদ-ভারাক্রান্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হয় শিষ্যদের incapability (সামর্থ্যহীনতা)-র দরুন। মহাপুরুষরা always cruel to themselves (সর্ব্বদা নিজেদের প্রতি নিষ্ঠুর), কারণ, তাঁরা সর্ব্বদা পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকের মঙ্গলসাধনে ব্যস্ত, অপরের জন্য নিজেদের ফতুর ক'রে দিতেই যেন আসেন তাঁরা জগতে, নিজেদের দিকে চাইবার অবকাশ কোথায় তাঁদের? এমত অবস্থায় environment (পরিবেশ) যদি affectionate (প্রীতিপরায়ণ) হয়, তাহ'লেই তাঁরা কিছুটা স্বস্তিতে, শান্তিতে থাকতে পারেন। শুনেছি বুদ্ধদেব ব্যাধের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে নানা কৌশল অবলম্বন ক'রে তাঁর শিষ্যদের কাউকে অখাদ্য খেতে দিলেন না, তিনি তাদের রক্ষা করলেন, কিন্তু তারা যে ব্যাধটাকে tactfully (সুকৌশলে) খুশী ক'রে বুদ্ধদেবকে ঐ খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা থেকে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবে, তা' আর ক'রে উঠতে পারল না। তার ফল যা' হবার তা' হ'ল। প্রত্যেক prophet (প্রেরিতপুরুষ)-কে দেখা যায়, সকলের জন্য তাঁর যা' করবার তা' করতে তিনি এতটুকু ত্রুটি রাখেন না, কিন্তু environment (পরিবেশ)-এর তাঁর জন্য যতখানি যা' করা উচিত, তা' প্রায়ই করে না। প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে না উঠলে অতন্দ্রভাবে তাঁর সেবা করা বা তাঁর উপর নজর রাখা সম্ভবও হ'য়ে ওঠে না।

চুনীদা—অবতার-মহাপুরুষদেরও কি পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে না? জন্ম নিলেই environment (পরিবেশ) চাই।

মানুষ হ'য়ে তিনি যখন আসেন, তখন মানুষের মত ক'রেই তাঁকে যা'-কিছু করতে হয়। তাইতো মানুষ তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলতে পারে এবং অনুসরণ ক'রে লাভবান হ'তে পারে। নইলে আজগবী রকমে চললে মানুষ তাঁকে অনুসরণও করতে পারতো না এবং তাঁকে দিয়ে লাভবানও হ'তে পারতো না। তিনি আপ্রাণ ভালবাসায় ও সেবায় environment (পরিবেশ)-কে richer (সমৃদ্ধতর)-ই ক'রে দিয়ে যান, কিন্তু environment (পরিবেশ)-এর যদি তাঁর প্রতি ততখানি responsible attachment (দায়িত্বশীল অনুরাগ) থাকে, তাহ'লে তো হয়! তিনি ভালবেসে আমাদের যতই সুখ-শান্তির বিধান করুন তাতে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হয় না, যদি কিনা প্রত্যাশাহীন হ'য়ে আমরা তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভাল না বাসি ও সেবাযত্ন না করি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর বললেন—চলেন, বাইরে যেয়ে বসি। ওখানে অনেকের মুখ দেখা যাবে একসঙ্গে।

প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের চটিজোড়া এগিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চটিটা প'রে বাইরে এসে বারান্দায় পাতা চৌকিতে উত্তর-পশ্চিমাস্য হ'য়ে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—শরৎদার জ্বর।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন—মিটিংয়ের সময় শরৎদা প'ড়ে থাকলে তো মুশকিলের কথা। তাড়াতাড়ি সারায়ে তোলা লাগে। (প্যারীদার দিকে চেয়ে) —এই প্যারী! তুই ঠিক ক'রে দিস না ক্যান্?

প্যারীদা—আমি তো ওষুধ দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে আবদারের সুরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন—যেমন ক'রে পার শরৎদাকে খাড়া ক'রে দেওয়া লাগবি তাড়াতাড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার অপূর্ব্ব মোহন ভঙ্গিমা দেখে সকলে হেসে ফেললেন।

একটু পরে যশোহরের বিনোদদা (দাঁ) নিজের অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন ক'রে কী করবেন তা' জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সঙ্গে বললেন—বাবা! পয়সা কি পয়সা দেয়? মানুষ পয়সা দেয়, মানুষ ভালবাসে, মানুষ খাবার জোগায়, মানুষের কাছ থেকেই আসে সব, যা'-দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি। তাই, মানুষ উপার্জ্জন করা লাগে, মানুষকে ভালবাসা লাগে, মানুষকে service (সেবা) দেওয়া লাগে, মানুষকে আপন করা লাগে। যে-কাজ জান, তাই করা লাগে। তার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ-দিকে

খেয়াল রেখে চলতে হয়। মানুষ উপায় করতে যদি পার, পয়সার জন্য ভাবতে হবে না।

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ৩০।৩।১৯৪৮)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠের মধ্যে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীযুত এন. সি. চট্টোপাধ্যায়, শচীনদা (গাঙ্গুলী), হেমদা (মুখার্জ্জী), ভোলানাথদা (সরকার), মণিভাই (সেন), খগেনদা (তপাদার), করুণাদা (মুখার্জ্জী), বীরেনদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), দাশুদা (রায়), অমূল্যদা (ঘোষ), অনিলদা (গাঙ্গুলী), সুরেনদা (বিশ্বাস), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), সুধীরদা (চ্যাটার্জ্জী), হরেনদা (বসু), মণিদা (কর), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), জিতেনদা (মিত্র), কালীদা (ব্যানার্জ্জী), সন্তোষদা (মুখার্জ্জী), প্রমথদা (দে), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), উমাদা (চরণ), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে বললেন—মানুষ চাই, paper (সংবাদপত্র) চাই, pamphlet (পুস্তিকা) চাই, propaganda (প্রচার) চাই। মানুষই আসল। মানুষ হ'লেই সব হয়। সবাইকে conscious (সচেতন) ক'রে তোলা লাগে, active (সক্রিয়) ক'রে তোলা লাগে। কেউ যেন ঝিমিয়ে না থাকে। আর প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিপত্তনের জন্য নূতন রকমে university (বিশ্ববিদ্যালয়) গ'ড়ে তুলতে হয়। শিক্ষা জিনিসটা এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হয়, যাতে প্রতিটি ছাত্র মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে। আপনারা হিন্দু মহাসভার আন্দোলন করেন, আমার মনে হয় ওর নাম দিতে হয় আর্য্যমহাসভা, যাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান সবাই তার সভ্য হ'তে পারে। আর্য্যদের মধ্যে আছে ঋষিপরম্পরা ও পিতৃপুরুষকে মানার কথা। এই ধারাটা যদি ঠিক থাকে তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মাথা তোলা দিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, আদর্শের প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, তা' করা লাগে। নইলে মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না, integrated (সংহত) হয় না। আর, বামুন যাতে অশ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে ওঠে তেমনতর propaganda (প্রচার) ভাল না। বড় যাতে প্রকৃত বড় হ'তে এবং তার উপর যাতে মানুষের শ্রদ্ধা জাগে তাই করা লাগে। একদিকে যেমন শ্রদ্ধা করার মত মানুষ চাই অন্যদিকে আবার তাদের উপর শ্রদ্ধা জানাবার ব্যবস্থা চাই। শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষ বড় হ'তে পারে না।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা ঋত্বিক্-অধিবেশনের সাধারণ-সভার সভাপতির ভাষণ হিসাবে প্রদত্ত শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা-সম্বন্ধে বললেন—দাদার বলার রকম খুব প্রাণস্পর্শী। যেমন যুক্তি, তেমনি আবেগ। আবার ভাষা, গলার স্বর ও presentation (উপস্থাপনা)-ও চমৎকার।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়—Prepare (প্রস্তুত) ক'রে বলার থেকে inspiration-এর (প্রেরণার) বলাই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inspiration-এর (প্রেরণার) আসল জিনিসই love (ভালবাসা)। 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্'। তদ্গত থাকলে তিনিই কথা জুগিয়ে দেন।

শচীনদা—কৃপার অধিকারী হওয়া চাই তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। কৃপা মানে আমি বুঝি—ক'রে পাওয়া। যে যতখানি তাঁর হয়—বাস্তবে,—সে ততখানি তাঁর দয়া উপলব্ধি করে। রামকেষ্ট ঠাকুর বলেছেন—ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। তাঁর দয়াকে অধিগত করতে যতটুকু করবার, তা' করতেই হবে।

এরপর শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

একটি দাদার কোন কারণে রাগ হয়েছে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে ক্ষোভের সঙ্গে নানা কথা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমি এখন যা' করছি, সেইটেই আমার দোষ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেগড়ান মেজাজ নিয়ে আমরা যেই যে ব্যবহার করি, সেটাই দোষের হ'য়ে ওঠে। যে-ব্যবহার মানুষকে soothe (তুষ্ট) করে না, appease (শান্ত) করে না, elate (উৎফুল্ল) করে না, সে-ব্যবহার মানুষের কাছে প্রীতিকর ও আদরণীয় হয় কমই।

হেমদা (মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—গুরুদাসের সঙ্গে আমার মেয়েটার বিয়ে হ'লে আমি free (দায়মুক্ত) হ'তে পারতাম। আপনার অনুমতি থাকলে অগ্রসর হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌দের-সম্বন্ধে আমার কথা—তাদের ঋত্বিকী complete (পূর্ণ) হ'লে বিয়ে করা ভাল। নচেৎ আপনার ভার কমবে, কিন্তু গুরুদাস ভারাক্রান্ত হবে। যা' হোক, চেষ্টায় থাকেন। তবে ঋত্বিকতার কাজ ছেড়ে মেয়ের বিয়ের খোঁজ করতে যাবেন না, কাজ করতে-করতে যদি খোঁজ পান, তাহ'লে ভাল। এমনি তো আমরা বহু ক্ষতি করেছি, আমাদের ability

(সামর্থ্য) ছিল, possibility (সম্ভাবনা) ছিল, কিন্তু তেমন ক'রে খেটেপিটে করলাম না কিছু।

২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৪ (ইং ৮।৪।১৯৪৮)

এখন চৈত্রের শেষ। একটু বেলা বাড়তে না বাড়তে চারিদিক তেতে ওঠে। ধূসর, ঊষর, রুক্ষ রাঙ্গামাটির দেশ যেন রুদ্র সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে। বাইরে তখন টেকা দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বেলা গোটা নয়েকের সময় আমগাছতলা থেকে উঠে এসে বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), রাজেনদা (মজুমদার), মহিমদা (দে), জ্ঞানদা (দত্ত), নরেনদা (মিত্র), জয়ন্তদা (বিশ্বাস), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিত ভাই (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), অনিল (দত্ত), আশু (ভট্টাচার্য্য), জিতেন (দলুই) প্রভৃতি কাছে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারের কাছে আমাদের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে এখনই একটা দরখাস্ত ক'রে রাখা ভাল।

কেষ্টদা—তাতে কি কোন ফল হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফল হোক বা না হোক আমাদের বক্তব্য আমাদের নিবেদন ক'রে রাখা ভাল। এমন কোন সরকার নেই যা' জনসাধারণের কল্যাণ না চায়। তাই-ই যেখানে আমাদের mission (উদ্দেশ্য) সে-কথা আমরা জানাব না কেন ? জন্মভূমির সেবা আমার নিজেরই গরজ। তার scope (সুযোগ) আমি বরাবরই খুঁজব। যদি সে scope (সুযোগ) আমাকে না দেওয়া হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার করণীয় যা', সে-ব্যাপারে আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চাই না। তারপর পরমপিতার যা' মর্জ্জি, তাই হবে। যত খারাপ অবস্থাই আসুক, আমি ভাবি তার ভিতর-দিয়ে কতখানি ভাল করা যায়। যত বেশী লোক এই তালে থাকবে, ততই পৃথিবীর চাকা ঘুরে যাবে।

কেষ্টদা—পৃথিবীতে বিপ্লবের পর বিপ্লব এসেছে, কিন্তু মানুষের যে খুব একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা' তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দোষ নিয়ে বেশী সোরগোল না ক'রে, তাই করা লাগে যাতে মানুষের ভিতর ইষ্টপ্রাণতার প্লাবন সৃষ্টি হয়। এই বিপ্লবই আদৎ বিপ্লব। এর সঙ্গে-সঙ্গে চাই অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। তবে অসহিষ্ণু যদি হ'তে হয় সে বিশেষ ক'রে নিজের দোষ-সম্বন্ধে। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে

নেই। অপরের দোষ দেখলে sympathy (সহানুভূতি), understanding (বুঝ) ও toleration (সহনশীলতা) নিয়ে ভাবতে হয় কেন সে দোষ করে। ডাক্তারের মত তার দোষরূপ disease (রোগ) সারিয়ে তুলতে হয়। মানুষকে এমনভাবে ভালবাসবেন, যাতে তারা আপনাকে ভাল না বেসে পারে না, এই-ভাবে ছাড়া জোরজবরদস্তি ক'রে কারও ভিতরে কোন পরিবর্ত্তন আনা যায় না। আজ যাকে আপনি বেকায়দায় ফেলে হাতের মুঠোর মধ্যে আনলেন, সে সুযোগের সন্ধানে থাকবে কেমন ক'রে কবে আপনাকে ঘায়েল করবে। কিন্তু শুভবুদ্ধিপ্রসূত বিহিত শাসনে মানুষ হাতের বাইরে গিয়ে শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায় কমই। ভাল হওয়ার ও ভাল পাওয়ার একটা শিষ্ট রীতি আছে। সেই রীতি অনুযায়ী চলতে হয়। সৎ-আদর্শে সুনিষ্ঠ হ'য়ে তবেই অসৎকে বিনায়িত করা যায়।

কেষ্টদা—আপনি যে দরখাস্ত করার কথা বললেন, তাতে কী লিখতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে fundamentals of our doctrine (আমাদের মতবাদের মূল কথাগুলি) পরিষ্কারভাবে লিখতে হয়। উল্লেখ করা লাগে—আমরা বুঝি—ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একবার্ত্তাবাহী। তাই আমরা প্রত্যেকটি প্রেরিতপুরুষকে মান্য করি। আমরা চাই প্রত্যেকে ঈশ্বরসেবী হোক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হোক, জাতিধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়সম্পদ ও বান্ধব হ'য়ে উঠুক। আমরা চাই প্রতিটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সব দিক-দিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে উঠুক। পাকিস্তানের spiritual (আধ্যাত্মিক), educational (শিক্ষানৈতিক), cultural (সাংস্কৃতিক), economic (অর্থনৈতিক), agricultural (কৃষিগত), industrial (শিল্পগত), social (সামাজিক) development (উন্নতি) যাতে হয়, তার জন্য আমাদের কর্ম্মীরা আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত। আমরা ধর্ম্ম বলতে বুঝি তাই যা' দিয়ে পরিবেশের সকলকে নিয়ে বাঁচাবাড়ার পথে চলা যায়। আমাদের কর্ম্ম ও সেবার পরিকল্পনা ধর্ম্মের এই শাশ্বত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের কল্যাণসাধনই আমাদের লক্ষ্য। আমরা চাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৈত্রী, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্প্রীতি এবং রাষ্ট্রের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সৎসঙ্গের কর্ম্মিগণ সৎসঙ্গের এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য-অনুযায়ী পাকিস্তানে কাজ করার সুযোগ চায়।

(২) আমাদের আদর্শ-অনুযায়ী একটা autonomous university (স্বয়ং-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়) করার পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে আপনাদের help ও sympathy (সাহায্য ও সহানুভূতি) চাই।

(৩) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পবিত্র সেবাভাবপ্রবুদ্ধ আমাদের কর্ম্মিগণ যেন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে।

(৪) পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের বাসিন্দাগণ, তীর্থযাত্রিবৃন্দ এবং আগন্তুক সাধুসন্ত সবাই যেন ঐ পূততীর্থে জীবন, ধনসম্পত্তি, মর্য্যাদা ও সমীচীন স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস ও সাধন-তপস্যা করতে পারে। এজন্য পুলিস-বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। ওখানে নিয়োজিত পুলিসদের ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে প্রয়োজন হ'লে সৎসঙ্গ তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যমত কিছু সাহায্য করতে পারে।

(৫) সৎসঙ্গ-দর্শনকামী তীর্থযাত্রিদের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরদি স্টেশনে কয়েকজন বিশেষ পুলিস-গার্ড নিয়োগের ব্যবস্থা হ'লে ভাল হয়।

(৬) সার্ব্বজনীন তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সব দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন, পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের ওখানে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকা প্রয়োজন।

(৭) আমাদের পরিকল্পিত জ্ঞান, গবেষণা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি-কল্পে সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

(৮) জনকল্যাণমূলক ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সৎসঙ্গ সব রকমের কর থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে সৎসঙ্গ আরো সুষ্ঠুভাবে জনসেবা করার সুযোগ পাবে।

আমি নমুনা-হিসাবে কিছু-কিছু বললাম। প্রসঙ্গতঃ আরো যা' মনে পড়ে গুছিয়ে লিখে দেবেন। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে 'হ্যাঁ' কওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এরপর অনেকেই বিদায় গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় তক্তপোষের উপর শুভ্র শয্যায় ব'সে আছেন। বিজলী-আলোকে তাঁর প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এক অপরূপ শ্রী ধারণ করেছে। ভোলানাথদা (সরকার), অনিলদা (গাঙ্গুলী), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), কিশোরীদা (চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), খগেনদা (তপাদার), চারুদা (করণ), হরেনদা (বসু), সুধীরদা (চ্যাটার্জ্জী), গুরুদাসদা (ব্যানার্জ্জী), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Initiates (দীক্ষিত) খুব বাড়াতে হয়। ধর্ম্মদানের মত, মানুষকে ইষ্টে যুক্ত করার মত বড় কাজ আর হয় না। দীক্ষা নিয়ে যদি মানুষ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ইত্যাদির অনুশীলন ঠিকমত ক'রে চলে

তবে শুধু তার ভাল হয় না, তার আওতায় যারা থাকে তাদেরও ভাল হয়। তাই initiates (দীক্ষিত)-দের খুব ভাল ক'রে nurture (পোষণ) দেওয়া লাগে। আর, রোজ তিন টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করবে, এমনতর special (বিশেষ) দেড়-লাখ লোক দীক্ষা দেওয়াই চাই। এটা কঠিন কাজ কিছু না। কিন্তু এর ফলে অসম্ভব কাণ্ড হ'য়ে যেত। ইষ্টীপূত জনবল ও ধনবলের সুধী ও সুকৌশল প্রয়োগে ভারত ও পাকিস্তানের বহু অমঙ্গলের মুলোচ্ছেদ করা যেত। দেশ ভাগ হোক আর যাই হোক, এ-কথা ঠিকই, ভারত ও পাকিস্তানের সত্তা ও স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তাই, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিবন্ধন যাতে ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে ওঠে, সে-চেষ্টা করাই লাগে। মঙ্গল-বুদ্ধি যাতে প্রতিপ্রত্যেককে পেয়ে বসে তাই করা লাগে। আচরণ ও চরিত্র-সমন্বিত যাজন চাই এন্তার। লাগ ভেলকি লাগ, লাগ ভেলকি লাগ—এই ধরণে ভালর নেশা চারিয়ে দিতে হয়।

প্রফুল্লদা—আপনি একের পর এক কাজের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু করার দিক্-দিয়ে আমরা তো বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Brain (মস্তিষ্ক) তো আর ব'সে থাকে না, সে তো বাঁচা-বাড়াকে sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে না। প্রত্যেক অবস্থাতেই সে বুদ্ধি খাটিয়ে উপায় উদ্ভাবন করে। কিন্তু যত মোক্ষম উপায়ই উদ্ভাবিত হোক না কেন, সেটাকে যদি কাজে ফলিয়ে তোলা না যায় তাহ'লে তো তা' নিষ্ফল। কাম-করণেওয়ালা তো তোমরা।

প্রফুল্লদা—যেমনতর দেড়লাখ লোক দীক্ষা দেবার কথা বলছেন, সে-সম্বন্ধে আমাদের দিয়ে কতটা কী হবে তা' আপনিই জানেন। আমাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা কতটুকু সবই তো আপনার জানা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানি, আবার এও জানি চেষ্টা করলে তোমরা পুরোটাই পার। আমার দেখা আছে—করলেই পার। যদি না কর, সেই না করার সঙ্গে যে কতখানি suffering (দুর্ভোগ) জড়িত আছে, তা' পরে বুঝবে। পরিবেশের জন্য আমাদের যা' করণীয়, তা' না করলে আমরা কখনও ভাল থাকতে পারি না।

প্রফুল্ল—পরমপুরুষের প্রদত্ত শক্তির জোরে সাধারণ মানুষকেও বহু অসাধারণ কাজ করতে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সবাইকে শক্তি দিয়েই রেখেছেন। যতই অনুশীলন করা যায় ততই শক্তি বেড়ে ওঠে। আবার, পরমপুরুষের উপর যার ভাব যত প্রগাঢ় হয়, সে ততই অফুরন্ত শক্তির জোগান পায়। ভাব থাকা মানে তাঁর চাহিদামত হ'য়ে ওঠা, নিজের চলন-চরিত্রকে সেইভাবে গ'ড়ে তোলা। তাই,

তাঁর প্রতি ভাব হ'লে অর্থাৎ তাঁর মনোমত হ'য়ে উঠলে, মানুষের আর কোন অভাব থাকে না। তার চরিত্রই তাকে সব পাইয়ে দেয়। ভাব কথার মানে হওয়া।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কৃষ্টিপ্রহরী ও সংগঠনী মিলে monthly (প্রতিমাসে) ২৫,০০০ টাকা আস্‌লে publicity (প্রচার)-টা জোর চালান যেত। এটা কি আমার আজকের কথা? আমাদের চেষ্টাটা ফসকান রকমের, তাই সময়মত ক'রে উঠতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় চুপ রইলেন।

তারপর প্রফুল্লদার কাছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—সিউড়ী সহরের কাছে আমাদের একটা বাড়ী করলে কেমন হয়?

প্রফুল্লদা—ভাল হয়। তবে আশ্রম করতে গেলে হরিপুর ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিপুরেও একটা stronghold (সুরক্ষিত স্থান) করা লাগে।

প্রফুল্লদা—একজন দাদার সঙ্গে আমার একটু খাপ খায় কম। আমার আবার একটু চটার স্বভাব আছে কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চটলে যদি কাম হাসিল হয়, সে চটার দাম আছে। নইলে বেফয়দা চটবা ক্যান? তুমি কি বেকুব নাকি? আর, মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়ে নিতে হয়। প্রত্যেকটা মানুষের চেহারাই আলাদা, তার মানে, মনের জগতেও একজনের সঙ্গে আর একজনের অতোখানি পার্থক্য আছে। তাই, খাপ খাওয়াতে গেলে অনেকখানি ছেড়ে-ছুড়ে নিতে হয়। তোমার দোষগুলি অপরে যদি কিছুটা বরদাস্ত না করত, তাহ'লে তুমি দাঁড়াতে কোথায়?

প্রফুল্লদা—অনেক সময় কঠিন কাজে আশাতীত সাফল্য লাভ করা যায়, আবার সহজ কাজটা পারা যায় না, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যথাসময়ে বিধিমাফিক করলে কঠিন কাজেও success (সাফল্য) সহজ হয়, আর যে-সময়ে যেভাবে যা' করবার তা' না করলে সহজটাও কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। Time and tactics (সময় ও কৌশল) ignore (উপেক্ষা) করলে কাজ হয় না। Step by step (ধাপে-ধাপে) যখন যা' করণীয়, তা' নিখুঁতভাবে কাঁটায়-কাঁটায় ক'রে যেতে হয়। Time and tactics (সময় ও কৌশল)-এর proper use (বিহিত প্রয়োগ) না হ'লে যেখানে হয়তো মানুষ enormously successful (বিপুলভাবে কৃতকার্য্য) হবে, সেখানে হয়তো তার উল্টো হ'য়ে যায়। প্রভূত করাও নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

প্রফুল্লদা—যখন যা' করণীয়, তখনই তা' করা—এই অভ্যাসটা কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নীর একটা নীতিই তো ওই। স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি যে চরিত্রে গেঁথে ফেলতে পারে তার আর ভাবনা নেই। তাকে যে-কোন অবস্থার ভিতর ফেলে দাও তার ভিতর-থেকেই সে জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসবে।

একজন বললেন—দেখেছি অনন্যমনা না হ'লে আপনার কাজ করা যায় না।

প্রফুল্লদা—সে কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, আমার নির্দ্দেশিত কোন কাজ করতে গিয়ে তুমি ক্রমাগত বাড়ীর অভাবের কথা ভাবছ। ভাবছ ২৫টা টাকা বাড়ীতে পাঠাতে পারলে হ'ত। কেবল ঐ চিন্তা করছ, অথচ ক্ষমতা নেই। ঐ চিন্তা ক'রে ক্লিষ্ট হচ্ছ, তার ফলে কাজের শক্তি ও উৎসাহে ভাটা পড়ছে, কাজও কামাই হ'চ্ছে। এমনি ক'রে তোমার যোগ্যতা ক'মে যাচ্ছে। তার মানে যোগ্যতাবৃদ্ধির ফলে যে ২৫ টাকা তুমি হয়তো সত্বরই পেতে পারতে, তা' পাওয়ার পথ তোমার পিছটানের ফলে সঙ্কীর্ণই হ'তে চললো। ষোল আনা মন নিয়ে অপ্রত্যাশী হ'য়ে ইষ্টকাজে রত থাকলে একমাসে তুমি যে-সামর্থ্য অর্জ্জন করতে পারতে, ভাঙ্গা মন নিয়ে মাসের পর মাস কাজ ক'রেও হয়তো সে-সামর্থ্য অর্জ্জন করতে পারলে না। যা' করলে অভাব ঘোচে, তা' হয়তো আদৌ করতে পারলে না, অভাবই ঘুচলো না। তোমার obsession (অভিভূতি) তোমার অভাবকে কায়েম ক'রে রাখলো। আবার, তোমাকে দিয়ে যতখানি কাজ হ'তে পারত, তাও হ'ল না। একমনা না হ'লে এই রকম হয় আর কি !

প্রফুল্লদা—আমি যখন বাড়ীর অভাবের কথা বলেছিলাম, আপনি বলেছিলেন আপনার কাজ নিয়ে থাকতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যেমন যতখানি করেছ, তেমন ততখানি হয়েছে। পরমপিতার কাজ করতে গিয়ে নিজের কতখানি উপকার হয়েছে, তা' নিজে হয়তো ঠিক পাও না। মন দিয়ে আরো করলে আরো হ'ত। প্রত্যেকে একটা ক'রে সরষে ফেলে দিলে উবরে যেত।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে বাইরে গিয়ে বসলেন। নীল আকাশে তারার মালা। শ্রীশ্রীঠাকুর ইজিচেয়ারে ব'সে কৌতূহলভরে আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। তাঁর খালি-গা, গলায় পৈতেটি ঝুলছে, পরণে একখানি শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে একজোড়া কালো চটি। সাদামাঠা বেশ, অথচ কী অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। বসার ভঙ্গীটি কী চমৎকার ! উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির

সঙ্গে যেন একাত্ম হ'য়ে ব'সে আছেন। দেখলেই বিরাটের অনুভূতি জাগে মনে।

একটু পরে যতীন দর্জ্জিদা (শীল) এসে প্রণাম ক'রে একপাশে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সস্নেহে বললেন—তুই তো আমার কোপেই অস্থির, অবশ্য সে-কোপের ফল আছে। কিন্তু তুই comply (পূরণ) করার পারলে হয়। শুনলাম কাল তুই সারাদিন না খেয়ে ব'সে সেলাইয়ের কাজ করেছিস। তাই মনে হচ্ছিল, আরো কয়েকজন সৎসঙ্গী assistant (সহকারী) যদি নিয়ে আসতে পারতিস, ভাল হ'ত। তা' না হ'লে তো আমার ঠেলা সামাল দিতে পারবি না। তোর কাজও চলে, কষ্ট না হয়, আরো ক'জনও কাজ ক'রে খেয়ে বাঁচে, কাজের অর্ডারগুলি সব comply (পূরণ) করতে পারিস—তাহ'লে বেশ হয়। আমার কাছে কতজন ব'লে গেছে। বেশ expert (দক্ষ) তারা, ভাল কাজ জানে।

যতীনদা—আজ্ঞে দেখি কী করা যায়।

একজনের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হ'ল—তার যেন আদৌ শান্তি নেই, মনে কত কষ্ট!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট কিসের জন্য? যা' করার তা' না করার দরুনই বোধহয় কষ্ট। আমি যা' বলি তা' করলে যে ধীরে-ধীরে সব হয়, কোন সমস্যারই যে সমাধান হ'তে বড় একটা বাকী থাকে না (অবশ্য যে ক্ষেত্রে যতদূর যা' সম্ভব), তা' বোঝে না, তাই করে না। কিন্তু যাতে কষ্ট ঘোচে, তাই-ই তো করতে বলি আমি।

২৮শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৫৪ (ইং ১০।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালবেলায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। প্রখর তপনতাপে চতুর্দ্দিক উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় ধূলিবালি ও ঝরাপাতার ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। আর তরুবীথির মধ্যে জেগে উঠেছে একটা অশান্ত হাহাকার। অশ্বত্থের শাখায় নানাজাতীয় পাখী এলোমেলো ভাবে কিচির-মিচির করছে। কেমন যেন একটা মন উতলা-করা পরিবেশ। কিন্তু এরই মাঝে স্থির, ধীর, শান্ত, সমাহিত, আনন্দমগ্ন হ'য়ে ব'সে আছেন দয়াল আপন আসনে। বাইরের উত্তাল আবহাওয়ার দিকে তাঁর যেন কোন খেয়ালই নেই। কিংবা হয়তো তাঁর সর্ব্বাত্মক ভালবাসা ও ভাললাগার কাছে প্রকৃতির এই উথাল-পাথাল রকমও প্রীতিপ্রদ ও উপভোগ্য হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই, যা' আমাদের উদ্বেজিত করছে, তাই-ই হয়তো তাঁকে উল্লসিত

ক'রে তুলছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), গোপেনদা (রায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), নরেশদা (দাস), মণিদা (কর), বীরেনদা (মিত্র), চিত্তদা (মণ্ডল), হরেনদা (বসু), শৈলেশদা (বিশ্বাস), অশ্বিনীদা (দাস), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), সরোজিনীমা, কালি-ষষ্ঠীমা, কালিদাসীমা, সৌদামিনীমা, সেবাদি, দক্ষদি, ননীদি, বিজয়দার মা, সুরবালামা, অমূল্যদার মা, শৈলমা, জ্যোতি, খুকু, কুমুদ, খোকন প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে আছেন। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উঠছে। এবং দয়াল আনন্দবিভোর হ'য়ে কথা ব'লে চলেছেন। তাঁর অপার্থিব প্রীতিসুবাসসুরভিত সুখসান্নিধ্যে ভক্তবৃন্দ যেন সুধাসায়রে অবগাহন ক'রে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—কালিদাসের প্রায়গুলি বই-ই আদর্শ বিবাহ সম্বন্ধে লেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও'রা কাব্য লিখেছেন সমাজকে কল্যাণের পথে, শুভ-সুন্দর জীবনের পথে, আনন্দের পথে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য। শ্রেয়তপা ভাল-বাসাই সার্থক সৃষ্টির উৎস। আর, ঐ ভালবাসা ভালমন্দের বাস্তব দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে ভালই চায়, ভালই খোঁজে, ভালই করে আর ভাল যাতে প্রতিষ্ঠা পায় সত্তার আবেগ নিয়ে তাই-ই ক'রে চলে। যাদের এই মূলধন নেই অথচ ambition-এর (গর্ব্বেপ্সার) তাড়নায় বা প্রতিভার দম্ভে যারা সৃষ্টিমূলক কাজে হাত দেয়, তাদের বোধের খাঁকতি থাকে ঢের। তাই, তাদের অবিন্যস্ত অবদানের ফলে অনেক সময় সমাজের উপকার না হ'য়ে অপকার হয়।

কেষ্টদা—অনেকে বলেন, Art for art's sake (শিল্পকলা শিল্পকলার জন্য)। কোন শিল্প-সৃষ্টি যদি শিল্পের দাবী মেটায়, তা' যদি রসোত্তীর্ণ হয়, তাহ'লেই হ'ল। অন্য কোন প্রয়োজন বা মানদণ্ডের অবতারণা সেখানে অবান্তর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, art-এর (শিল্পের) সঙ্গে life-এর (জীবনের) কোন contradiction (বিরোধ) নেই, বরং সত্তাকে সরস ও পরি-পুষ্ট ক'রে তুলতে প্রেরণা জোগায় ব'লেই আর্টের কদর। যে-শিল্পসৃষ্টি জীবন-রসকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে না, তা' রসোত্তীর্ণ শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের কথা আপনাদের কাছে যা' শুনি তাতে ওর মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক দোষ, দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তির দিকটা অনুদঘাটিত থাকেনি, কিন্তু সবগুলির কেমন মঙ্গলমধুর পরিশুদ্ধি ও পরিণয়ন দেখান হয়েছে ভেবে দেখেন তো! শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের মনে যখন চাঞ্চল্য জেগেছে, তখন একবার তার মনে হয়েছে হয়তো শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা, তাই তার

সম্বন্ধে কোন কামনার ভাব মনে জাগা ঠিক নয়। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য কমে না দেখে সে সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছে যে শকুন্তলা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কন্যা। কারণ, তার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে তাঁর সুশাসিত মন কোন ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি ধাবিত হ'তে পারে না। এই ছোট্ট ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে ধরা পড়ে তখনকার culture (কৃষ্টি) ও character-এর (চরিত্রের) tone (সুর) কী ধরণের ছিল। প্রতিলোম-বিরোধী চিন্তাধারা যে মানুষের কতখানি সত্তাগত ছিল, তা' এ থেকে বোঝা যায়।

কেষ্টদা—কে. এম. মুন্সী বলেছেন যে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষারই একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমারও মনে হয়, সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ না করলে আর্য্যকৃষ্টি-সম্বন্ধে ধারণা গজান সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অপূর্ব্ব মোহন ভঙ্গিতে হাতখানি নেড়ে বললেন—আমিও তো তাই বলি, State-language (রাষ্ট্রভাষা) করতে গেলে সে ঐ সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ঐ ভাষায় লেখা ও বলা সড়গড় হ'য়ে ওঠে। সংস্কৃতের জ্ঞান বাড়লে প্রাদেশিক ভাষাগুলিও enriched (সমৃদ্ধ) হবে।

প্রমথদা—জয়রামদাস দৌলতরামও ঐ ধরণের কথা বলেছেন।

শরৎদা—গীতায় আছে, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই।) এর মধ্যে 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর নীতিবিধি ও দর্শনের আচরণসমন্বিত যাজনে সারা জগৎটাকে যদি flood (প্লাবিত) ক'রে দেওয়া যায়, মানুষগুলিকে দীক্ষিত ক'রে যদি তাঁর পথে চালিত করা যায়, তাহ'লে দুষ্কার্য্য করার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের ক'মে যায়। তিনি যখন আসেন তখন তাঁকে দেখে, তাঁকে ভালবেসে মানুষের সৎ অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধিদ চিন্তা ও কর্ম্ম বেড়ে যায়, আর ঐটে যে-পরিমাণে বেড়ে যায়, অসৎ-প্রবণতাও সেই পরিমাণে নষ্ট হয়। এই আমি যা' বুঝি। কেউ সাবাড় হ'য়ে যাক তা' তিনি চান না। তিনি বাঁচাতেই চান, বাঁচাতেই চেষ্টা করেন। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কিন্তু মানুষের কর্ম্ম যেখানে তার বাঁচার পথ একেবারে রুদ্ধ ক'রে দেয় সেখানে তিনি কী করবেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যাতে না হয়, সে জন্য তো তিনি কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু দুর্য্যোধনের দল তাঁকে সে-সুযোগ দিল কই? তাই, তার ফল যা' হবার তা' হ'ল।

শরৎদা—পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারী বোধহয় কখনও নিঃশেষ হয় না। কতকগুলি

দুষ্টলোক থাকেই, যাদের নেশা হ'ল অপরের ক্ষতি করা। এর থেকে ত্রাণ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকে, তবে ভালর majority (সংখ্যাধিক্য) যদি হয়, তারা যদি stronger (বলবত্তর) হয় আর মন্দ যদি নিষ্প্রভ হ'য়ে থাকে ভালর কাছে, তাহ'লে ক্ষতি হয় না। প্রতিলোম সন্তান treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হয়। তাদের শোধরান সুকঠিন। বেণরাজা নাকি প্রতিলোম বিবাহ প্রচলন করেছিল, তার আগে নাকি প্রতিলোম ছিল না। কিন্তু সেই থেকে প্রতিলোম আর গেল না। মন্দ মানে passionate craving (প্রবৃত্তিপরায়ণ লালসা)। আমরা মৃত্যু চাই না, কিন্তু মৃত্যুর চলনায় চলি। ভগবানের আর এক নাম বিধি। আমরা যেমন করব, যেমন চলব, ফলও পাব তেমন। এর থেকে রেহাই নেই। তবু পরমপিতা দয়া ক'রে সর্ব্বদা আমাদের অজস্রভাবে রক্ষা করেন, তাই বাঁচোয়া। নইলে, আমাদের ভুলত্রুটির কি অন্ত আছে ? ভুলত্রুটি যথাসম্ভব এড়িয়ে কল্যাণের পথে চলা লাগে। আবার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঠিকভাবে ঋষি-অনুশাসিত পথে চলেন এবং অন্যকেও সেইপথে পরিচালিত করেন তবে কল্যাণের পথ অনেকখানি খোলা থাকে। তাঁরা যে-জিনিস ভাল ক'রে জানেন না বা বোঝেন না, সে-সম্বন্ধে তাঁদের বরং silent (নীরব) থাকা ভাল, কিন্তু প্রবৃত্তি বা খেয়ালের বশে তাঁরা যদি vital truth (জীবনীয় সত্য)-কে ignore (অবহেলা) ক'রে চলেন এবং অন্যকেও সেই পথে চলতে উৎসাহিত করেন, তাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়।

আজ আমাদের দেশে এমন বহু বিরাট-বিরাট নেতা আছেন, যাঁরা বর্ণ ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষপাতী, প্রতিলোম-বিবাহ চালু করার ব্যাপারে যাঁদের অঢেল আগ্রহ। কিন্তু তাঁরা এইটুকু বোঝেন না যে এর ফলে ভবিষ্যৎ জাতকদের সেই সব gene (জীন)-ই নষ্ট হ'য়ে যাবে, যেগুলি থাকার ফলে কিনা মানুষ প্রকৃত মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে এবং নিজের ও পরিবেশের কল্যাণ করতে পারে। এ যে কতবড় ক্ষতি, তা' ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

শরৎদা—হিন্দুধর্ম্ম এমনই বিরাট ব্যাপার যে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্‌টা গ্রহণীয় ও কোন্‌টা বর্জ্জনীয় তা' নির্দ্দিষ্টভাবে ধরা যায় না। বহু বিরুদ্ধ জিনিসের নজির ও সমর্থন শাস্ত্রে-পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণাদি পড়লে বোঝা যায় যে রকমারি ধরণের সুপ্রথা, কুপ্রথা দুই-ই তখন প্রচলিত ছিল সমাজে। তার ভিতর-থেকে যার যেমন পছন্দ সে তেমন বেছে নিয়ে ঐ সবের দোহাই দিতে পারে। যে-ঋষি গোমাংস খাওয়া নিষেধ করেছেন, তাঁর জীবনে তিনিই হয়তো গোমাংস খেয়েছেন। এই সব কারণে মানুষ দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। এমন অবস্থায় পথ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান ও বোধটা চলার অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে ক্রমান্বয়ে evolve ক'রে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে) উঠেছে। আবার, সব কালেই passionate (প্রবৃত্তিপরায়ণ) মানুষ থাকে, যারা ইচ্ছা ক'রেই ধর্ম্মবিধি উল্লঙ্ঘন ক'রে স্বেচ্ছাচারী চলনে চলে। তাদের ঐ চলন অনুসরণযোগ্য নয়। এক-জনের প্রথম জীবন হয়তো অল্পবিস্তর ভুলত্রুটির ভিতর-দিয়ে কেটেছে, পরে তিনিই হয়তো সাধনার ভিতর-দিয়ে ঋষি হয়েছেন। তিনি ঋষিপদবাচ্য হয়েছেন ব'লে যে তাঁর প্রথম জীবনের ভুলত্রুটি সমর্থনীয়, তা' কিন্তু নয়। ঋষিত্বেরও রকমারি আছে। হেনরী ফোর্ড industrial world-এ (শিল্পজগতে) যে insight (অন্তর্দৃষ্টি) ও integrated experience (সংহত অভিজ্ঞতা) লাভ করেছিলেন, সেও এক-ধরণের ঈষৎ ঋষিত্ব। তা' যতটুকু, ততটুকু। সেইজন্য পুরাণ-ইতিহাসে ঋষি ব'লে যাঁদের উল্লেখ আছে, তাঁরা সবাই কিন্তু এক পর্য্যায়ের নন। সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন, বৈশিষ্ট্যপূরণী, সত্তাসম্বর্দ্ধনী জ্ঞান ও বোধ যাঁদের খুলে যায়, তাঁরাই শাশ্বত ও অভ্রান্ত বিধান দান করতে পারেন। সপরিবেশ বাঁচাবাড়াটাই কাম্য, তা' স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী যেখানে যেমন ক'রে হয়। আবার, কে কোন্ অবস্থায়, কেন, কী উদ্দেশ্যে কী করেছেন বা কী বলেছেন তা' না বুঝে মোতফারাক্কা একটা conclusion (সিদ্ধান্ত) করা ঠিক নয়। ধরেন, আমি experiment (পরীক্ষা)-হিসাবে একসময় মাছ খেয়ে দেখেছি তার ফলাফল কী হয়, হাতে-কলমে তা' জানা ও বোঝার জন্য। তা' থেকে যদি কেউ infer (অনুমান) করে যে আমি মাছ খাওয়ার পক্ষপাতী, তাহ'লে তা' কি ঠিক হবে? আবার, অনেক তত্ত্ব রূপকের আকারে বা সাঙ্কেতিকভাবে হয়তো দেওয়া আছে, তার তাৎপর্য্য rationally (যুক্তিযুক্তভাবে) ও scientifically (বৈজ্ঞানিকভাবে) unfold (প্রকাশ) করা লাগে। নইলে বোঝা যায় না। সেই জন্য ঐ সব মন্থন ক'রে লোকের পক্ষে যা' অনুসরণীয় ও কল্যাণকর তা' মরকোচ-সহ সবার সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা লাগে। কোন্ জিনিসটা কেন করণীয় আবার কোন্ জিনিসটা কেন অকরণীয় তার কারণ দেখিয়ে দিতে হয়। Solved man (সমাধানপ্রাপ্ত মানুষ) যিনি, তাঁর কাছে সব place (উপস্থাপন) ক'রে জেনে-বুঝে নিতে হয়। আপনাদের উপর পরমপিতার দয়াও যেমন অঢেল, আপনাদের দায়িত্বও তেমনি অসীম।

বাইরে থেকে সদ্য-আগত একটি দাদাকে দূর থেকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে প্রাণকাড়া ডাক দিলেন—কি রে! কী খবর? কখন আলি?

দাদাটি আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উত্তর দিলেন—এই এখনই আসলাম।

হাতে একটি থলে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওতে কী রে?

উক্তদাদা—কিছু পটল ও আমের গুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে বললেন—জবর মাল আনিছিস! যা; বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

দাদাটি একটি বেঞ্চির উপর থলিটি রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে পটল ও আমের গুটি দিয়ে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তোদের সব খবর ভালতো?

উক্ত দাদা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় উঠিছিস?

উক্ত দাদা—গেষ্ট হাউসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। সাবধানে থাকিস। রাত জেগে গাড়ীতে আসিছিস, সকাল-সকাল স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নে গা। পরে তোদের ওদিককার গল্প-টল্প শুনবো নে।

দাদাটি অল্পক্ষণ পরে প্রণাম ক'রে পুলকিত অন্তরে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়াটার উপর নয়নাভিরাম ছন্দে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শরৎদার দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন—আমি সুশীলদা, কেষ্টদাকে বলেছি, আপনাকেও বলছি এমন একটা প্রতিলোম সন্তান বের করুন তো যে সত্যি বড় হয়েছে। ওরা তো পায়নি, আপনি দেখতে পারেন খোঁজ ক'রে।

শরৎদা—চোখে তো পড়ে না।

একটু পরে শরৎদা আবার বললেন—আমার মনে হয় nature-এর (প্রকৃতির) মধ্যে normally (স্বাভাবিকভাবে) অনুলোম-trend (ধারা) দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও তো তাই মনে হয়। প্রকৃতি চায় আমাদের বাঁচা-বাড়ার urge (আকূতি)-কে fulfil (পূরণ) করতে। প্রতিলোম তার পরিপন্থী।

সহজাত-সংস্কার, বংশগতি এবং শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Hereditary instinct (বংশানুক্রমিক সংস্কার)-গুলি যাতে unfurled (প্রসারিত) হয়, তেমনভাবে education (শিক্ষা) দিতে হয়। কুলাচার, কুলগত জীবিকা ও কুলবৈশিষ্ট্যানুগ বিবাহ ঠিক থাকলে সহজাত-সংস্কারগুলি তাজা ও তরতরে থাকে। তদুপরি উপযুক্ত শিক্ষার ভিতর-দিয়ে ও-গুলি যদি nurtured (পরিপোষিত) হয়, তাহ'লে মানুষ বেশ করিৎকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে পারে। শিক্ষাটাও তাতে সার্থক ও আনন্দদায়ক হয়। ঝোঁক বুঝে শিক্ষা দিতে পারলে শিক্ষার আদান-প্রদান ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছেই উপভোগ্য হয়। যে যা' হ'য়ে ওঠার জন্য জন্মেছে, তাকে তাই ক'রে তুলতে সাহায্য

করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। একটা শিয়ালের বাচ্চা আর একটা কুত্তা দেখতে এক-রকমের হলেও তাদের কখনও একইভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। শিয়ালের বাচ্চাকে কুত্তা করা যাবে না, তাকে বরং ভাল শিয়াল করতে চেষ্টা করতে হবে। কুত্তার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। প্রত্যেকের শিক্ষা হওয়া চাই তার মত ক'রে। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যে বুঝতে ও ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে সেই প্রকৃত অভিভাবক, সেই প্রকৃত শিক্ষক, সেই প্রকৃত লোক-পরিচালক।

এরপর অনেকেই বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাত্রে পূজনীয় বড়দা গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আজ রে'র সঙ্গে ধূর্জ্জটি ও ভোলানাথদার একটা তর্ক বেধেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন—কী তর্ক ?

বড়দা—রে বলছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর যা' যা' করেন, তা' করা লাগবে। আর ওরা বলছিল—তা' নয়, তিনি আমাদের যা' করতে বলেন, তাই করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে বললেন—My life is my materialised maxim (আমার জীবন হ'ল সদুক্ত নীতির বাস্তবায়িত রূপ)। আমি যা' করি না, তা' আমি কখনও করতে বলি না। সে-বলায় life (জীবন) থাকে না। তাই, আমি যা' বলি তা' করতে গেলে আমি যা' করি, তা' করতে হবে।

প্রফুল্ল—ভোলানাথদাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা বোধহয় এইরকম। বহু জিনিস আছে যা' ঠাকুরের পক্ষেই করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে-সব করতে যাওয়া বিপজ্জনক। ঠাকুর একটা distorted (বিকৃত) মেয়েছেলেকে নানা কায়দাকরণ ও প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে শুধরে তুলতে পারেন। কিন্তু তাঁর দেখাদেখি আমার মত দুর্ব্বল চরিত্রের মানুষ যদি অমনতর কাজ করতে যায়, তাহ'লে অপরের সংশোধন তো হবেই না, বরং নিজের সর্ব্বনাশ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করতে হ'লে আমি যেভাবে above-এ (ঊৰ্দ্ধে) থেকে করি, সেইভাবে করতে হবে, নচেৎ হিতে বিপরীত হবে। আবার, ঐ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে যদি কেউ ঠিকভাবে করতে পারে, সেও successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারে।

২৯শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৪ (ইং ১১।৪।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন। কতকগুলি চড়াই পাখী খুব কিচির-মিচির সুরু করেছে এখানে এসে। রেণুমা সেগুলিকে তাড়াতে চেষ্টা করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুই বড় বেরসিক।

রেণুমা কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা আনন্দে খেলাধূলা করছে, সে-আনন্দ তো উপভোগ করতে পারছিসই না, উপরন্তু ওদের আনন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিস। ফলে নিজেও বঞ্চিত হ'চ্ছিস, ওদেরও বঞ্চিত করছিস।

রেণুমা—কান যে ঝালাপালা ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের স্ফূর্ত্তিটা যদি feel (অনুভব) করতে পারতিস তাহ'লে দেখতে পেতিস ঐ ঝালাপালাটা কত মিষ্টি লাগে। পরমপিতা আমাদের জীবন-সম্বেগকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য কতরকম ব্যবস্থা যে ক'রে রেখেছেন, তার লেখা-জোখা নেই। আমরা সে-সব দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না, বুঝেও বুঝি না। তাই আমাদের জীবনসম্বেগ ও বোধৈশ্বর্য্য খাটো হ'য়ে থাকে।

প্রফুল্ল—আপনি যা' বললেন, তা' মোটামুটি বুঝেছি, কিন্তু খুব ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Power of observation and sympathetic appreciation (পর্য্যবেক্ষণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ গুণগ্রহণের ক্ষমতা) যার যত বেড়ে যায়, সে তত নানা বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। ধর, কারও যদি ফুল-সম্বন্ধে active interest (সক্রিয় অন্তরাস) থাকে, তাহ'লে সে কিন্তু ফুলের অস্তিত্বসন্দীপী অবদান, চৈতন্যসন্দীপী অবদান ও আনন্দসন্দীপী অবদান নিজ সত্তায় আত্মীকৃত ক'রে নিজেকে অতখানি সমৃদ্ধ, বোধবান্ ও পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে পারে। মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) থেকে নিজের interest-এর (অন্তরাসের) range (বিস্তার) যত বাড়াতে পারে ততই ভাল। যদি কেউ তোমার প্রতি শত্রুর মত আচরণ করে তাহ'লেও তুমি তার সম্বন্ধে loving interest (প্রীতিপূর্ণ অন্তরাস) বজায় রেখে চ'লো—নিজ অস্তিত্বকে বিপন্ন হ'তে না দিয়ে। কারণ, appreciative mood (গুণগ্রহণমুখর মনোভাব) থাকলে তার দোষগুণ সব নিয়ে তুমি তাকে যথাযথভাবে বুঝতে পারবে, এবং বিহিতরকমে চ'লে তাকে তোমার প্রতি favourable (অনুকূল) ক'রে তোলাও তোমার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে। যে যাই করুক কাউকে যদি আমি শত্রু ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত হই, তাহ'লে ঐ ভাবাটাই কিন্তু তার সঙ্গে আমার মৈত্রী-সংঘটনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! আমি অনেক সময় দেখেছি যে যারা আমার প্রবৃত্তিচলনে বাধা দেয়, তাদের আমি শত্রু মনে করি, এবং যারা তাতে প্রশ্রয় দেয়, তাদিগকে আমি আপনজন ব'লে গ্রহণ করি। প্রথমটা বুঝতে পারি না, কিন্তু পরে বুঝতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে যে বুঝতে পার, এটা পরমপিতার দয়া। Egoistic passionate obsession (অহঙ্কারপূর্ণ প্রবৃত্তি-অভিভূতি) যখন আমাদের অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধ'রে থাকে, তখন আমাদের বোধ ও বুদ্ধি ঐ obsession-এর (অভিভূতির) হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করে, ঐ দুর্ব্বলতার সমর্থন ও পরিপোষণেই তারা নিযুক্ত ও পরিচালিত হয়। Insane ego (অপ্রকৃতিস্থ অহং) যে কী করতে পারে আর না পারে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের হীনমন্য জিদ বজায় রাখার জন্য সে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করতে পারে। আবার, নিজের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য সে যে-কোন হীন ও নৃশংস কাজ করতে পারে। তাই নিজের inferiority (হীনমন্যতা)-কে কখনও প্রশ্রয় দিয়ে rigid (অনমনীয়) ক'রে তুলতে নেই। ও বড় সর্ব্বনাশা জিনিস। জেনো, যে নিজ ইতর অহঙ্কারকে সদাসর্ব্বদা নিম্মর্মভাবে শাসন করতে প্রস্তুত নয়, সে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিজের সঙ্গেই শত্রুতা ক'রে চলেছে। শুধু অহং কেন, প্রত্যেক প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেই এই কথা। হিসাব ক'রে চ'লো।

প্রফুল্ল—কোন শক্তিমান্ মানুষ যদি চায় যে আমরা তার ইতর অহং-এর তাঁবেদারী করি, সেখানে আমাদের করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র আমাদের করণীয় হ'ল ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়ে হীন আত্মস্বার্থের জন্য কারও চাটুকার হওয়া ভাল নয়। ওতে মানুষ ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব হারায়। কিন্তু স্বার্থপ্রত্যাশাহীন হ'য়ে কোন অহঙ্কারী মানুষের বাস্তব সদ্‌গুণ যেগুলি আছে, সেগুলির জন্য তাকে সমীচীনভাবে প্রশংসা ক'রে, তার সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন ক'রে তাকে যদি সুকৌশলে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে তোলা যায়, তাতে ভাল বই মন্দ হয় না। ইষ্টার্থী হ'য়ে সুদক্ষ নটের মত চলতে হয়। যেখানে, যার সঙ্গে, যখন, যে কায়দায়, যে-ব্যবহার করলে ইষ্টার্থ অর্থাৎ সকলের সত্তাপোষণী মঙ্গল অব্যাহত থাকে, তাই করা লাগে। একটা অহঙ্কারী মানুষকে না চটিয়ে তুলে তার প্রতি স্বার্থান্বিত হ'য়ে তাকে আপন ক'রে নিয়ে psychologically (মনোবিজ্ঞান-সম্মতভাবে) mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা করলে ফল ভাল হয়। অবশ্য কেউ যদি ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সেখানে অদ্রোহভাব বজায় রেখে তার প্রতিকারের জন্য যা' করণীয় করা লাগে। অসৎ-নিরোধ করতে গিয়ে নজর রাখা লাগে যাতে মানুষটাকে win (জয়) করা যায়, asset (সম্পদ্) ক'রে তোলা যায়। যাকে friendly (বন্ধুভাবাপন্ন) ক'রে তোলা সম্ভব, তাকে hostile (শত্রুভাবাপন্ন) ক'রে রাখা মানে নিজের ক্ষতি আমন্ত্রণ করা।

সুশীলদা—কোন মানুষ যদি জন্মগতভাবে অসৎ হয়, তাকে কি ফেরান যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love does not consider anything impossible (ভালবাসা কোন-কিছুকে অসম্ভব ব'লে মনে করে না)। আমি যদি কাউকে ভালবাসি, তাহ'লে এ-কথা মনে করব না যে তা'র পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব। জৈবী-সংস্থিতির বাধার দরুন একজীবনে একজনের আমূল পরিবর্ত্তন না হ'লেও শ্রেয়-সংশ্রবের প্রভাবে তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনের আগ্রহ আসা খুবই সম্ভব। ঐ ভাববীজ তা'র জন্মজন্মান্তরে কী বিরাট রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারে, তা' কি আমরা কল্পনা করতে পারি ? তাই, হতাশ না হ'য়ে মানুষকে প্রত্যাশা-হীন হ'য়ে অতন্দ্রভাবে ভালবাসতে হয়, সেবা দিতে হয়, প্রত্যেককে তা'র মত ক'রে ইষ্টে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—আত্মরক্ষায় সজাগ থেকে। পরমপিতার দায় যদি মাথায় নিয়ে চলতে চান, তবে নিজের ও পরিবেশের পরিশুদ্ধিসাধনে বদ্ধ-পরিকর হ'তে হবে আপনাদের। অপরকে দোষ দিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে আনন্দবাজার পত্রিকা প'ড়ে শোনান হ'ল। আজ কাগজে বেরিয়েছে ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে প্রস্তাব উঠেছে মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৈষয়িক কোন ব্যবস্থা করতে গেলে তিনটে consideration (উদ্দেশ্য) answer (পূরণ) করে কিনা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে—selfish consideration (স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য) অর্থাৎ ব্যবস্থাটা বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ পরিবার, বিশেষ সমাজ বা বিশেষ দেশের প্রকৃত ও স্থায়ী স্বার্থের সম্পূরক কিনা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে generous consideration (উদারতামূলক উদ্দেশ্য)। একপক্ষ যদি অপরের মঙ্গলের জন্য কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহ'লে ঐ স্বার্থত্যাগের ফলে শেষ পর্য্যন্ত অপর পক্ষের সত্যই ভাল হয় কিনা, আবার যে স্বার্থত্যাগ করে, তার সত্তাও বিপন্ন হয় কিনা—এমনতর সর্ব্বাঙ্গীণ বিচার। আর, তৃতীয়টা হ'চ্ছে equitable consideration (ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী উদ্দেশ্য)। অর্থাৎ, ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও দেশের সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে কিনা। এই সব বিভিন্ন দিকের সমন্বয় ক'রে বৈষয়িক ব্যাপারগুলির বিলিব্যবস্থা করতে হয়। ফলকথা, প্রত্যেকেরই লাভবান হবার অধিকার আছে, কিন্তু অপরের সত্তা, স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত না ক'রে। আবার, ত্যাগের ক্ষেত্রে সেই ত্যাগই ধর্ম্মদ, যে-ত্যাগের ফলে সপরিবেশ বৈশিষ্ট্য-সম্মত সত্তাসম্বর্দ্ধনা যথাসম্ভব অটুট থাকে।

সুশীলদা—নিঃশেষে আত্মদানই তো মানব-সমাজে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে বিমোহন ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন ক'রে বললেন—দেখেন সুশীলদা! আপনার সত্তার স্রষ্টা বা মালিক কিন্তু আপনি নন। আপনি আমি পরমপিতার মাল। পরমপিতার সেবা ও পরমপিতার ইচ্ছাপূরণই আমাদের জীবনব্রত। তাঁর জন্য জীবনদান যদি প্রয়োজন হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। নইলে, বাহাদুরি দেখাবার জন্য জীবনদান করার অধিকার কিন্তু আমাদের নেই। আমাদের সত্তাকে এমনভাবে পালন ও পোষণ ক'রে চলতে হবে, যাতে বহু-বহু সত্তাকে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতানুযায়ী পালনপোষণী রসদ সরবরাহ ক'রে চলতে পারি। বাঁচব ও বাঁচাব এই বুদ্ধি রাখাই ভাল। তবে মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও নিজের বাঁচা বিপন্ন হয়, সেখানে আর করা কী? অমনতর আত্মদান হীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব আত্মরক্ষার প্রয়াস থেকে অনেক বড় জিনিস। যে-মানুষ অপরকে ব'াচাবার ধান্ধা নিয়ে চলে . না বরং দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে নিজের স্বার্থ কায়েম করতে চায়, সে কিন্তু বে'চে থেকেও মৃত্যুরই সাধনা করে। ওকে বাঁচা কয় না, ওকে কয় জড়ের মত দেহভার বহন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন। কাজলভাই সেখানে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে কয়েকবার বললেন—বাপাই সোনা! বাপাই সোনা! বাপাই সোনা!

কাজলভাই খুশীতে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উম্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), শচীনদা (গাঙ্গুলী), শরৎদা (হালদার), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), উমাদা (বাগচী), সতীশদা (দাস), প্রকাশদা (বসু), গোপেনদা (রায়), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), প্রফুল্লদা (বাগচী), পঙ্কজদা (বাগচী), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি দাদারা এবং কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, ননীমা, হেমপ্রভামা, কালিষষ্ঠীমা, দুর্গামা, সুকুমারীমা, দুলালীমা, কিরণমা, সুরবালামা, সুষমা-মা, শৈলমা, সুধাপাণিমা, ঊষামা প্রভৃতি মায়েদের মধ্যে অনেকে চারিদিকে ঘিরে ব'সে মসগুল হ'য়ে তাঁকে দেখছেন ও তাঁর মধুর বাক্যালাপ শুনছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণাঘন, মমতাভরা, গভীর, প্রশান্ত দৃষ্টি সকলের অন্তরকে যেন সুধাসিক্ত ক'রে তুলছে।

শরৎদা প্রসঙ্গক্রমে বললেন—ভাববাণীটা তাড়াতাড়ি ছাপান দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আছে। তাছাড়া ছড়াগুলি retouch ক'রে (দেখেশুনে) তাড়াতাড়ি ছাপান লাগে। ওর আবার হিন্দী ক'রে হিন্দীতে বের করতে হয়।

অনেক ছড়া দেওয়া হ'য়ে যাওয়ার পর কেষ্টদা বলল যে যে-দুই লাইনের মধ্যে মিল হবে সেই দুই লাইনের শেষের দুই-স্বরের মধ্যে মিল হওয়া প্রয়োজন। সেইকথা শোনার পরের থেকে পরমপিতার দয়ায় যত ছড়া বেরিয়েছে, সবগুলিতে ওটা ঠিক আছে। আগের দেওয়া ছড়াগুলিতে হয়তো কিছু-কিছু অন্যরকম থাকতে পারে।

প্রফুল্ল—যেটা আপনার শ্রীমুখ থেকে প্রথম যেমন বেরিয়েছে সেইরকমই ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, খুঁত রা'খে কাম কী? বরং অসুবিধার জায়গাগুলি যদি আমার সামনে ধরিস, তাহ'লে পরমপিতার মর্জ্জি হ'লে আমিই ঠিক ক'রে দিতে পারি। ফাঁক বুঝে-বুঝে যদি কয়েকদিন পর-পর বসিস, তবেই হ'য়ে যায়। কথা বুঝলি তো?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে বিস্ময়ের সুরে রহস্যজড়িত কণ্ঠে বললেন—অশৈলি কাণ্ড! কেমন ক'রে যে এ-সব বললাম। আমার কিন্তু এর উপর কোন control (অধিকার) নেই। কথাপ্রসঙ্গের মধ্যে অনুভূতি সম্বন্ধে যা' বলেছি তা' যে কি-ক'রে বললাম ভেবে পাই না, ও এমন জিনিস যে পড়লেই মনটা যেন benumbed (নিস্পন্দ) হ'য়ে যায়। আবার, মেসেজই বা বের হ'ল কি-করে? আমি তো স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি যে ইংরেজীতে কোনদিন কিছু একত্র ক'রে গুছিয়ে বলব। পরমপিতা যে কী খেলা খেলেন তা' তিনিই জানেন।

এরপর আপনমনে কী যেন কী ভাবতে-ভাবতে দয়াল আনমনা ও উদাস হ'য়ে গেলেন। এখানে সামনে বসে আছেন। কিন্তু মনটা যেন তাঁর কোন্ অজানা রাজ্যে বিচরণ করছে।

কিছু সময় এইভাবে কাটলো। তারপর একবার প্রস্রাব ক'রে এসে তামাক খেলেন। এইবার কালিষষ্ঠীমা, শৈলমা প্রভৃতির সঙ্গে ঘরোয়া পাঁচ রকমের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। কালিষষ্ঠীমার সাংসারিক কাহিনী শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে প্রীতি-সরস টিকাটিপ্পনী কাটছেন, আর থেকে-থেকে সারা আসরে হাসির রোল উঠছে।

ধন্য সেইসব ভক্তবৃন্দ যাঁরা প্রভুর নিতিনব নটলীলা নিরন্তর প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

৩০শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৪ (ইং ১২।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে বিছানায় ব'সে

আছেন। গাড়ু, গামছা, পিকদানি, গড়গড়া, তামাক, টিকে, দেশলাই, সুপারির কৌটা, জলের ঘটি, দাঁত-খোঁটা ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে ব'সে সরোজিনীমা দয়ালের সেবায় রত আছেন।

পূজনীয় বড়দা এবং ধূর্জ্জটিদা প্রভৃতি আসতে অনুসরণ ও অনুকরণ সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর কণ্ঠে প্রীতিভরে বললেন—অনুসরণ বাদ দিয়ে অনুকরণ ভাল নয়। অনুসরণের মধ্যেই আছে অনুকরণ। অনুসরণটা perfectly (নিখুঁতভাবে) হয় সঙ্গ করার ভিতর-দিয়ে। তাতে ঠিক-ঠিক educated (শিক্ষিত) হয়। সেই জন্য আছে active (সক্রিয়) উপাসনার কথা। উপাসনা মানে কাছে বসা। তাঁর সঙ্গ করতে হয় তাঁর মনোজ্ঞ ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তোলবার জন্য। এখনও অমুক প্রফেসরের ছাত্র—যেমন ধর রকম্‌বার্গের ছাত্র—তার কত খাতির। আমার যে অঙ্কে মাথা ছিল না, তা' নয়, কিন্তু প্রকৃত অঙ্ক-অনুরাগী ব্যুৎপত্তি-ওয়ালা শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ না করায় আমার অঙ্ক শেখা হয়নি। কারণ, শিক্ষকও আমাকে ও আমার প্রশ্নকে বোধ করতে পারেননি এবং তার ফলে আমিও শিক্ষককে আমার বোধের সঙ্গে অনুসরণ করতে পারিনি।

দেবতার আরাধনার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেবতার আরাধনা মানে দেবতা যাতে তুষ্ট থাকেন, সুস্থ থাকেন, তাঁর wishes (ইচ্ছাগুলি) যাতে fulfilled (পরিপূরিত) হয়, তাই করা।

পশুপতিদা (বসু)—স্বর্গত আত্মার সেবা করা মানে কি তাঁর ইচ্ছাগুলি পূর্ণ করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যা' পছন্দ করতেন না, তা' না করা এবং যা' পছন্দ করতেন, তা' materialise (রূপায়িত) করা।

৩১শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৪ (ইং ১৩।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। কয়েকটি শালিক পাখী গাছের ডালে ব'সে খেলা করছে ও মাঝে-মাঝে আনন্দে কলরব করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসি-হাসি মুখে তাদের খেলা দেখছেন এবং পাখীগুলিও যেন তাঁর প্রাণদ সান্নিধ্যে স্ফূর্ত্তিতে মাতোয়ারা হ'য়ে উঠেছে। ভক্তবৃন্দ পর-পর এসে প্রণাম করছেন। এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুশলসমাচারাদি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আগ্রহভরে শুনছেন। এমন সময় সুশীলদা

(বসু) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—Standard of civilisation (সভ্যতার মান) এমন হওয়া উচিত যাতে তার আওতায় প'ড়ে প্রত্যেকটা মানুষ with his environment (তার পরিবেশ-সহ) enlightened (প্রজ্ঞাদীপ্ত) হ'য়ে উঠতে পারে। মানুষের শুধু বাইরের সুখ, সুবিধা ও সমৃদ্ধি বাড়ালে হবে না। যে-অজ্ঞতার দরুন মানুষ কষ্ট পায় ও কষ্ট দেয় তার অপসারণ চাই। এর জন্য দরকার ব্যক্তিগত সাধনা। শুধু নিজেকে উন্নত করলে হবে না। পরিবেশ যাতে উন্নত হ'য়ে ওঠে, সে-বিষয়েও দায়িত্বসহকারে চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্য আছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্ কর্ম্মের ব্যবস্থা। কতকগুলি মানুষ আড়ে-হাতে লাগলে সারা জগৎকে উৰ্দ্ধগামী ক'রে তোলা যায়।

এর একটু পর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে দালানের উত্তর দিকের বারান্দায় এসে বসলেন।

সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাতে লাগলেন।

কাগজে হিন্দু কোড বিল সম্পর্কিত কথা বেরিয়েছে।

সেই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল বললেন—প্রতিলোম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ যদি অবাধে চলতে থাকে, তাহ'লে তো কালে-কালে pure bushes of blood (অবিমিশ্র পবিত্র রক্তধারা-সমন্বিত বংশগুলি) ব'লে আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না দেশে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপের সুরে বললেন—তা' যদি তোমরা না চাও তো থাকবে না। ·········এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখতে হয় আমাদের কী করণীয়। সাধারণ লোকের অধিকাংশই অজ্ঞ। তারা জানে না কোন্ কাজের কী ফল। আমাদের ঋষিরা যে-সব বিধান দিয়ে গেছেন সেগুলি কিন্তু গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জিনিসগুলি লোকের সামনে বার-বার convincingly, rationally ও tactfully (প্রত্যয়প্রদীপী রকমে, যুক্তিযুক্তভাবে ও তথ্য-সহকারে) তুলে ধরা লাগে। খবরের কাগজগুলির মাধ্যমে আর্য্যকৃষ্টিমূলক ভাবধারার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব উপযোগিতা-সম্বন্ধে যদি দিনের পর দিন বলিষ্ঠভাবে প্রচার চালান যায়, তাহ'লে আবার স্রোত ফিরে যাবে। এর জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে, তারও ব্যবস্থা করা লাগবে। হিন্দু-সমাজ এখনও মরেনি। আর, জগতের কল্যাণের জন্যই এই সমাজের অস্তিত্বকে আরো শক্তিশালী ক'রে তোলা প্রয়োজন। তার জন্য চাই ধৰ্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির প্রতি তাদের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) দাউদহনী ক'রে জাগিয়ে তোলা। সঞ্চারণা ছাড়া এ-কাজ হবার নয়। ঋত্বিক্,

অধ্বর্য্যু যাজকরা ঘুরে-ঘুরে যা' করবার তা' তো করছেই। কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে ঐ কাজ আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে চাই বিভিন্ন কাগজের ভিতর-দিয়ে day to day knocking (দৈনন্দিন প্রচার)। তাতে লোকে educated (শিক্ষিত) হবে এবং নিজেরাই বুঝতে পারবে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। এতে শুধু হিন্দু ও হিন্দুত্ব বাঁচবে না। সব সম্প্রদায়ের লোকেই উপকৃত হবে। কারণ, তোমাদের mission ও message (উদ্দেশ্য ও বাণী) হ'ল universal ও all-fulfilling (সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ব-পরিপূরণী)। পরম-পিতার মহাবার্ত্তা নানাভাবে লোকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমরা এই গরীবরাই পারি সবাইকে মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলতে। কিন্তু যেমন-যেমনভাবে যত-খানি যে-সময়ের মধ্যে করবার, তা' না করলে হবে কি-ক'রে? কৃষ্টিপ্রহরীর valid signatory (কার্য্যকরী স্বাক্ষরকারী) এতদিনে আরো অনেক বাড়িয়ে ফেলা উচিত ছিল। You feel but you do not do (তোমরা অনুভব কর, কিন্তু কর না)।

ইতিমধ্যে বঙ্কিমদা (রায়), শরৎদা (হালদার), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), শচীনদা (গঙ্গোপাধ্যায়), হরেনদা (বসু), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), বীরেনদা (মিত্র), গোপেনদা (রায়), রাজেনদা (মজুমদার), প্রকাশদা (বসু), যোগেনদা (হালদার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি অনেকেই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উপবেশন করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার প্রসঙ্গ ধ'রে শরৎদা বললেন—গতবার ইষ্টায়নীর উপর জোর দিয়েছিলাম, তাই কৃষ্টিপ্রহরী তত হয়নি। একসঙ্গে অনেক কাজ প'ড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অনেক-কিছু করিনি, সব না-করাগুলি একসঙ্গে এসে ঘাড়ের উপর চেপেছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাখুশীভরে চাপা হাসি হাসছেন। সেই হাসির ছন্দে তাঁর নিটোল বাহুযুগল ও উদার বক্ষস্থল ক্ষণে-ক্ষণে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠছে। সেই আনন্দ-দোদুল ভঙ্গিমায় সুধামধুর কণ্ঠে বললেন—হরেন একাই পারে পাঁচ হাজার কৃষ্টিপ্রহরী যোগাড় করতে।

হরেনদা উৎসাহিত হ'য়ে বললেন—আপনার দয়ায় সবই সম্ভব। তবে লোককে কিভাবে বলতে হবে, আপনি যদি দয়া ক'রে ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু লোক আছে, বললেই হয়। বলাটাই আমাদের কম হয়। মানুষের দেবার প্রাণ আছে। বুঝিয়ে বলতে পারলে দেবেই। বলতে হয়—'জাত,

ধর্ম্ম, পূর্ব্বপুরুষ সবই তো যেতে বসেছে। পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা, দাম্পত্য জীবনের অচ্ছেদ্য-বন্ধন, নারীর সতীত্ব, কুল-সংস্কৃতি, সংসারের শান্তি কিছুই বুঝি আর টেকে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন চলছে তাতে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভেঙ্গেচুরে একশা হয়ে যাবে, শ্রদ্ধা থাকবে না, প্রীতি থাকবে না, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান থাকবে না, সেবাবুদ্ধি ও সহযোগিতা লোপ পাবে। কর্ম্মদক্ষতা ও কৃতিত্ব অপরাধ ব'লে পরিগণিত হবে, যোগ্যতা অর্জ্জনের সাধনা না ক'রে, ফাঁকি দিয়ে, দাঁ মেরে মানুষ বড় হ'তে চাইবে, কেউ কারও হবে না, কেউ কারও থাকবে না, পারস্পরিক ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও কলহে সকলের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত হবে। এইতো দশা, সকলেরই তটস্থ অবস্থা। আজ যদি হুঁশিয়ার না হই, পরে আর প্রতিকারের পথ থাকবে না, কেঁদেও কুল পাব না। তাই যাতে বাস্তব সব সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয়, আমাদের অস্তিত্ব ও কৃষ্টিসগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেইসব ভাবধারার বিপুল প্রচারের ব্যবস্থা করা লাগে। তারই রসদসংগ্রহের জন্য কৃষ্টিপ্রহরীর পরিকল্পনা। তুমি এতে যোগান দিয়ে ধন্য হও। আমরা সকলে মিলে দেখি একবার ঠাকুরের কথামত চেষ্টা ক'রে।'……আমি আর কী ক'লাম ! তোর যেমন ঝরণার জলের মত তোড়ে কথা বেরোয়, তুই আরো কত সুন্দর ক'রে কইতে পারবি। যাকে যেভাবে বললে হয়, তাকে সেইভাবে বলবি। মানুষকে খুশী ক'রে কাজ হাসিল করা চাই। মানুষকে এমন উদ্বুদ্ধ ক'রে দেওয়া চাই যাতে তার urge and energy (আকূতি ও শক্তি) বেড়ে যেয়ে তার capacity (ক্ষমতা) expanded (প্রসারিত) হ'য়ে চলে। মনে রেখো, পাঁচ হাজার লোক মাসে অন্ততঃ পাঁচ টাকা ক'রে sure (নিশ্চিত) হওয়া চাই। টাকার flow (আগম) বন্ধ হ'য়ে গেলে একটা ব্যবস্থা ক'রে পরে অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে। এই কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে—যে কেউ একলা বাঁচতে পারে না ; বাঁচতে হবে পরিবেশের সবাইকে নিয়ে। আর, তার জন্য চাই ধর্ম্ম, জাত, ইজ্জতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রে তোলা। বহু লোককে এই ভাবে minded (ভাবিত) ক'রে তোলা চাই।

হরেনদা—দেবার মনওয়ালা লোক যারা, তারা বোঝামাত্র সাড়া দেয়। যাদের দেবার মন নেই, তারা শুনে-মিলে এড়িয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কেউ চাই না যে আমরা suffering (দুর্ভোগ)-এর ভিতর গিয়ে পড়ি। মহা suffering (দুর্ভোগ) যা' আসতে চলেছে, ব্যক্তিগত-ভাবে বহুলোকের সামান্য-সামান্য ত্যাগ ও চেষ্টার ভিতর-দিয়ে তার নিরাকরণ কিভাবে হ'তে পারে, সেটা যদি মানুষ বুঝতে পারে, তাহ'লে নিজ স্বার্থের দিকে

চেয়েই তার পক্ষে যা' করা সম্ভব তা' করতে চেষ্টা করে। মানুষ চিন্তা করে না, বোঝে না, তাই করে না। আবার, বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ চিন্তা ক'রে ও বুঝেও বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না। পরমপিতার দয়ায় এমন একটা platform (মঞ্চ)-এর সৃষ্টি হয়েছে যেখানে অগুণতি লোক পরমপিতার নামে একত্র মিলিত হয়েছে। বাঁচবার ও অপরকে বাঁচাবার পথে অগ্রসর হবার জন্য যে fundamental foundation (মৌলিক ভিত্তিভূমি) দরকার, তা' লোক-চক্ষুর অগোচরে তৈরী হ'য়ে গেছে। চাই আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি বিলকুল ত্যাগ ক'রে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার্থে এই সৎ-সংহতির সদ্ব্যবহার ও সম্প্রসারণ। নিজে ঠিকপথে চল, অপরকে বুঝাও, ধরিয়ে দাও। সব হবে, খুব হবে।

আবেগের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে ধীর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—আমাদের শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম হ'ল—'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।' কিন্তু এখন অনেকের ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—'আমাকে সৎ থেকে অসতে নিয়ে চল, আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাও, অমরণ থেকে মরণে আন।' মুখে এ প্রার্থনা না করলেও, তাদের বাক্যালাপ ও আচার-আচরণের ভিতর-দিয়ে এই মনোগত ভাবই সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। এই হাওয়া না ফেরাতে পারলে কারও বাঁচা বেঁচে থাকবে না।

এই সম্বন্ধে কিভাবে কী করা যায়, সেই চিন্তায় শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাকুল। ঘুরে-ফিরে বার-বার একই কথা বলছেন। এইবার দক্ষিণাদার দিকে চেয়ে আবদার ও আবেদনের সুরে বললেন—আপনি যদি এখানে ব'সে থেকে বকের মতন চেষ্টা করতেন, তাহ'লে ঢের হ'য়ে যেত।

দক্ষিণাদা ভক্তিভরে হাতজোড় ক'রে আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন—দয়াল! আমি চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু!

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বলন্ত প্রেরণায় সকলের মন এখন তাঁর ইচ্ছাপূরণের সঙ্কল্পে উদ্দাম ও উদগ্র।

কী যেন একটা কথা বলতে গিয়ে ব্রজেনদা 'নন-সৎসঙ্গী' কথাটা উচ্চারণ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে বললেন—না! না! ও-কথা ঠিক নয়। Every man is virtually a Satsangi (প্রত্যেকটা মানুষই কার্য্যতঃ সৎসঙ্গী), কারণ, অস্তিত্বের বিধি অল্পাবিস্তর না মানলে কারও অস্তিত্ব থাকে না, যদিও ভুল-ত্রুটি থাকলে তার খেসারত দিতে হয় এবং বাঁচাবাড়ার সুষ্ঠু বিধি অনুসরণ ক'রে চলাই সঙ্গত। সেই বিধি সম্যকভাবে যাঁর বোধে উদ্ভাসিত ও

আচরণে উদ্‌যাপিত হয়, তাঁকেই বলে সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু-প্রবর্ত্তিত দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া তাই এতই প্রয়োজন। সৎ কথাটা এসেছে অস্-ধাতু থেকে যার মানে হ'ল সত্তা। যাহো'ক, 'নন-সৎসঙ্গী' না ব'লে non-initiated (অদীক্ষিত) বলা ভাল।

প্রফুল্ল—আপনি যা' করতে বলেন, তা' আমরা করতে চাই, করতে চেষ্টাও খুব করি। কিন্তু আপনি যে চরম তীব্রতা, প্রচণ্ড গতিবেগ ও অচ্ছেদ্য ক্রমাগতি আমাদের কাছ থেকে আশা করেন তা' আমাদের ভিতর ফুটে উঠছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইষ্ট বলেছেন—Spirit is willing but flesh is weak (অন্তরাত্মা চায়, কিন্তু শরীর অপটু)। এ-কথাটা যে আমার কতবার কত সময় মনে হয়! তবে যে মোটামুটি adjusted ও sincere (নিয়ন্ত্রিত ও অকপট) তার কাজের একটা দাঁড়া থাকে, তাকে দিয়ে মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ বড় একটা হয় না। কিন্তু একজন মতলববাজ ভীমকর্ম্মা মানুষের কর্ম্মদক্ষতার ভিতর-দিয়ে অনেক সময় কামের থেকে অকাম ঢের বেশী হয়। একজনের ইষ্ট ছাড়া অন্য নেশা যদি না থাকে, আর সে যদি একটা চামচিকের মত চিমসে মানুষও হয় পরমপিতা তাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে অসম্ভব সম্ভব করিয়ে নিতে পারেন। সর্ব্বতোভাবে তাঁর হ'তে পারলে আর কোন ভাবনা নেই।

হরেনদা—আমাদের দেশে দুর্গাপূজার সময় অনেক জায়গায় বলি দেওয়া হয়! সেটা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধুমধাম ক'রে পূজা করা ভাল, তবে বলি দেওয়া ভাল নয়। মার কাছে সন্তানকে বলি দিলে কেমন হয়? পশুবলির প্রথা যাতে উঠে যায় সেই চেষ্টা করা ভাল।

হরেনদা—এতদিন থেকে প্রচলন, একদিনে কি কথা শুনবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করা লাগবে। ভাল ক'রে বোঝান লাগবে। বিরোধ বাধাতে নেই, বলতে হয়—মাকে জগজ্জননী বলি, জগদ্ধাত্রী বলি, কিন্তু জগতের মধ্যে ওরাও তো আছে। মায়ের সন্তানকে মায়ের কাছে বলি দিলে তিনি কি খুশী হন? আমাদেরও যেমন ব্যথা আছে ওদেরও তো তেমনি ব্যথা আছে, আমরা যেমন মায়ের পেটে জন্মি ওরাও তেমনি জন্মে, আমরা এক ভাষায় এক ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করি, ওরাও ওদের ভাষায় করে। ওরাও ক্ষিধে পেলে খেতে চায়, ভয় পেলে মানুষের মত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মানুষ উন্নত বটে, তবে মানুষের সঙ্গে সমান অনেক কিছু ওদের মধ্যে আছে। সকলেই বাঁচতে চায়, স্বস্তি চায়, স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়। নিজেকে ওদের অবস্থায় ফেলে ভাবলে,

ওদের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা, বেদনা সব অনুভব করা যায়। সেই অনুভূতিটা যদি জাগে তখন ওদের প্রাণনাশের কথা ভাবতেই পারা যায় না। আমাকে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায়, আমার কি তা' ভাল লাগে? নিজের দাঁড়ায় ফেলে ন্যায়-অন্যায় বুঝে নিতে হয়। সমাজে একদিন নরবলির প্রথা ছিল। কিন্তু অকল্যাণকর ব'লেই তো সমাজ থেকে তা' উঠে গেছে। পশুবলির প্রথাও তেমনি উঠে যাওয়া উচিত। আজ হিন্দুর যে দুরবস্থা তা' দেখে হাড় কেঁপে যায়। এখন আমাদের বিশ্বজননীর পূজা এমনভাবে করতে হবে যাতে তিনি খুশী হন, তাঁর দয়ায় আমরা রক্ষা পেতে পারি। অবশ্য, শুধু এখনকার কথা নয়, সব সময়ের জন্য এই কথা। আমি বুঝি—মা সন্তানের প্রাণবধে কখনও তুষ্ট হ'তে পারেন না। এইভাবে কথা ক'য়ে সকলের মন কেড়ে নিতে হয়, প্রাণ ভিজিয়ে দিতে হয়। শুধু যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে লাভ নেই। মানুষের বোধটা গজিয়ে দিতে হয়।

হরেনদা—বেশীর ভাগ মানুষই তো মাছ-মাংস খায়, তা'রা তো মাছ-মাংস খাওয়ার সমর্থনে অনেক যুক্তির অবতারণা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুক্তি সবারই আছে। মানুষ অকাম-কুকাম করে, তার সমর্থনে কত যুক্তি দেয়। বাজারের সুবদনীর জন্য হয়তো চুরি করে, আর সেই চুরি করাটাও যে যুক্তিযুক্ত তা' মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে। অন্যায়ের সমর্থনে মানুষ যদি যুক্তি খুঁজে পায়, তুমি ন্যায়ের সমর্থনে কেন যুক্তি খুঁজে পাবে না? দুর্ব্বল হবে কেন? যা' জীবনের পক্ষে অনুকূল তা' নিজের করতে হয়, অন্যকেও লওয়াতে হয়। 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ত্যাগ ক'রে মানুষকে আপন ক'রে নিয়ে, তার প্রাণের কোমল স্থান স্পর্শ ক'রে তার মঙ্গলকামী হ'য়ে দরদীর মত বোঝাতে হয়। মুখ্য মানুষের মত সোজা বুঝ বোঝাতে হয় যাতে সকলে বোঝে। প্রত্যেকেই নিজের ভাল চায়। তুমি যে তার মঙ্গল চাও এবং তার মঙ্গলের কথাই বলছো—এ-কথাটি তার হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই। তখন অযথা তর্ক নিরস্ত হয়। কারও অহংকে আঘাত দিতে নেই। সুকৌশলে মানুষকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে এমন ক'রে কথা বলতে হয়, যাতে সে বুঝতে পারে এ যেন বাইরের কারও কথা নয়, এ যেন তার নিজ অন্তরাত্মারই বাণী। মাছ খেলে যে জাত যায় তা' তো নয়, তবে জাত না গেলেও জীবন যেতে বসে। জীবন যেতে বসে কথাটা স্থূলভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু আমি নিজে দেখেছি মাছ খেলে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তি কিছু-কিছু ক'রে লোপ পেতে থাকে। আবার, মানুষ যত স্থূলবুদ্ধি হয়, তার চলনও তত ভুলের দিকে চলে। এই ভ্রান্ত চলন মানুষকে নিম্নগামী ক'রে তোলে। এমনি ক'রে মানুষের অধোগতি আসে। এটা শেষ পর্য্যন্ত তার জীবনবৃদ্ধির পক্ষে

ক্ষতিকর হয়। ফলকথা, কোন বিষয়ে তোমার প্রত্যয় যদি পাকা হয়, বোধ যদি স্বচ্ছ হয়, তাহ'লে অপরকে তা' তুমি সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারবে।

শচীনদা প্রশ্ন করলেন—অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন সত্ত্বেও পরে মোহ এলো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, অর্জ্জুনের সেটা achieve (আয়ত্ত) করা নয়। কেষ্ট ঠাকুর দয়া ক'রে তাকে সেটা দেখিয়েছিলেন। মানুষ সাধনার ভিতর-দিয়ে নিজেকে যদি উন্নত স্তরে উন্নীত না করে, তাহ'লে বাহ্যিক কোন কারণে তার সাময়িক উন্নতি দেখা গেলেও সেই উন্নতি তার স্বভাবগত, সহজ ও স্বতঃ হয় না। বাইরের বিশেষ প্রেরণা স'রে গেলেই আবার সে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু যেভাবেই হোক মানুষ যদি একবার ভূমার অনুভূতি লাভ করে, তাহ'লে সেই অনুভূতির স্মৃতি তার মাথায় অল্পবিস্তর থাকেই। আর, সেই স্মৃতির অনুধ্যানই তাকে ঐ অনুভূতি পুনরায় লাভ করতে সাহায্য করে।

এরপর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—রাশিয়ায় যেমনতর সমাজতন্ত্র আছে ব'লে শুনতে পাই তা'তে individual enterprise-এর (ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রচেষ্টার) অবকাশ বিশেষ থাকে ব'লে মনে হয় না। সে নিজের মাথা খাটিয়ে নিজের যোগ্যতা-অনুযায়ী পরিবেশকে সেবা দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন ক'রে নিজেকে ও সমাজকে একযোগে লাভবান ক'রে তুলবার সুযোগ পায় না। তাকে যা'-কিছু করতে হয় রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা-অনুযায়ী। সে যেন রাষ্ট্রের দাস। তার কর্ম্মজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, এমন-কি ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে চলতে বাধ্য। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য এমন ক'রে যদি খর্ব্ব করা হয়, তাহ'লে সে একটা যন্ত্রের সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়। সে যে একটা স্বাধীন সত্তা, তা' সে অনুভব করতে পারে না। মানুষ নিজ-প্রবৃত্তির দাস হোক এ-ও যেমন কাম্য নয়, তেমনি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের দাস হোক তাও কাম্য নয়। মানুষ ঈশ্বরের দাস হ'য়ে ইষ্টনিয়ন্ত্রিত পথে আত্মনিয়মন ক'রে আত্মশক্তির নিয়োগে সমাজকে পুষ্ট ক'রে নিজে পুষ্ট হোক—সেই-ই সব দিক্ দিয়ে ভাল। এতে প্রত্যেকটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে পরিবেশকে নিয়ে উন্নতির দিকে চলতে পারে—প্রীতি-সঙ্গতি ও সহযোগিতা নিয়ে। বাইরে থেকে চাপান জোর-জবরদস্তির এখানে কোন প্রয়োজন করে না, অন্তত ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের ও পরিবেশের বাঁচাবাড়ায় অন্তরায় সৃষ্টি না করে।

১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৪।১৯৪৮)

আজ নববর্ষ, স্থানীয় ও বহিরাগত বহু লোকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় একখানি তক্তপোষে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর মন আজ খুব হাসি-খুশি। আনন্দে সবার সঙ্গে ডেকে-ডেকে কথা বলছেন। নববর্ষের সুপ্রভাতে অনেকেই ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করছেন। তিনি সেই মালা গ্রহণ ক'রে আশীর্ব্বাদস্বরূপ তা' আবার তাদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। পরম মধুর পরিবেশ। স্বর্গের দৃশ্য যেন মর্ত্ত্যভূমিতে নেমে এসেছে। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি-ডোরে বাঁধা! যেন একটি বিশ্বব্যাপ্ত বৃহৎ পরিবার। নববর্ষের অমৃতম্রক্ষিত বোধনলগ্নে পিতৃসকাশে উপস্থিত হ'তে পেরে সবার আনন্দ যেন উথলে উঠছে। আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই উপস্থিত আছেন।

যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত তাঁর আইন-ব্যবসায়ের কাজকর্ম্ম ছেড়ে পূর্ণকালিক কর্ম্মী হবার জন্য আশ্রমে চ'লে এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন কিভাবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সব কাজকর্ম্ম গুটিয়ে বাড়ী ছেড়ে চ'লে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনতে-শুনতে উল্লসিত কণ্ঠে উদাত্ত ছন্দে ব'লে উঠলেন—

"হায় সে কি সুখ
এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয় তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—'কথা ও কাহিনী' বইটা আন তো।

বই ও চশমা এনে দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে "গুরুগোবিন্দ" কবিতাটি প'ড়ে শোনালেন। বই বন্ধ ক'রে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় আবার আবৃত্তি করলেন—

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে।
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ॥
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।

নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাহি তার কাছে জীবন-মরণ
নাই নাই আর কিছু॥
হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দেবে ব'লে
আসে লোক কত-শত॥
ওই শোন শোন কল্লোল ধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মত অলস তেয়াগি
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা॥"

শেষের চারটি লাইন শ্রীশ্রীঠাকুর সুগভীর আবেগের সঙ্গে পর-পর দুইবার আবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন—আমিও তো তাই বলি—তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে কতজন হয়তো ফিরে যাবে। তোমরা আর ঘুমিও না। তোমরা অতন্দ্র-ভাবে জেগে থাকো। আর সকলকে জাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে উজ্জীবিত ও উদ্বোধিত ক'রে তোলো। তোমাদের উপর পরমপিতার অনেক আশা। তোমরা দেশের মানুষকে জাগিয়ে না তুললে আর কে জাগিয়ে তুলবে তাদের? তোমরা যে পরমপিতার দয়া পেয়েছো, তাঁর স্পর্শ পেয়েছো। তোমাদেরই তো দায়। কিন্তু তাঁর এত দয়া পেয়েও তোমাদের মধ্যে eminent (বিশিষ্ট) অনেকে আজও ঘুমিয়ে আছে। জগজ্জ্যোতিকে আমি কত বলেছি তবু ঘুমোচ্ছে।

জগজ্জ্যোতিদা (সেন) সলজ্জভাবে মুখ নীচু ক'রে আছেন।

সুরেনদা আবার বললেন—যাতে পেছু টান আমাকে আটকে রাখতে না পারে সেই জন্য এই ক'দিন কেবল আওড়াতাম—

"তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে।

সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো বুদ্ধির কাজ। আমার চলায় কৃতার্থ হওয়ার সঙ্কেতের মধ্যে কী কী কথা আছে যেন!

কেষ্টদা—তার মধ্যে আছে, (১) তুমি যাই থাক না কেন—করায় আর বলায় চলতে থাক ঠিক তেমনিতর চাল-চলন নিয়ে, যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে আদর্শপ্রাণ, আর ভাবও তুমি তাই—এতে যদি তুমি ভিতরে-ভিতরে আদর্শে ধর্ম্ম-প্রেমোন্মাদ হ'য়ে পড়, তাতেও ক্ষতি নাই।

(২) তোমার পারিপার্শ্বিকের কোন একেরই হউক বা বহুরই হউক সহানুভূতিসম্পন্ন মনোযোগ-সহকারে ভাব ও চলন দেখে ঠিক ক'রে নিও—কি-রকম ভঙ্গীতে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিলে তাহার হৃদয়কে তোমার আদর্শে জয় করিতে পার—তোমার সেবা তাহার প্রতি তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই চালাও।

(৩) তোমার মনে কী আছে কিংবা মনে তুমি কেমনতর তার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না ক'রে যা' করণীয় তেজ, উদ্যম ও নিরন্তরতাকে নিয়ে বিবেচনার সহিত ক'রে যাও।

(৪) এই করতে গেলে করার রাস্তায় দুটো বিপদ আসতে পারে—একটি go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি) আর-একটা libido-র distortion (সুরতের বিকৃতি) ঘাবড়ে যেও না, একটু নজর রেখো তাদের প্রতি, কৃতকার্য্যতা কৃতার্থতাকে নিয়ে তোমাকে সার্থকতার সম্রাট ক'রে রাখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই principle (নীতি)-গুলি practically (বাস্তবিক) apply (প্রয়োগ) ক'রে চলতে পারলে আর ভাবনা নেই।

জগজ্জ্যোতিদা একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী-সম্পর্কে বলছিলেন যে তিনি ইষ্টনির্দ্দেশিত যাজন কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ নিয়ে ব্যাপৃত আছেন।

সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে ব'ললেন—যাজন বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত আমরা যে-কাজ করতে যাই, তা' blind (অন্ধ)—চক্ষু নাই, অথচ চলছি, কখন কোন খানা-খন্দে গিয়ে পড়ব ঠিক নেই। Leader (নেতা) যারা তাদের তরতরে চলনা, আশা-ভরসা-উৎসাহের উপর movement (আন্দোলন)-এর গতি নির্ভর করে। সাধারণ সৎসঙ্গীদের অনেকের আপ্রাণতা যা' দেখি, তাতে প্রাণ জুড়ায়ে যায়। তাদের মত মাল দুর্লভ। তারা কিন্তু

ঘুমায় না। ব্যর্থ সার্থকতার ধার ধারে না তারা। এমন সব সোনার চাঁদ মানুষ হাতে পেয়ে তোমরা যদি দাঁড়াবার মত দাঁড়াতে না পার তাহ'লে সে বড় দুঃখের কথা।

জগজ্জ্যোতিদা—বর্ত্তমানে দেশে নানা ভাবধারা নিয়ে নানা আন্দোলন চলছে। এর মধ্যে কোন্ আন্দোলনকে আপনি জনকল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে মনে করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আর্য্যকৃষ্টির যতটা বিরোধী সেটা ততখানি detrimental (ক্ষতিকর)। তোমাদের আন্দোলনটা universal (সার্ব্বজনীন) জিনিস। এর উদ্দেশ্য হ'ল সকলেরই মঙ্গল। শুধু তোমার নয়, শুধু আমার নয়, প্রত্যেকেরই মঙ্গল। তোমারও out and out (পুরোপুরি) মঙ্গল, আমারও out and out (পুরোপুরি) মঙ্গল। সকলেরই out and out (পুরোপুরি) মঙ্গল নিবদ্ধ এর মধ্যে। কারও সঙ্গে তোমাদের বিরোধ নেই, কারণ তোমাদের মধ্যে আছে সবারই সংশুদ্ধি ও পরিপূরণ। যারাই মঙ্গল চায় তাদেরই পরমপিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলতে হবে। অনেকে চায় বৈশিষ্ট্যের বিলোপ, তোমরা চাও বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও সম্পূরণের মধ্য-দিয়ে সমাজের normal evolution (স্বাভাবিক বিবর্ত্তন)। বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে কিছুই হবার নয়। তাই গীতায় আছে—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

তোমাদের প্রতেকটা জিনিস কল্যাণমুখী। অনেকে চায় breed of disintegration (সংহতি-অপলাপী জনন), কিন্তু তোমরা চাও breed of becoming (বিবর্দ্ধনী জনন)। উপযুক্ত যাজন না থাকাতে এবং নানা প্রবৃত্তিমার্গী মতবাদের প্রভাবে দেশের বহু লোকের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘ'টে গেছে। তাই, যারা achieve (আয়ত্ত) করেছে, efficient (দক্ষ) হয়েছে, educated (শিক্ষিত) হয়েছে, তাদের কেউ-কেউ টেনে নামাতে চায়। তোমরা চাও বড়কে আরো বড় করতে এবং তাদের প্রবুদ্ধ ক'রে, তাদের সহযোগিতায় ছোটকে টেনে তুলতে। প্রত্যেকের ভেবে দেখা লাগে—সে বাঁচতে চায়, না মরতে চায়। সে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়, না সঙ্কুচিত হ'তে চায়। শুধু ভাল চাইলে হবে না, করতে হবে তাই যাতে ভাল পাওয়া যায়। উল্টো চলনে চলব, অথচ ভাল হবে, তা' কখনও হয় না। তাই বার-বার বলতে ইচ্ছা করে—ও রে অবোধ! কোথা চলেছিস ? ও তো পথ নয়, ফিরে আয়! ফিরে আয়!

জগজ্জ্যোতিদা—এর প্রতিকার কি হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলে এক লহমায় হয়, আদৌ দেরী লাগে না। এক ফোঁটা blood-shed (রক্তপাত) হয় না। তোমাদের অসাধ্য কী কাম আছে? সেবার সারা বাংলা দেশ জুড়ে কী নিদারুণ দুর্ভিক্ষ! লাখো-লাখো লোক না খেতে পেয়ে ম'রে সাবাড় হ'য়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের মত নেংটেদের চেষ্টায় ও সেবায় আশ্রমের দশ মাইলের মধ্যে, আমি যতদূর জানি, না-খেতে পেয়ে একটা লোকও মরেনি।

মনোমোহনদা (দাস)—কাশ্মীর সমস্যার কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব নির্ভর করে উপযুক্ত মানুষের উপর। সমস্যাগুলির বিহিত সমাধান যদি আমরা করতে পারি, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে আমরা বেড়ে উঠি। কিন্তু সেদিকে আমাদের নিচ্ছে কে? তোমার মাথায় কিছু জোয়ালেও তো তা' বলতে গিয়ে পাত্তা পাবে না।

মনোমোহনদা—আজকাল সবাই বলছেন ধর্ম্মের সঙ্গে Politics-এর (রাজনীতির) কোন সম্পর্ক নেই। এ সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম কী তাই বোঝে না, তাই ঐ সব কথা কয়। আমাদের বাপ, বড় বাপ কী ব'লে গেছেন, তা' তো আমরা খুঁজেই দেখলাম না। ধর্ম্ম মানে সেই পথে চলা যাতে প্রত্যেকে সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ধর্ম্মে'র মূল কারবার existence (অস্তিত্ব)-কে নিয়ে। সেই existence-এর (অস্তিত্বের) সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, অথচ politics (রাজনীতি) করা হবে,—এমনতর কথার মানে আমি বুঝতে পারি না। সব যেন ঘোলাটে মনে হয়। তবে এ-কথা সকলেরই জানা প্রয়োজন যে প্রকৃত ধর্ম্মে'র মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন স্থান নেইকো। প্রকৃত ধার্ম্মি'ক যারা তারা সবারই সত্তাপোষণী বান্ধব।

সুরবালামা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু ফল নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয়।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর জগজ্জ্যোতিদার চোখে চোখ রেখে প্রাণ-কাড়া স্বরে বললেন—আবার বলতে ইচ্ছা করে—

> "স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
> প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,
> এ নিশীথ-মাঝে তুমি ঘুমাইলে
> ফিরিয়া যাইবে তারা।"

কেষ্টদা—যাদের কথা বলছেন, যারা খোঁজে, সেই তারা কোথায়? শুনেও শোনে না, জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না এই ধরণের লোকই তো বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা আছে। আমরা অতন্দ্র থাকি না, ঘুমে ধরে আমাদের। তাই কত লোক পায় না, ফিরে যায়। আমি ভাবি—যতখানি যা' করা যেত, সে-তুলনায় বিশেষ কিছুই করা হ'ল না। পরমপিতার সেবার অছিলায় আমাদের অনেকে এক-একটা ক্ষুদ্র interest (স্বার্থ)-কেই জীবনভোর serve (পরিচর্য্যা) ক'রে চলেছি। কিন্তু ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের লাখো পরিচর্য্যা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, যদি environment (পরিবেশ)-কে সেবায় তাজা ক'রে তোলা না যায়। ইষ্টস্বার্থ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা যত উচ্ছল হবে, ততই আমরা বাস্তবে লাভবান হব। শুধু টাকা হ'লেও চলবে না, শুধু মানুষ হ'লেও চলবে না। দুই-ই চাই। আর, তা' সপরিবেশ পরমপিতার পথে চলবার জন্য।

২রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্র-শয্যার উপর ব'সে আছেন। এমন সময় প্রফুল্ল আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই ফাঁকে বলি, চিঠিখানা লিখে ফেল, পরে ভিড় জ'মে যাবিনি।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বলা-অনুযায়ী চিঠিখানা লেখা হ'ল এবং পুনরায় তা' শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনান হ'ল। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী চিঠি-খানা তাঁদিগকে প'ড়ে শোনান হ'ল। প'ড়ে শোনাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা ও শরৎদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে তো ?

উভয়ই বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ! খুব ভাল হয়েছে।

কেষ্টদা শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভূমিকা থেকে কতকগুলি অংশ প'ড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে প্রীত হ'য়ে বললেন—আমিও তো বলি আপনাদের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে এমনি প্রাঞ্জল ক'রে সব বিষয়ের উপর লিখতে।

কেষ্টদা বিনীতভাবে বললেন—কোন-কিছু লিখতে ভয় করে। ভাবি—কী লিখতে কী লিখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের একটা conception (ধারণা) আছে, principle (নীতি) আছে, fundament (মূল) আছে। আপনারা লিখলে ঠিকই হবে। আপনাদের বেতাল লেখার জো নেই।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ 'অহং' 'মাং' ইত্যাদি কথা বার-বার গীতায় বলেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তো সব সময় 'মা' 'তিনি' এইভাবে বলেছেন। 'আমি' 'আমাকে' কথাই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'আমি', 'আমাকে', 'আমার' ইত্যাদি কথা বারবার উচ্চারণ করলে অহঙ্কার আসতে পারে, অভিমান আসতে পারে, তাই ও-ভাবে বলেছেন। জানবেন হীনমন্য অহংকে যারা প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দিয়ে চলে, তারা ধর্ম্মরাজ্যের কেউ নয়, তারা শয়তানেরই সাগরেদ। ধর্ম্মরাজ্যে ঢুকতে গেলে তাই মানুষ অহংকে খাটো করার জন্য আগে গুরুর কাছে মাথা মোড়ায়, গুরুময় হয়, গুরুর জয় গায়, যতদূর পারে নিজেকে ভুলে যায়, নিজেকে মুছে ফেলে। তখন পরমপিতা তার অন্তরে আসন পাতেন। তার দ্বারা অপরের অহং যথাসম্ভব আহত বা প্রতিহত হয় না, বরং অপরের অহঙ্কার ও অভিমানকে অক্লেশে স'য়ে-ব'য়ে শুভে বিন্যস্ত ক'রে সে তাদিগকে পরমপিতামুখী ক'রে তুলতে পারে। যার ego (অহং) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) ও surrendered (সমর্পিত) হয়নি, যে অপরের ego (অহং)-কে tolerate ও mould (সহ্য ও নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে না, সে কিন্তু মানুষের সত্তাকে আত্মিক পোষণ দিতে পারে কমই। কারণ, তার নিজেরই আত্মিক জাগরণ ঘটেনি। গুরুগত-প্রাণ হ'য়ে অহঙ্কার জয় করা তাই ধর্ম্মজীবনের first basic factor (প্রথম মৌলিক উপাদান)। অহঙ্কার যাতে পোষণ না পায়, কথাবার্ত্তা, চালচলনও সেই কায়দায় চালাতে হয়। তারই নমুনা দেখিয়ে গেছেন ঠাকুর। আবার, ভাবাবিষ্ট হ'য়ে নিজের ভূতমহেশ্বর স্বরূপও কত জায়গায় কতভাবে ব্যক্ত করেছেন ভক্তদের কাছে। এই সবখানি নিয়ে তাঁকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে 'অহং', 'মাং' ইত্যাদি বলেছেন, সেখানে কিন্তু হীনমন্য অহঙ্কারের নাম-গন্ধও নেই। নিজের অখণ্ড স্বরূপকেই তিনি সেখানে ব্যক্ত করেছেন। অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানসিদ্ধ সাধক ভাবারূঢ় অবস্থায় যেখানে 'সোঽহং' বলেন, তাও বিলকুল ঠিক। কিন্তু অনধিকারী যদি অহঙ্কারের প্ররোচনায় ঐ কথা হামেশা আওড়ায়, তাতে বিপদ আছে। সেই জন্য নিরাপদ হ'ল ভক্তির পথে 'তুমি প্রভু' 'আমি তোমার নিত্যদাস' এই ভাব নিয়ে চলা। ভক্তির সঙ্গে কর্ম্ম, সেবা, বিচার, বিশ্লেষণ, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য সব-কিছুই থাকে। ওতে কিছুই বাদ পড়ে না। জীব ও ঈশ্বর যে অভেদ তাও বোধ করা যায়। কিন্তু ভক্ত বলে —'আমি চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে চাই।' সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হ'য়ে তাঁতে লয় পেয়ে যেতে চায় না, সে চায় ঈশ্বরের সেবা করতে, পূজা করতে স্তুতিগান করতে, তাঁর প্রেমে জগৎকে মাতিয়ে তুলতে, প্লাবিত ক'রে দিতে, নিজেকে তাঁর উপভোগ্য ক'রে নিরন্তর তাঁকে ও নিজের সত্তাকে তিল-তিল ক'রে নিত্য নবীনভাবে উপভোগ করতে। একেই বলে অমৃতময় জীবন। মৃত্যু এখানে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তার আয়ু, বল, বীর্য্য এন্তার বেড়ে যায়। শরীরের প্রতিটি

কোষে ব্রহ্মানন্দের কাঁপন জাগে। কী যে অবস্থা হয় ব'লে বোঝাবার নয়।

—বলতে-বলতে ভাবাবেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নামল।

তাঁর দেখাদেখি সকলের চোখ এখন অশ্রু ছলছল। মন নিবাত দীপশিখার মত স্থির, গম্ভীর, অকম্প্র। কিছুক্ষণের জন্য যেন দেশকাল-পরিবেশের চেতনা মুছে গেল অন্তর থেকে।

কিছু সময় বাদে মনোমোহনদা (দাস) জিজ্ঞাসা করলেন—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ"

(যোগযুক্ত পুরুষ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন)—এই অবস্থা কিভাবে লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় ঐ ইষ্টের প্রতি অকাট্য টানের ভিতর-দিয়ে। ইষ্টের স্মৃতি তখন সর্ব্বদার তরে মাথায় লেগেই থাকে, জেগেই থাকে, কিছুতেই ছাড়ে না। ঐ অবস্থায় 'যত্র-যত্র নেত্র পড়ে, তত্র-তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'—এমনতর রকম হয়। আপনার যেমন ধরুন একজন অতি প্রিয় বন্ধু আছে তার বিচ্ছেদ আপনি আদৌ সইতে পারেন না, সর্ব্বদাই আপনি তার কথা ভাবেন, তার সঙ্গ কামনা করেন, তাকে মনে-মনে খোঁজেন। আপনি পথ বেয়ে চলেছেন, বুকখানার মধ্যে আপনার তারই কথা হু-হু করছে, প্রাণটা তারই জন্য উতলা, আকুল, উম্মুখ, তখন গাছের পাতাটা নড়ছে, হাওয়াটা বইছে, গরুটা ছুটে চলেছে—যা' দেখছেন সবটার সঙ্গে তাঁরই স্মৃতি তীব্রতরভাবে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠছে। আপনার সারা মনটা তাঁরই ভাবে মগ্ন, তাই পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে মনে যে নূতন বোধগুলি গজাচ্ছে, সেগুলির সঙ্গে তাঁকেই যেন নূতন ক'রে বোধ করছেন। হয়তো বন্ধুর সঙ্গে জড়িত এতজ্জাতীয় পূর্ব্বস্মৃতিরও উদয় হচ্ছে মনে। এ হ'ল ভালবাসার কথা। কাউকে মন-প্রাণ দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসলে বোঝা যায় যে ভালবাসা কী বস্তু, ভালবাসা কী করে। তাই কয়—প্রণয় পঞ্চম বেদ। যেন-তেন প্রকারেণ ইষ্টের সঙ্গে প্রণয় হওয়া চাই। তা' যখন হবে তখন জগতের রং বদলে যাবে তোমার কাছে। তুমি কদর্য্যতার মধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে এবং তোমার সংক্রামক প্রণয়-সঞ্চারণায় কদর্য্যকেও প্রকৃত সুন্দর ক'রে তুলতে পারবে।

কেষ্টদা—কৃষ্ণের ছবি গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায় দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা এমন ধরণের নয় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'তে পারে, তবে ওটা final (চরম) নয়। স্ফুরণ

কথাটাই ঠিক। যে-বস্তু যা' সে-বস্তুকে তাই ব'লেই দেখছি, কিন্তু তা' আমার প্রেষ্ঠস্মৃতিকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত ও উদ্রিক্ত ক'রে তুলছে। জগৎটাই যে আমার কাছে প্রেষ্ঠময় এবং প্রেষ্ঠ-প্রীণনের উপাদানে ঠাসা। তাঁর পূজায়, তাঁর প্রতিষ্ঠায় না লাগে এমন কিছু নেই। তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকল্পে কোন্ বস্তু, কোন্ ব্যক্তির কী উপযোগিতা তা' স্বতঃই চেতনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। Lord blooms in and through everything (সব কিছুর ভিতর-দিয়েই প্রভু বিকশিত হ'য়ে ওঠেন)। তন্ময়তার মাত্রা-অনুযায়ী এক-এক স্তরে এক-এক রকম বোধ হয়। ইষ্টনিষ্ঠা যখন আমাদের পেয়ে বসে, তখন তার ক্রিয়া, সে ক'রেই ছাড়ে। এ-সব কসরতের ব্যাপার নয়। নিজের কোন স্বার্থচাহিদা বা মতলবী ধান্ধা থাকতে এ জিনিস হবার নয়। বিনা সর্ত্তে, বিনা প্রত্যাশায় ষোল আনা নিজেকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হয়, তাঁর সেবায় লাগাতে হয়। তাঁতে কেবল হ'তে হয়, একেই বলে কৈবল্যলাভ। ক্রমে-ক্রমে কৈবল্য যেন আমাদের ঠেসে ধরে, একমাত্র তাঁর চিন্তা, তাঁর কথা ও তাঁর কাজ ছাড়া আর কিছুতে মন রোচে না। তাঁকে নিয়ে সক্রিয়-ভাবে মত্তমসগুল হ'য়ে চলা ছাড়া রেহাই থাকে না। নেশাখোরের মত অবস্থা হয়। তখন নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্তরেও তিনি, বাইরেও তিনি। এ অত্যন্ত normal (স্বাভাবিক) ব্যাপার।

এরপর বই লেখা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আপনারা লিখলে বেলয় কিছু লিখতে পারবেন না। যা' লিখবেন, তা' ঠিক লাইনেই হবে।

প্রফুল্ল—আমার তো মনে হয়, আজকাল বেলয় কথারই কদর বেশী। নাংলা, নির্জ্জলা, যুক্তিসিদ্ধ সত্যের উপর দাঁড়ানতে অনেকে আমাদের কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারে না। না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি যাদের প্রবল, অলৌকিকতার উপর যাদের ঝোঁক বেশী, নিজেদের দুঃখকষ্টের জন্য অপরের ঘাড়ে পুরোটা দোষ চাপিয়ে যারা সুখ পায়, আমাদের কথা শুনে তাদের অনেকে আশ্বস্ত না হ'য়ে বরং অস্বস্তি বোধ করে। তাদের ভুলের সৌধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা হতাশ হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ঐ ক'ল এক কথা, যার কোন মানে হয় না। আমি কই, ওরে পাগল! তোমাদের কথা অর্থাৎ সৎসঙ্গের কথা যে প্রত্যেকেরই কথা, একটা পিপীলিকারও পর্য্যন্ত ঐ কথা, সকলের সত্তাগত চাহিদা যা', তা' যাতে বাস্তবে সম্যক পরিপূরিত হ'তে পারে, পরমপিতার দয়ায় সেই সত্যই তো তোমাদের কাছে ধরা পড়েছে এবং তাই-ই তো তোমরা ব'লে বেড়াচ্ছ। তোমাদের কথা না নিয়ে মানুষের উপায় আছে? মানুষকে হতাশ বা নিরাশ হ'য়ে থাকতে দেবে কেন তোমরা? বরং সকলকে ঠিকপথে চলতে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলাই তো

তোমাদের কাজ। ভুল ভাঙ্গানই সব নয়, লোককে ঠিকপথ ধরানই কাজের কাজ। সেই পথে চলতে সুর করলে কালে-কালে সব ধরা পড়ে। অযথা কারও বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে আছেন। একটি ছেলে খেলাচ্ছলে একটি কুকুরের গায়ে একটা ছোট ঢিল লাগাতে চেষ্টা করল। কুকুরের গায়ে ঢিলটা না-লাগা সত্ত্বেও সে চীৎকার ক'রে উঠল। তা'ই লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন' শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হ'য়েই কান্নার ভিতর-দিয়ে নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দেয় এবং নিজের প্রয়োজনের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, একটা কুকুর-বেড়াল পর্য্যন্তও বিপন্ন হ'লে তেমনি আর্ত্তভাবে চীৎকার ক'রে অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। সত্তার মধ্যে আছে সৎ—অর্থাৎ অস্তিত্ব, চিৎ অর্থাৎ সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা, আর আছে আনন্দ অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্বেগ। অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে, চেতন থেকে, বৃদ্ধি ও বিস্তারের পথে চলার প্রবণতা প্রতিটি সত্তায় বিদ্যমান। আমার মনে হয় একটি ধূলিকণাও একটা জীয়ন্ত সত্তা বই আর কিছু নয়।

বিভিন্ন আন্দোলন ও বাদ সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন্‌টার মধ্যে জীবনীয় লওয়াজিমা কতখানি আছে না-আছে তা' খতিয়ে না-দেখে তা' নস্যাৎ ক'রে দেওয়া ভাল না। প্রত্যেক যা'-কিছুর পরিপূরণ কিভাবে করা যায়, তাই দেখতে হয় ও দেখাতে হয়। আমাদের আংশিক জ্ঞানকে যখন আমরা পূর্ণজ্ঞান ব'লে মনে করি এবং তার সঙ্গে মেলে না ব'লে অপরের আংশিক বাস্তব জ্ঞানকে যখন আমরা ভ্রান্ত ও মিথ্যা ব'লে ঘোষণা ক'রে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি, তখন আমরা নিজেরাও বঞ্চিত হই এবং অপরকেও বঞ্চিত করি। এমনি ক'রে বিরোধ, বিচ্ছেদ ও অজ্ঞানতা গহীন হ'য়ে ওঠে। বিভিন্ন অন্ধের হাতীর দেহ-সম্বন্ধে যে ধারণা এবং তাই নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে বাদ-বিতণ্ডার গল্প পাওয়া যায় তা' কিন্তু খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। যে-অন্ধ হাতীর কানে হাত দিয়েছে, সে জোর গলায় ঘোষণা করছে—আমি জানি হাতী কুলোর মত! যে-অন্ধ হাতীর পায় হাত দিয়েছে সে অমনি প্রতিবাদে সোচ্চার হ'য়ে বলছে—যা, বাজে বকিস না, আমি জানি হাতী থামের মত। আরো পাঁচজন অন্ধ, যে যে-অঙ্গে হাত দিয়ে দেখেছে সে জোরের সঙ্গে তার সীমিত বোধটুকুকে একমাত্র সত্য আর সবার কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত ব'লে বলছে। এমনি ক'রে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হ'য়ে মারামারি বাধার উপক্রম। এমন সময় একটি স্বাভাবিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যে পুরো হাতীকে ভাল ক'রে দেখেছে—সে সেখানে

এসে হাজির। সে তাদের বিবাদের বৃত্তান্ত শুনে হেসেই কুটিপাটি। সে তখন তাদের বুঝিয়ে বলল যে তাদের প্রত্যেকের বোধই সত্য, কিন্তু সেইটেই হাতীর দেহ সম্বন্ধে সবখানি সত্য নয়। প্রত্যেকের বোধই একাঙ্গী ও আংশিক। তাদের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নেই। আমরা দম্ভী, প্রবৃত্তি-অভিভূত ও সঙ্কীর্ণমনা, তাই শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে অপরের বক্তব্য শুনতেও পারি না, এবং তার মধ্যে গ্রহণীয়, বর্জ্জনীয় ও পরিপূরণীয় কতটুকু কী আছে, তা'ও বুঝতে পারি না। এইটেই হ'ল অজ্ঞতা ও মূঢ়তার অভিশাপ। সমগ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন যুগপুরুষোত্তমের প্রতি বৃত্তিভেদী টানের ভিতর-দিয়ে ছাড়া এই অজ্ঞতা ও মূঢ়তার নিরসন হবার নয়। আর তা' না হ'লে মানব-সমাজে ঐক্য, সংহতি ও মিলনও সুদূরপরাহত।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

If any ism can solve and explain
every ism in tact
with all its meaningful adjustment
for becoming,
that is the perfect ism
—it is solemn.

(যদি কোন বাদ সর্ব্ববিধ বাদের সত্তাসম্বর্দ্ধনী সার্থক বিন্যাসের ইঙ্গিতসহ সেগুলির পুরোপুরি ব্যাখ্যা ও সমাধান দিতে পারে, তবে তাকে বলা যায় পূর্ণ ও পবিত্র বাদ।)

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপারটা কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মত বা পথই হোক না কেন, দেখতে হয় তার মধ্যে **elements of truth** (সত্যের উপাদান) কতখানি আছে। হাবিজাবি যেগুলি তার মধ্যে ঢুকেছে, সেগুলিকে সাফ ক'রে সত্যের ঐ ন্যূনতম উপাদানকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হয় যাতে তা' মানুষের বাঁচাবাড়ার পরিপন্থী না হ'য়ে পরিপোষক হয়। রামকৃষ্ণদেব যেমন পঞ্চরসিকদের কথা বলেছেন—ওটা যেন পায়খানার দরজা দিয়ে ঢোকা। কিন্তু ও-জিনিসটাকেও যদি **becoming** (বিবর্দ্ধন)-এর দিকে **correctly adjust** (শুদ্ধভাবে বিন্যস্ত) করা যায়, তাহ'লে আর অসুবিধা থাকে না। **Sex** (যৌনজীবন)-ই হোক, **hunger** (ক্ষুধা)-ই হোক, **money** (অর্থ)-ই হোক—এর কোনটাই বর্জ্জনীয় নয়। সব-কিছুরই যথাযথ স্থান আছে জীবনে। প্রত্যেকটারই বিনিয়োগ এমনভাবে করতে হবে, যাতে তা' সপরিবেশ আমার বাঁচাবাড়ার সহায়ক হয়। সপরিবেশ বলছি এই জন্য যে, আমার বাঁচা-

বাড়ার প্রয়াস যদি অন্যের বাঁচাবাড়াকে পুষ্ট না ক'রে শীর্ণ করে তাহ'লে তা' কিন্তু অধর্ম্ম হবে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'। ধর্ম্মসঙ্গত কাম, ধর্ম্মসঙ্গত অর্থ, ধর্ম্মসঙ্গত অন্নপান, ধর্ম্মসঙ্গত উপভোগ, ধর্ম্মসঙ্গত বিষয়কর্ম্ম—এইগুলির মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেইকো। তার জন্য চাই সংযম, মাত্রাজ্ঞান ও পরিবেশের হিতসাধন সম্বন্ধে জাগ্রত চেতনা। কিন্তু ইষ্টনিষ্ঠ হ'লে এগুলি আপ্‌সে আপ্‌ আসে। তাঁর উপর নেশা থাকলে বেচালে পা পড়ে না। তিনিই যেন হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে চলেন। তবে নিজেকে সর্ব্বদাই নিরখ-পরখ ও শাসন করতে হয়। অন্যকে ক্ষমা করা ভাল, কিন্তু নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে নেই।

৫ই বৈশাখ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৮।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে নিম্নলিখিত ইংরাজী বাণীটি বললেন—

When sufferings and abhorrence in life
fail to set up repugnance
against Ideal, principle, cult and culture
and to prompt perverse venture,
there lies manhood, education and wisdom—
frailty is off,
eyes glow,
mind is adjusted up.

(যেখানে জীবনে দুর্ভোগ ও ঘৃণা
আদর্শ, নীতি, ধর্ম্মমত ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে
বিরূপতা বা অশিষ্ট অভিযানের
সৃষ্টি করতে পারে না,
সেখানেই মনুষ্যত্ব, শিক্ষা ও প্রজ্ঞা বসবাস করে,
আর, সেখানে দুর্ব্বলতার অবসান হয়,
চক্ষু দীপ্ত দেয়,
অন্তর সহাস্য ও প্রফুল্ল হয়,
মন ঊর্দ্ধে বিনায়িত হয়।)

লেখাটা শেষ হ'তে-হ'তে সুশীলদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রকাশদা

(বসু), বঙ্কিমদা (রায়), গোপেনদা (রায়), কালীষষ্ঠীমা, দুলালীমা প্রভৃতি অনেকে এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বাণীটি প'ড়ে শোনাতে বললেন। বাণীটি প'ড়ে শোনানো হ'ল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—মানুষ সমাজে নানারূপ ঘৃণা অনেক সময় পায়, তাতে তার inferiority (হীনমন্যতা) জেগে ওঠে। সে vengeance (প্রতিশোধ) নিতে চায়, যারা তাকে অপমান ও নির্য্যাতন করছে তাদের molest (উৎপীড়ন) করতে চায়, তার জন্য হয়তো খুব equipped (প্রস্তুত) হয়, দল বাঁধে, অনেক মতবাদ ও আন্দোলন সৃষ্টি করে, কিন্তু এমনতর করার ফলে তার মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান তো গজায়ই না, এবং যাদের ঐ ভাবে একগাট্টা করে, তাদেরও প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যাদের manhood (মনুষ্যত্ব) আছে, তারা সমাজে oppressed (উৎপীড়িত) হ'লেও নিজেদের মনকে কখনও সেজন্য বিষাক্ত ও আক্রোশ-অভিভূত হ'তে দেয় না। তারা মনের শক্তির অপব্যবহার করে না। তারা বোঝে কোন্ অবস্থায় প'ড়ে কোন্ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ কী আচরণ ক'রে থাকে। তাই, তাদের নজর থাকে অপকর্ম্মের নিরাকরণের দিকে। তার জন্য লাগে সুনিষ্ঠ চলন ও আন্তরিকতাপূর্ণ মধুর ব্যবহার। কেউ যদি একজনের দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তার সঙ্গে নিষ্ঠা-নিটোল ব্যক্তিত্বের দ্যুতি নিয়ে ভাল ব্যবহার করে—হীন স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে,—তাহ'লে একদিন ঐ দুর্ব্ব্যবহার-কারীর মনে অনুতাপ জাগা ও তার পরিবর্ত্তন আসা অসম্ভব নয়। নিজের উপর অপরের অবাঞ্ছিত আচরণের প্রতিকার এইভাবে করা লাগে। অপরের উপর অন্যায়-অবিচার হ'লে সেখানে সংযতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করা লাগে—মানুষের inferior ego (হীনমন্য অহং)-কে যথাসম্ভব excite (উত্তেজিত) না ক'রে। শুনেছি, ভক্ত হরিদাসকে হরিনাম ছাড়াবার জন্য বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়, তাতেও তিনি হরিনাম ছাড়েন না, এমন-কি, যে-নবাবের নির্দ্দেশে এই সব ব্যাপার ঘটে, তাকেও তিনি প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করেন ও পরমপিতার চরণে কাতরভাবে তার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। তাঁর এই আচরণ দেখে নবাবের মনেও হরিভক্তির উদ্রেক হয়। কেষ্ট ঠাকুর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কতরকম treatment (ব্যবহার) পেয়েছেন, কিন্তু যারা অজান তাদের কারও-কারও কাছ থেকে অশিষ্ট ব্যবহার পেয়ে থাকলেও, সেজন্য ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর কখনও আক্রোশ হয়নি। তিনি ব্রাহ্মণকে বরাবর সম্মান দেখিয়ে গেছেন এবং আজীবন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। নিজের উপর অপমান গায় না মাখলেও, পিতৃ-পুরুষ, ইষ্ট, কৃষ্টি ও স্বদেশের অবমাননা বরদাস্ত করতে নেই।

সুশীলদা—অপরের অপমানজনক ব্যবহার নির্ব্বিবাদে হজম করা তো খুব কঠিন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্ত যে, তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল ইষ্টকে খুশী করা, তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা বজায় রেখে চলা, নিজের ও অপরের অমঙ্গলের পথ সঙ্কীর্ণ ক'রে মঙ্গলের পথ প্রশস্ত ক'রে চলা। এই বুদ্ধি যাকে পেয়ে বসে, অহঙ্কার, অভিমান বা আক্রোশের কাছে সে কখনও আত্মসমর্পণ করে না। সে ভাবে, প্রবৃত্তি তো আমার অনুসরণীয় নয়। আমার অনুসরণীয় হলেন ঠাকুর। বেফয়দা প্রবৃত্তির হাতে গিয়ে প'ড়ে ঠাকুরকেই বা কেন কষ্ট দিই, নিজেই বা কেন কষ্ট পাই, আবার অপরেরই বা কেন কষ্ট বাড়াই ? যারা বোঝে না, তারা তো ভুল করেই, করবেই, কিন্তু ঠাকুরের দয়ায় যখন আমি কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তা' বুঝি, তখন আমি খারাপ ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে খারাপ ব্যবহার করতে গিয়ে কেন নিজেকে loser (ক্ষতির ভাগী) করি ? ওটা হ'ল বেকুবী, অশিক্ষা বা কুশিক্ষার চিহ্ন। Profitable run in every step—there peeps education (প্রতিপদক্ষেপে লাভজনক চলন যেখানে সেখানেই শিক্ষা উঁকি মারে)। আমার লাভ হ'ল, অপরের ক্ষতি হ'ল, তাতে কিন্তু আমার ঠিক-ঠিক লাভ হ'ল না। পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে সে-ক্ষতি আমাকে একদিন-না-একদিন আক্রমণ করবেই। আমি যদি রেহাই পাই, আমার ভবিষ্যৎ বংশধররা হয়তো রেহাই পাবে না। আর, স্থূলতঃ আমি ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লেও আমার মস্তিষ্ক ও অভ্যাস-ব্যবহার ঐ আচরণের ফলে blundering bent (ভ্রান্তিপ্রবণ বাঁক) নেবেই। আর্থিক ক্ষতির চাইতে এ-ক্ষতি ভীষণতর ক্ষতি। মানুষ চিন্তা করে না, তাই অসাড়ে অপকর্ষের আরাধনা ক'রে চলে।

১৩ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৬।৪।১৯৪৮)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় দক্ষিণমুখী হ'য়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। পাবনা থেকে আগত আওলাত, মজিরদ্দি, দোখল প্রামাণিক প্রভৃতি বাইরে ব'সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সঙ্গে পাবনার পল্লীজীবনের কত প্রসঙ্গ নিয়ে সানন্দে অন্তরঙ্গ সুরে গল্পসল্প করছেন। তারাও বহুদিন পরে পরম আপন জনের সান্নিধ্য পেয়ে মহা-পুলকিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গন্ধকে আমি একটা এণ্ডি দিয়েছিলাম। ৪০ টাকার এণ্ডি ২০ টাকায় বিক্রী ক'রে ফেলল। ভালবেসে একজন একটা

জিনিস দিলে তা' বিক্রী করে কিভাবে ভেবে পাই না। শত কষ্ট হ'লেও তো তা' করা উচিত না। স্বভাবে করায়, তাই মানুষের জন্য না ক'রে পারি না। কিন্তু চারিদিকের রকম-সকম দেখে-শুনে মনে হয় মানুষ যদি নিজে বাঁচার পথে চলতে না চায়, তবে উপরপড়া হ'য়ে যার জন্য যাই করা যাক না কেন, তা' ইন্দুরের গর্ত্তে জল ঢালার মত হয়। এদের জন্য সারাটা জীবন তো কম করিনি, তেমন হ'লে সবাই ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে হ'য়ে দাঁড়াতো। কোন অভাব থাকতো না। সব চাইতে বড় গুনা হ'চ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। ঐ মাল যার থাকে, যে বেইমান, মেহেরবান, খোদাও তার কাছে হার মেনে যান।

১৪ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ দলে-দলে এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করছেন।

একটি মা দুঃখ ক'রে বললেন—ছেলেটা দিন-দিন বেয়াড়া হ'য়ে যাচ্ছে, কী যে করি তা' বুঝতে পারি না। বুঝালেও বোঝে না, শাসন ক'রেও ফল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে শাসন করা লাগে নিজেকে। যে-সব নীতিকথা নিজে পালন কর না, সেই সব নীতিকথা যদি ছাওয়ালকে শেখাতে যাও, তাতে কাজ হবে না। তোমার চলন যেন এমনতর হয়, যাতে তোমাকে শ্রদ্ধা না ক'রেই পারে না। তুমি তোমার গুরুজনদের বাস্তবে যতখানি মেনে চলবে, তাদের খুশী করার জন্য যত তুমি উঠে-প'ড়ে লাগবে, তত তোমার ছেলে তোমার বাধ্য হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা চাই যাতে তোমার মুখখানি কালো দেখলে তোমার ছেলে দুনিয়া অন্ধকার দেখে। তবেই ছেলে মানুষ করতে পারবে। আর, ছেলেকে দিয়ে যে-সব সদ্‌গুণ আয়ত্ত করাতে চাও, আগে সেগুলি তোমাকে নিজেকে আয়ত্ত করাতে হবে। শুনেছি রসুলের কাছে একটি মা তার ছেলেকে নিয়ে একদিন বললেন—'আমার ছেলে বড় মিষ্টি খায়, কিছুতেই এ-অভ্যাস ছাড়ে না। আমি গরীব মানুষ, আমার খুব কষ্ট হয়, আপনি একে একটু উপদেশ দিয়ে দেন যাতে এ মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয়।' রসুল বললেন—'একমাস পরে নিয়ে এসো।' রসুল নিজে খুব মিষ্টি খেতেন। তিনি সেইদিন থেকে তাঁর মিষ্টি খাবার অভ্যাস ত্যাগ করলেন এবং পুরো এক মাস মিষ্টি না খেয়ে মিষ্টি খাবার লোভ পুরোপুরি জয় করলেন। তারপর একমাস পরে মা ছেলেকে নিয়ে আসলেন? তখন রসুল সেই ছেলেকে মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে বললেন—কেমন ক'রে মিষ্টি খাওয়া ছাড়তে হয়।

তাঁর কথা ছেলে তখন বুঝল, সেও মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিল। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন কিনা। তাই তাঁর কথা অত কার্য্যকরী হ'ল। বহু সময় আমরা যে মানুষকে বোঝাতে পারি না, তাকে দিয়ে একটা জিনিষ করাতে পারি না, তার কারণ আমরা নিজেরা হয়তো যথাযথভাবে তা' আচরণ করি না। তাই যেভাবে বললে মানুষের মধ্যে বুঝ ও করা ফোটে, সেভাবে বলা হয় না। করা না থাকলে, আচরণ না থাকলে, সত্যিকার অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠিকভাবে বলা যায় না। আবার, একজনের হয়তো অভিজ্ঞতাও আছে, বলছেও ঠিক, কিন্তু যাকে বলা হ'চ্ছে সে যদি শ্রদ্ধাবান ও আগ্রহশীল না হয়, তাহ'লে তাতেও কিন্তু সুফল ফলে না। তাই ছেলের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যাতে পুষ্ট হয়, তাই করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত দাদাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ্ হ'চ্ছে ইষ্টের উপর অকাট্য নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। ইষ্টের চাইতে অন্য কেউ বা অন্য কিছু যদি আমাদের কাছে বড় হয়, তাহ'লে পতন অনিবার্য্য। যে-কোন কষ্ট স'য়ে, যে-কোন মূল্য দিয়ে ইষ্টনিষ্ঠাকে অব্যাহত রেখে চললে, পরমপিতা স্বয়ং তাকে পদে-পদে রক্ষা ক'রে চলেন অর্থাৎ তার যুক্তিবুদ্ধিই তাকে ভ্রম-প্রমাদের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার আশায় যারা unscrupulously (বিবেকহীনভাবে) মনকে চোখ ঠেরে ইষ্টকে sacrifice ক'রে (বিসর্জ্জন দিয়ে) চলে, শাতনই তাদের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধিবিপর্য্যয় যে তাদের কোন্ ভাগাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে চলে, তা' তারা ঠাওরই পায় না।

গোপেনদা—কেউ যদি সাময়িক ভুল ক'রে পরে অনুতপ্ত হয়, তাহ'লে কি পরমপিতা তাকে ক্ষমা করেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুতপ্তকে তিনি তো ক্ষমা ক'রেই আছেন। ঠিকঠিক অনুতপ্ত হওয়া মানে নিজের ভুল বুঝতে পারা এবং ভুল পথ পরিত্যাগ ক'রে ঠিক পথে চলতে সুরু করা। তাতে অপকর্ম্মের ফল ধীরে-ধীরে কাটেই। বুদ্ধিও পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু ভিতরে দুরিতবুদ্ধি থাকলে তা' অনুতাপ আসার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যাদের motive (উদ্দেশ্য)-ই হ'ল ঠাকুর ভাঙ্গিয়ে আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার খোরাক জোগাড় করা, তাদের পরিবর্ত্তন আসা খুব কঠিন। ধর্ম্মযাজীদের মধ্যে যদি এই ভাব prominent (প্রধান) হয়, তবে তার ফলে ধর্ম্মের উপর মানুষের অশ্রদ্ধাই বাড়তে থাকে। মতলববাজ লোকদের তাই এই divine calling (ভাগবত বৃত্তি অর্থাৎ যাজনবৃত্তি) থেকে দূরে থাকাই ভাল।

১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৪।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে বসেছেন তার পূর্বদিকে শ্রীশ্রীবড়মার ঘর।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়বৌয়ের মত নীরব কর্ম্মী পাওয়া খুব কঠিন। ওঠে কত ভোরে, একটার পর একটা কাজে লেগেই আছে। কিন্তু কোন তড়তড়ানি নেই, হৈ-চৈ নেই। আর, সব জিনিস এত গোছান ও সুশৃঙ্খল যে, দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। সংরক্ষণবুদ্ধি অসাধারণ। তার কাছে চেয়ে পাওয়া যাবে না, এমন সাধারণ সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিস খুব কমই আছে। অথচ থাকে তো ঐটুকু জায়গার মধ্যে। আর, জিনিসগুলি তা'র এমন নখদর্পণে থাকে যে কোন-কিছু চাইলে বোধ হয় চোখ বুজে তা' বের ক'রে এনে দিতে পারে।

যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন—'তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক তীরে, তাকাসনে ফিরে'—এই কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে যা'-কিছু করেছিস তাতে আটকায়ে থাকিস না, কোন-কিছুর মোহে আবদ্ধ থেকে এগিয়ে চলার পথকে অস্বীকার করিস না।

সুরেনদা—'সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

এই 'অতল আঁধারে—অকূল আলোতে' কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে বললেন—**Whatever sufferings may come, whatever enlightenment may appear, care not the least, go ahead to materialise the call of your frontman—the Ideal.**

(তোমার যে-কোন কষ্টই আসুক, যে-কোন জ্ঞানই আবির্ভূত হোক, সে-দিকে আদৌ লক্ষ্য ক'রো না, তুমি শুধু তোমার পুরোবর্ত্তী-মানবের, তোমার আদর্শের আহ্বানকে মূর্ত্ত করার পথে এগিয়ে চল।)

২০শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় যথাস্থানে সুখাসনে উপবিষ্ট।

সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি সমবেত ভক্তগণ তাঁর-শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুমঙ্গল বাণীসুধা আকণ্ঠ পান ক'রে চলেছেন।

সুরেনদার কাল রাত্রে একটা কলম হারিয়ে গেছে। প্রফুল্ল আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুরেনের কলম কি হ'ল ? তাড়াতাড়ি খুঁজে বের ক'রে দে।

প্রফুল্ল—শুনেছি মণি সেন কাল রাত্রে রাস্তায় একটা কলম পেয়েছে। সুরেনদা তার কাছে গিয়ে খোঁজ ক'রে দেখতে পারেন।

সুরেনদা সেইমত মণির কাছ থেকে কলমটা নিয়ে এসে বললেন—পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন স্নেহভরে সুরেনদাকে বললেন—Adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হও। ও-রকম কর্ম্ম আর না হয়। ভেবে-ভেবে নিজের সব ভুলত্রুটিগুলি ধরা লাগে, ঠিক করা লাগে। সর্ব্বদা conscious (চেতন) থাকতে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—একটা কাপড়ের কতকগুলি সুতো বের ক'রে নিয়ে একত্র ক'রে তার একটা অংশ জলের উপর ভিজিয়ে একটু পরেই ভাল ক'রে চেপে ফেলে আবার জলের উপর ধ'রে দেখতে হয় জল টানে কিনা। দেখবেন তো ! দেখে কী হয় আমাকে বলবেন।

সুশীলদা—আজ্ঞে ! দেখে বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সর্ব্বদা ইচ্ছা করে যে আপনারা সব হাতে-কলমে ক'রে জানেন, বোঝেন, শেখেন, প্রত্যেকে এক-একটা walking university (চলমান বিশ্ববিদ্যালয়) হ'য়ে ওঠেন।

২১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। এমন সময় উমাদা (বাগচী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ছাতা সঙ্গে রাখার কথা। ছাতা কোথায় ?

উমাদা—এখনও রোদ চেতেনি, তাই আসার সময় ছাতা আনার কথা মনে পড়েনি।

এই ব'লে উমাদা প্রণাম ক'রে বসতে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন—আগে বাড়ী থেকে ছাতা নিয়ে এসে ভুলের নিরসন ক'রে তারপর বস। নিজেকে এমন ক'রে শাসন করা লাগে, যাতে ভুল হবারই না পারে। নির্ম্মমভাবে নিজের দোষগুলি ধরা ও সে-সব শোধরান লাগে। উমাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি আগ্রহ-সহকারে শুনে বাড়ী থেকে ছাতা আনতে গেলেন।

প্যারীদা—আমরা অনেক সময় নিজেদের দোষ নিজেরা ধরতে পারি না।

আপনি যখন দোষ ধরিয়ে দেন বা বকেন, তার ভিতর-দিয়ে আপনার স্নেহ-ভালবাসাই ঝ'রে পড়ে। তাতে মনে অনুতাপ জাগে, দোষ সারাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকে এমন খোঁচা দিয়ে, মনে ব্যথা দিয়ে, মর্য্যাদায় ঘা দিয়ে, অপদস্থ করার বুদ্ধি নিয়ে দোষ দেখায় যে, তাতে নিজেকে সংশোধন করার বুদ্ধি তো জাগেই না, বরং চাপান দিয়ে উল্টো তাদের দোষের কথা ব'লে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিতে ইচ্ছা করে। অবশ্য, সে-চেষ্টা ক'রেও লাভ হয় না। আস্তে-আস্তে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-ঝগড়ি, মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'য়ে যায়। তাতেও অশান্তি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—নিজের প্রকৃত স্বার্থ-টা কী তা' ভেবে দেখতে হয়। দোষমুক্ত হওয়াই আমাদের প্রকৃত স্বার্থ। কেউ দ্রোহবুদ্ধি নিয়েও যদি আমাদের দোষ ধরে এবং সে-দোষ যদি আমাদের থাকে, তাহ'লে তা' বিনীতভাবে স্বীকার করা ভাল। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ বা গুরুজন কেউ হ'লে তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বলা ভাল—'আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন যাতে আমি সব রকম দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হ'তে পারি। আপনি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে আমার উপকার করলেন। আমি চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময় খেয়াল থাকে না।' কেউ আমাদের অহং-এ আঘাত দেওয়া সত্ত্বেও, না চ'টে ধীরভাবে আমরা যদি শুভদ বাক্-ব্যবহার নিয়ে চলি তাতে উভয়েরই ভাল হয়। আমরা ভালই তো চাই, না অন্য কিছু? মানুষকে বেকায়দায় ফেলে, জব্দ ক'রে যারা কাবেজে আনতে চায়, তারা বেকুব, আর যারা মানুষকে সদ্ভাবে খুশী ক'রে আপন ক'রে তুলতে চায়, তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। মানুষের মনটাকে থেঁতলে দিয়ে তাকে আপন করা যায় না।

প্যারীদা—যেখানে আমার দোষ না থাকে, অথচ অপরে মিথ্যা দোষারোপ করে, সেখানে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন মেজাজ ঠিক রেখে বলতে হয়—আপনি যে-অপরাধের কথা বলছেন, আমি জ্ঞানতঃ তেমন কোন-কিছু করেছি ব'লে মনে হয় না। তবে আপনার যখন ঐ রকম মনে হয়েছে, নিশ্চয়ই তার কোন সঙ্গত কারণ আছে, যা' আমি জানি না। যাই হোক, ঐ জাতীয় কোন ত্রুটি আমার অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাক্রমে যদি হ'য়ে থাকে, তা' আপনার কাছে যতখানি অনভিপ্রেত, আমার কাছে ততোধিক অনভিপ্রেত। আপনার সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক বজায় থাকুক, তাই আমি চাই। এতে আমার দ্বারা যদি কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়, তা' আমার পক্ষে পরম দুঃখের ও পরিতাপের। আদত কথা, বদমেজাজের বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন মানুষকে যেন আমরা পর ক'রে না দিই, অথচ মিথ্যা অপবাদের কাছে যেন

নতি স্বীকার না করি। চাই unyielding, untussling, tactful behaviour (নতিহীন, বিরোধহীন, সুকৌশলী ব্যবহার)। আমরা ইষ্টবিরোধী, নীতি-বিরোধী কোন-কিছুর কাছে নতিস্বীকার না করলেও ইষ্টানুগ যা', সুনীতিসম্মত যা', তা' কিন্তু সব সময় মেনে নিতে রাজী থাকব। নিজের দোষ থাকলে তা' আমরা কখনও সমর্থন করব না। অকপটে স্বীকার করব।

হীনমন্যতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নেতা যদি inferiority complex (হীনমন্যতা)-ওয়ালা মানুষ হয়, তবে তার বুদ্ধি হয় মানুষের মধ্যে inferiority (হীনমন্যতা) গজিয়ে তোলা। তাই, আমরা মানুষের মধ্যে অযথা বুদ্ধিভেদ ঘটাই। যে যে-কাজ করছে, তা' থেকে তাকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে ব্যর্থতার সৃষ্টি ক'রে দিই। হাত, পা, পেট যদি হাত, পা, পেটের কাজ না ক'রে মাথার কাজ করতে চায়, আবার, মাথা যদি আপন গরিমায় মত্ত হ'য়ে হাত, পা, পেটের সঙ্গে অসহযোগিতা করে, তাহ'লে এদের মধ্যে কে বাঁচে এবং কেমন ক'রে বাঁচে বল তো? বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা, আপন কর্ত্তব্য পালন করা, পারস্পরিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার উপর আমরা আজকাল গুরুত্ব দিই না। কোন একটা ছুতোনাতা পেলেই আমরা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলি। বিপ্র-ক্ষত্রিয় ঠিকভাবে না চললে ও সমাজের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য পালন না করলে, তা' যেমন নিন্দনীয়, বৈশ্য-শূদ্র ঠিকভাবে না চললে ও সমাজের জন্য যা' করণীয় তা' না করলে তাও তেমনি দোষণীয় ও ক্ষতিকর। কিন্তু এদের proper lead (বিহিত নেতৃত্ব) দেবার লোক কোথায়? আজকাল আমরা শূদ্রকে, বৈশ্যকে তাদের normal activity-র (সহজাত কর্ম্মের) ভিতর-দিয়ে becoming-এ (বিবর্দ্ধনে) না নিয়ে, দু'পাতা লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের সহজাত কর্ম্মকে ঘৃণা করতে শেখাই। এতে তারা কি সত্যিই লাভবান হয়? আদতে আমাদের মধ্যে আছে হীনমন্যতা, তাই বৈশ্য-শূদ্রের কাজকে আমরা ছোটকাজ ব'লে মনে করি। কিন্তু সহজাত বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী যে যে-কাজ করুক, তারই একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তোলার মধ্যেই আছে তাকে তার নিজের করণীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে সজাগ ক'রে তোলা। কৃষিকাজকে হীন কাজ মনে ক'রে যদি আমরা তা' অবহেলা করি, তাহ'লে ভেবে দেখ তো—যে দানা না হ'লে আমাদের পেট চলে না, সে-দানাটা আসে কোথা থেকে? বর্ণবিধান হ'ল different groups of specialised instinct and occupation (সহজাত-সংস্কার ও বৃত্তিসমন্বিত বিভিন্ন গুচ্ছ)। এর মধ্যে কোন বর্ণই ফ্যালনা নয়। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের

প্রয়োজন। ঋষি-আনুগত্য ও বর্ণাবিধান ঠিক থাকলে সমাজে integration (সংহতি) অব্যাহত থাকে, material ও spiritual development-এর (বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির) balance (সমতা) বজায় থাকে, এবং তা' stable (স্থায়ী) হয়, আবার eugenic life (প্রজননগত জীবন) undisturbed (বিঘ্নশূন্য) থাকে। এই ক'টা জিনিসের কিন্তু একান্ত প্রয়োজন। Integration (সংহতি) না থাকলে একক যে যত বড়ই হোক, সে বিশেষ-কিছু করতে পারে না। কারণ মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় বৃহত্তর পরিবেশের বুকে, সেই পরিবেশের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক সাপে-নেউলের সম্পর্কের সামিল হয়, তাহ'লে নিজেকে অক্ষত রাখা তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়ে। আর, একজনের material development (বৈষয়িক উন্নতি) যদি খুব এগিয়ে যায়, অথচ spiritual development (আত্মিক উন্নতি) সেই অনুপাতে না হয়, তাহ'লে egoistic, whimsical, blundering move (অহঙ্কৃত, খামখেয়ালী, প্রমাদী চলন) তাকে পেয়ে বসে প্রায়ই এবং তাতে তার জাহান্নমের পথই উন্মুক্ত হয়। আবার, material development (বৈষয়িক উন্নতি)-কে ignore (উপেক্ষা) ক'রে যারা শুধু onesided spiritual development-এর (একপেশে আত্মিক উন্নতির) দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা দায় হ'য়ে দাঁড়ায়। এটা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। আর, eugenic dislocation (প্রজননগত বিশৃঙ্খলা) হ'লে তো উন্নতির গোড়া কাটা হ'য়ে যায়। এহেন অপরিহার্য্য যে ঋষি-আনুগত্য ও বর্ণাশ্রম তা' আমরা আজ ভাঙ্গতে বসেছি। আজ উঁচুকে নীচু করতে চেষ্টা করছি। প্রতিলোমের প্রশ্রয় দিচ্ছি, profitable gene (লাভজনক জনি)-গুলিকে চিরতরে নষ্ট ক'রে ফেলছি। তাই দেশে আজ একটা মানুষ পাওয়া যায় না, এই দুর্দ্দিনে সব দিক্ সামাল দিতে পারে, এমন একটা leader (নেতা) আজ নেই। বুদ্ধিভেদ ঘটিয়ে মানুষগুলিকে ব্যাহত করছি। কোন মানুষটাই উপকৃত হচ্ছে না, সমাজও ধ্বংসের পথে চলেছে। কী-ই যে করলাম। আজ ভাল কুকুর, গরু, ঘোড়া করবার জন্য আমাদের যতটুকু দরদ আছে, ভাল মানুষ সৃষ্টির জন্য ততটুকু চিন্তা নেই।

একটি দাদা বললেন—হাউজারম্যানদার মা'র কাছে শুনেছি, মেয়েদের নীচু ঘরে বিয়ে হওয়া ওদের দেশেও পছন্দ করে না।

হাউজারম্যানদা—আমাদের দেশে a woman marrying beneath her (নারীর নিম্নস্তরে বিয়ে) ব'লে slur (কলঙ্ক) আছে, কিন্তু a man marrying beneath him (পুরুষের নীচু ঘরে বিয়ে) ব'লে কোন censure (নিন্দা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে প্রসন্নমনে একটু হাসলেন।

প্রফুল্ল—ছেলেদের শিক্ষা একটা স্তর পর্য্যন্ত একই রকম রেখে, তারপর তো বর্ণানুপাতিক আলাদা করা উচিত। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ থাকা উচিত, যাতে বিভিন্ন বর্ণের ছাত্রদের স্ব-স্ব বর্ণানুগ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষিত ও সুপটু ক'রে তোলা যায়।

যোগেনদা (হালদার)—তা' কেন? সবই তো শিখবে সবাই। এবং সেগুলি তারা apply (প্রয়োগ) করবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, matric (প্রবেশিকা) পর্য্যন্ত সকলের education (শিক্ষা) common (এক) থাকল। তারপর all the philosophies, sciences and arts (সমস্ত দর্শন, বিজ্ঞান ও কলা) subject (বিষয়বস্তু) হ'ল বিপ্রদের। তারা physics (পদার্থ বিজ্ঞান), chemistry (রসায়ন-শাস্ত্র), mathematics (গণিত), biology (জীববিদ্যা), genetics (প্রজনন-বিজ্ঞান), art (কলা), literature (সাহিত্য), culture (কৃষ্টি), psychology (মনোবিজ্ঞান), medicine (চিকিৎসাশাস্ত্র), philosophy (দর্শন), theology (ধর্মতত্ত্ব) ইত্যাদি বিষয়গুলির theoretical ও practical side (তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক্) সম্বন্ধে এমন thorough knowledge (পুরো জ্ঞান) acquire (অর্জ্জন) করবে, যাতে তারা সকলকে finer and finer progressive service (সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর প্রগতিশীল সেবা) দেওয়া ও নানা-ভাবে পূরণ করার ব্যাপারে active efficiency-তে (সক্রিয় দক্ষতায়) উন্নীত হ'য়ে ওঠে। অন্য সব বর্ণকে ভাল ক'রে সেবা ও পোষণা দেবার জন্য, বিপ্র সব বর্ণের কাজই শিখবে, সব বর্ণের কাজই করতে পারবে, কিন্তু সেটা শিক্ষাদান হিসাবে, জীবিকা হিসাবে নয়। সে চর্ম্মকারকে জুতো শেলাইয়ের কাজ শেখাতে পারে, কিন্তু জুতো শেলাইয়ের কাজ সে profession (বৃত্তি) হিসাবে নিতে পারে না। ক্ষত্রিয়রা শিখবে politics (রাজনীতি), history (ইতিহাস), administrative affiairs (শাসন-সংরক্ষণ ও পরিচালনা সম্পর্কিত কার্য্যাবলী), diplomacy (কূটনীতি), defence (প্রতিরক্ষা), law (আইন), publicity and propaganda (প্রচার-বিভাগীয় কাজ), military science (সামরিক বিজ্ঞান) in all aspects both theoretically and practically (তত্ত্বের দিক দিয়ে ও হাতে-কলমে সব দিক থেকে)। বৈশ্যরা agriculture (কৃষি), industry (শিল্প), economics (অর্থনীতি), engineering and techno-logy (যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরী বিদ্যা), crafts (শিল্পবিদ্যা), commerce

(বাণিজ্য), trade (ব্যবসায়), transport (পরিবহন), accountancy and audit (হিসাবরক্ষা ও হিসাব পরীক্ষা), irrigation (জলসেচের কাজ), fertiliser production (সার উৎপাদন), geography (ভূগোল), botany (উদ্ভিদবিদ্যা), nurture and improvement of live-stock with an applied knowledge of animal-breeding (পশু-প্রজননের প্রয়োগিক জ্ঞান-সহ পশুপালন ও পশুর উন্নতি-বিধান) ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করবে, যাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। শূদ্রদের শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল হাতে-কলমে বিভিন্ন বর্ণকে বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে সেবা, পরিচর্য্যা ও সাহায্য করা। এইসব বিষয়ে যাতে তারা সুপটু হ'য়ে ওঠে, সেইজন্য তাদের সঙ্গে রেখে প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিতে হবে। করার পথে সেই বিষয়ক theory (তত্ত্ব), যেমন যতটুকু তাদের মাথায় ধরে, তেমনি ততটুকু ধরিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য বর্ণের শিক্ষার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তারা physical labour (কায়িক শ্রম)-কে কেউ ignore (উপেক্ষা) না করে। আমাদের দেশে intellectual culture (বুদ্ধিগত অনুশীলন)-এর উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে উচ্চবর্ণের physical efficiency (শারীরিক পটুতা) ক'মে গেছে। এটা জাতির উন্নতির পক্ষে একটা অন্তরায় স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আবার, physical unfitness (শারীরিক অপটুতা) থেকে একটা wrong psychology ও false sense of prestige (ভ্রান্ত মনোবিজ্ঞান ও ভ্রান্ত আত্মমর্য্যাদাবোধ) জাতির মধ্যে বাসা বেঁধেছে, যার দরুন dignity of labour (শ্রমের মর্য্যাদা)-সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'তে পারিনি। এই শ্রমবিমুখতার জন্য unemployment problem (বেকার-সমস্যা) আজ এত acute (তীব্র) হ'য়ে উঠেছে। আর, প্রত্যেকে মাতৃভাষা ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্য যত ভাষা শেখে ততই ভাল। নিখুঁত মৌলিক চিন্তা ও যথাযথ মৌলিক প্রকাশ-ক্ষমতার উপর জোর দিতে হবে। তাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠবে।

যোগেনদা—এ ব্যাপারে আমাদের আর কী করণীয় আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজের সেবার জন্য প্রত্যেকে তার সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী thorough training (পুরো শিক্ষা) নেবে। প্রত্যেককে এ-ব্যাপারে efficient ও active (দক্ষ ও সক্রিয়) ক'রে তুলতে হবে। তাই, প্রত্যেক বর্ণের ছেলেরা নিজেদের affair (কাজ) ভাল ক'রে এন্তামাল করবার জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য যাবতীয় subject (বিষয়) যতখানি প্রয়োজন ঐ basic channel-এর (মূল ধারার) ভিতর-দিয়ে শিখবে। All the sub-sections that help the instinctive

profession (অন্যান্য গৌণ বিভাগ ও বিষয়, যেগুলি সহজাত বৃত্তিকে সাহায্য করে) details-এ (বিশদভাবে) শিখতে হবে। সেইজন্য চাই আদর্শকে সঞ্চারিত করা—দীক্ষা, যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতিকে উচ্ছল ক'রে। এইটে করতে পারলে একটা education-এর (শিক্ষার) climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি হবে। আর একটা কথা—নবশাখদের কাজগুলি যেন ঠিক থাকে, এদের প্রত্যেকটা group-এর (শ্রেণীর) একটা specific (বিশেষ) বৃত্তি আছে। সেটা যেন না ভাঙ্গে। যারা honestly ও efficiently (সদ্ভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে) স্বাধীন সহজাত বৃত্তি নিয়ে চলে, তাদের ভিতর কিছু-কিছু ভাল trait (গুণ) তাজা থাকে। গোলামী করলে মনুষ্যত্বের অনেক মান এ-ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। আপনারা অনেকে allowance (মাসোহারা) নেন, ওটা আমার ভাল লাগে না। বাঁধা মাসোহারা নিলে চাকুরিয়া মনোবৃত্তি এসে যায়। এতে আপনাদের অনেক দিক্ দিয়ে ক্ষতি হ'য়ে যাবে, যে-ক্ষতির তুলনা হয় না। আর, আপনাদের ক্ষতি হ'লে সেটা আমারই ক্ষতি। আমি ভাবি, আপনারা ঋত্বিক্‌রা কবে ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াবেন এবং প্রত্যেকে নিজের সংসার ভালভাবে চালিয়ে আরও দু-দশটা সংসার চালাবার দায়িত্ব নেবেন। জানবেন—আপনাদের লোকপালী নেশা ও অভ্যাস প্রবল হ'য়ে না উঠলে আপনারা নিজেরাই খাটো হ'য়ে থাকবেন। হয়তো টাকার জন্য যত্রতত্র হাত কচলাবেন। ভাবতেও কষ্ট লাগে।

কালিষষ্ঠীমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিভরা মুখে বললেন—তুই ক'নে যাস? এত্তোরে (এখানে) ব'সে থাকার পারিস না?

কালিষষ্ঠীমা নিজস্ব ভঙ্গীতে টেনে-টেনে বললেন—আমি কি সেই কপাল ক'রে আইছি যে আপনার কাছে ব'সে থাকবো? মন চা'লিও তো পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথাটি দুলিয়ে প্রীতিমধুর কণ্ঠে বললেন—হুঁ!

শুধুই মুখের হাই
তোমার জন্যে পরাণ কাঁদে
দেওয়ার কিছুই নাই।

গুরুগম্ভীর পরিবেশ সহসা সহজ, হাল্কা ও হাস্যসরস হ'য়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে নিঃশব্দ মধুর হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত সকলেও মৃদু-মৃদু হাসছেন।

২২শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৫।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), হরেনদা

(বসু), গোপেনদা (রায়), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতির সঙ্গে নানা বিষয়ে গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ক'রে চলেছেন।

প্রফুল্লদা আত্মসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ ক'রে বললেন—আমরা ধর্ম্মের পথে চলছি, সাধারণ মানুষের থেকে আমরা তো অর্থ, মান, যশ, ক্ষমতা—সবদিক দিয়ে বড় হব!

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্ত ভঙ্গীতে হাত নেড়ে স্নেহল ভর্ৎসনার সুরে উত্তর দিলেন—সাধারণ লোকের থেকে তোমরা বড়ই আছ, কারণ, তোমরা পরমপিতার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছ। কিন্তু তাহ'লে কী হবে? ধর, একজন জমিদারের ছেলে, কিন্তু সে মাতাল। সে তার বাবার পয়সা দিয়ে বাবার কোন সদিচ্ছাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলল না, বাবার তুষ্টি-তৃপ্তির ধার ধারলো না, ছুটল খেয়ালের পিছনে, নিজের দুষ্কর্ম্মের ইন্ধন জুগিয়ে নিজের সৌভাগ্য খোয়াল। Fortunately born but a begetter of his own misfortune (সৌভাগ্যশালী হ'য়ে জন্ম হ'ল কিন্তু নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা হ'ল)। তোমাদের অনেকের পক্ষেও হয়েছে অমনতর। পরমপিতার দয়ায় যা'-যা' পাওয়ার সে সবই পেয়েছ, কিন্তু নিজের চেষ্টায় যে-চরিত্র গ'ড়ে তুলতে হয়, তা' গ'ড়ে তুলছ না। তাই, তাঁর অহৈতুকী দয়াটা ধারণ করতে পারছ না, বহন করতে পারছ না। সবই বরবাদ ক'রে ফেলছ। তোমরা ধর্ম্মের কথা মানুষের কাছে যতখানি বলছ, তার সিকিটুকুও ক'রে দেখাচ্ছ না। আবার, ধর্ম্মের কথা, ইষ্টের কথা যে কও, তাও হয়তো প্রবৃত্তিপূরণের উদ্দেশ্যে। এই সব মতলববাজীর মধ্যে ধর্ম্ম কোথায় আর তার ফলই বা কোথায়? ধর্ম্মটা প্রধানতঃ করার জিনিস, শুধু কওয়ার জিনিস নয়। অন্যকে দান করতে বলছ, কিন্তু নিজে to the utmost of your power (তোমার সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত) দান করছ না। Service-এর (সেবার) কথায় মুখে খই ফোটে, কিন্তু কারও কাছে গিয়ে এক গ্লাস জল ভ'রেও দেও না। এইসব কপটতা ও ভণ্ডামি ত্যাগ না করলে ধর্ম্ম কী বস্তু, তা' কখনও উপলব্ধি করতে পারবে না। তাতে তোমরা নিজেরাও যেমন হতাশ হবে, অপরেও তোমাদের দেখে তেমনি হতাশ হবে। কিন্তু তা' তোমরা হ'তে দেবে কেন? Do and have (কর এবং পাও)। এখনই লেগে যাও। তবে নিজের স্বার্থচাহিদাকে আমল দিও না। ইষ্টই তোমাদের একমাত্র স্বার্থ হউন। তাতে তোমাদের সত্তাসম্বর্দ্ধনার জন্য যেমন যা' প্রয়োজন, তার কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না। ফল কথা, আমরা প্রবৃত্তি-বশে যেমন যা' চাই, তেমন তা' না পেলে দুঃখিত হবার কিছু নেই। তাঁর যা' মর্জ্জি, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়—তাই-ই তিনি আমাদের দেন কর্ম্মফলের বিধিকে

উল্লঙ্ঘন না ক'রে। তাই, নিজের খেয়াল-খুশী ও চাহিদা নিয়ে obsessed (অভিভূত) না হ'য়ে অনুযোগ-অভিযোগ না ক'রে, সব অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব শান্তচিত্তে ইষ্টের ইচ্ছাপূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। এই হ'ল সুখী ও সার্থক হওয়ার তুক।

প্রফুল্লদা—ইষ্টের ইচ্ছাপূরণের জন্য কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-যা' করার কথা বলা আছে, সে-সব করবে। নিজে কাঁটায়-কাঁটায় পরমপিতার পথে চলবে এবং পরিবার-পরিবেশকেও সেই পথে চলতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ, নিজে আচরশীল হ'য়ে যাজন করবে, দীক্ষা দেবে। আবার, প্রত্যেকে যাতে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সদাচার, ঋত্বিকী ইত্যাদি পালন করে, পরিবেশের সেবা-সাহায্য করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। মানুষগুলিকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। কত বলা আছে, করলেই হয়। একটা কথা সব সময় মনে রেখো—ভগবান্‌কে ভাঙ্গায়ে আত্মস্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক'রো না, কিন্তু নিজেকে ভাঙ্গায়ে তাঁকে fulfil (পূরণ) করতে কসুর ক'রো না। তুমি বাস্তব সক্রিয়তায় সর্ব্বতোভাবে তাঁরই হ'য়ে ওঠ—unconditionally and unexpectantly (নিঃসর্ত্তে ও অপ্রত্যাশী হ'য়ে)। তখন প্রকৃতি প্রতি-পদক্ষেপে তোমাকে এন্তার অবদান জুগিয়ে চলবেই কি চলবে। কিন্তু সাবধান ! ঐ সব পেয়ে ওগুলিতে যেন আবদ্ধ ও আসক্ত হ'য়ে প'ড়ো না। তাঁর দয়ায় যা' পাও যত পার তাঁর সেবায় নিয়োজিত ক'রো। পরিবেশের সত্তাপোষণী সেবা, সেও কিন্তু তাঁরই সেবার অন্তর্গত। অনাড়ম্বরভাবে সপরিবার নিজের অস্তিত্বরক্ষা —তারও উদ্দেশ্য প্রিয়পরমের সেবা। ইষ্টৈকলক্ষ্য হ'তে পারলে মুক্তি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিছুই তখন আর আমাদের ইষ্ট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

—এই সেবা ! একটা ন্যাতা নিয়ে এসে বারান্দার জলখানি মুছে ফেল্। কেউ হয়তো জল নেবার সময় ফেলে গেছে, খেয়াল করেনি। ছাওয়াল-পাওয়াল সব সময় ঐ জায়গা দিয়ে ঘোরে। কেউ হয়তো আছাড় খাবিনি—গভীর আলোচনার মধ্যে চকিতে ব'লে নিলেন ঠাকুর। সেবাদিও তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

পূর্ব্ববৎ আলোচনার স্রোত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলল।

আগের কথার সূত্র ধ'রে প্রফুল্লদা বললেন—যা' করবার তিনি তো করিয়ে নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ক'রে দিয়েছেন তোমায় thoroughly independent

(পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন)। এখন তিনি আর কী করবেন বল ? তিনি তোমার মুখ চেয়ে ব'সে আছেন। তিনি সৎপ্রেরণা জোগাতে পারেন, কিন্তু করাটা যে তোমার হাতে। তুমি যদি না চাও ও না কর তাহ'লে তোমার নিজস্ব পাওয়াটা ও হওয়াটা যে হয় না। তুমি বঞ্চিত হও। এই হ'ল অকাট্য বিধান। তুমি তোমার বাবার থেকে এসেছ, কিন্তু তোমার বাবা খেলে কি তোমার পেট ভরে ? তাই ফাঁকিবাজী ছেড়ে দিয়ে প্রাণভরে তাঁকে চাও ও তাঁর জন্য কর। তখন বুঝতে পারবে এক লহমার জন্যও তিনি তোমাকে ছাড়েননি, তোমার শত অপরাধ সত্ত্বেও পদে-পদে তিনি তোমায় রক্ষা ক'রে চলেছেন। আরো দেখতে পাবে—সৎপথে চলার ক্ষেত্রে সর্ব্বদা তিনি তোমার সহায় হ'য়েই আছেন।

প্রবোধদা—ইষ্টকে ঠিকভাবে ধরা যায় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর-কঠোর কণ্ঠে বললেন—বৌকে ঠিক ক'রে ধর কি ক'রে ? ছেলেকে ঠিক ক'রে ধর কি ক'রে ? আর ইষ্টকে ঠিক ক'রে ধরার বেলায় যত প্রশ্ন ! ভেবে দেখ, এখনই যদি টেলিগ্রাম আসে—বাড়ীতে অসুখ। যেয়ে কেঁদে পড়বে একজনের কাছে, ২০০ টাকা না হ'লেই নয়। পট্ করে জোগাড় ক'রে ছুট ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলবে। প্রাণের টান থাকলে অমনিই করা আসে। আর, এই টানটা গজিয়েছে কিন্তু তাদের আপন ব'লে ধ'রে নিয়ে তাদের জন্য ক্রমাগত ভাবা, বলা, করা, খাটাখাটি, ছোটাছুটির ভিতর-দিয়ে। ইষ্টের বেলায়ও ঠিক ঐ একই কথা। ইষ্ট আমাদের জন্য যতই করুন না কেন, তাতে কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের টান গজাবার পক্ষে সুবিধা হয় না। আমরা তাঁর প্রীত্যর্থে তাঁর জন্য যত বেশী করি, ততই কিন্তু তিনি আমাদের অন্তরে গেঁথে যান।

প্রফুল্লদা—কায়দা পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মেয়েমানুষ বাগাবার ইচ্ছা করলে তো খুব কায়দা পাও। কোন অসুবিধা গায় লাগে না। সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য কর।

প্রফুল্লদা—চেষ্টা ক'রেও পারা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে-কথায় আমল না দিয়ে তীব্র ওজস্বিতায় বললেন—ও-সব কথা ক'স না। চেষ্টা ক'রে আবার পারা যায় না। ও না-করার কথা। যাকে চাই, ঈপ্সিত যে, তার জন্য যত খাটি, গায় লাগে না। শালা ! মেয়েমানুষ বাগাতে কত খাটা লাগে—ঢিলের মধ্য-দিয়েই হয়তো রাত দুপুরে দৌড় মারতে হ'ল। কত ফন্দী, কত কায়দা করা লাগে। কত রূপ ধরা লাগে শুধু ঐ মিহি দাঁতের হাসিটুকু দেখবার জন্য। ঐ রূপ কত ধ্যানই না করি। পাগলের মত ঘুরি, ভূতের মত খাটি। কত করলাম, তবু গায় লাগে না। বেহাতি হ'য়ে গেলে লাগে।

প্রবোধদা—তা'হলে কি আমাদের সব বেহাতি হ'য়ে যাচ্ছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার উত্তর তোমার কাছেই আছে। Wiser is he, who can see and reckon his faults and adjust accordingly for betterment and thus he is a man of deeper insight (যে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে, নির্দ্ধারণ ক'রে নিজেকে আত্মোন্নয়নের দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সে বিজ্ঞতর এবং এইভাবেই সে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে।) নিজের দোষগুলি আবিষ্কার ক'রে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে-করতে insight (অন্তর্দৃষ্টি) বেড়ে যায়। গভীরভাবে ইষ্টে-সংলগ্ন হ'য়ে প্রবৃত্তি থেকে একটু আলগা হ'য়ে না দাঁড়াতে পারলে, প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে চেনা যায় না। নিজের মধ্যে কোন্‌টা কতখানি সত্তাপোষণী ও ইষ্টার্থপোষণী এবং কোন্‌টা কতখানি প্রবৃত্তিপোষণী ও অনিষ্টকর—এই বিচার-বিশ্লেষণ ও বিভেদ যে না করতে পারে, তার insight (অন্তর্দৃষ্টি) খুলেছে—এ কথা বলা চলে না, তা' তার তথাকথিত জ্ঞান যতই থাকুক না কেন। আবার, শুধু নিজের দোষ ধরতে পারলেই হবে না, তা' স্বীকার ও সংশোধন করতে হবে। তা' যে করে, তাকেই বলে বুদ্ধিমান, তাকেই বলে জ্ঞানী।

প্রফুল্লদা—আমরা তো চাই-ই আপনার কাজ ভালভাবে করতে, আর তা' পারি না বলেই তো কষ্ট বোধ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বটে, তবে আমি হয়তো বললাম—অপকর্ম্ম ক'রো না। কিন্তু প্রবৃত্তি যখন ঠেসে ধরল, তখন হয়তো বেহাল হ'য়ে 'জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর' ক'রে অপকর্ম্মের স্রোতেই গা ঢেলে দিলে। তারপর অনুতপ্ত, অবসন্ন হ'য়ে ভেটকি মেরে ব'সে পড়লে, ঠাকুরের কথা মনে করতে লাগলে, মনে-মনে সঙ্কল্প করলে অমনতর অকাম আর কখনও করবা না, কিন্তু তারপরও যদি আবার ঐ কাম কর, তবে বুঝতে হবে তোমার ঐটেই চাওয়া—তা' মুখে তুমি যা'ই বল না কেন!

প্রফুল্ল—এ বিষয়ে আপনার দু'টি ছড়া আছে খুব সুন্দর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনাস্ না ক্যা!

তখন ছড়া দুটি আবৃত্তি করা হ'ল—

"মুখের বুঝে যাই বল না
চলছ তুমি যা' ক'রে,
সেটাই কিন্তু আছে মাথায়
যা'ই বল যে-বোল ধ'রে।"

"যাতেই তুমি নিয়োজিত
করছ তুমি যা',

ভগবানের দৃষ্টি তাতেই
'ভাব' বা 'চিন্তায়' না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললেন—একেবারে টাটকা কথা!

প্রফুল্লদা—Organisation-work (সংগঠন-কর্ম্ম) নিয়ে আছি। যা' পারি করি, এই যা' মনে সান্ত্বনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—আলোর কাছে দাঁড়ায়ে ফড়িং ধ'রে খাচ্ছ, এখানকার স্রোতের মধ্যে প'ড়ে যা' হোক ক'রে চলছ। ভেবে দেখেছ কি সত্যিকার organisation-work (সংগঠন-কর্ম্ম) কতখানি করছ? আর, সে ধান্ধাই বা তোমাকে কতখানি পেয়ে বসেছে? Organisation (সংগঠন) মানে to set up everybody at his instinctive work to fulfil the principle (ইষ্ট-পরিপূরণার্থে প্রত্যেককে তার সহজাত সংস্কার-সম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা)। নিজেই যদি তা' না হই, নিজেকে যদি organised (সংগঠিত) না ক'রে থাকি Ideal-এ (আদর্শে), তবে অন্যকে তা' কি ক'রে করাব? নিজেকে খাঁটি-খাঁটি ইষ্টরাগরঙিল ক'রে তোল, তাহ'লে যেই তোমার সান্নিধ্যে আসুক, সেই তোমার কাছ থেকে কিছু পাবে। আলোমুগ্ধ হও, তখন নিজেও আলোয় উদ্ভাসিত হবে, অন্যকেও আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারবে। মেয়েছেলে ও টাকাপয়সার উপর লোভ করতে যেও না। বিল্বমঙ্গল নাটকের মধ্যে যেমনতর আছে—থাকো! তোমায় কৃষ্ণপ্রেম শেখাব'—যাজন করতে গিয়ে অমনতর রকমে কোন মায়ের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হ'তে চেষ্টা ক'রো না। যা'হোক, জবর লিখে গেছে বটে গিরীশ ঘোষ। কথা খেলাপ ক'রো না, আর মেয়েছেলে থেকে respectable distance (সম্মানযোগ্য ব্যবধান) বজায় রেখে চ'লো।

প্রফুল্ল—অন্যায় করার পর অনুতাপ ক'রে আবার যদি বার-বার সেই অন্যায় করে, তবে সেটা কি অনুতাপ নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকার অনুতাপ নয়। মৌখিক অনুতাপ।

প্রফুল্ল—কিন্তু অন্যায় করলেই যে মানুষের বিবেকে ধাক্কা লাগে, বুকটা দুর্ব্বল লাগে, ভিতরটা জ্বলে যায়, তা' কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যায় করলে existence (অস্তিত্ব) শীর্ণ হ'য়ে পড়ে, তাই existence (অস্তিত্ব)-ই তাকে repel (প্রতিরোধ) করতে চায়। অবশ্য, বার-বার অন্যায় করতে-করতে মানুষ আবার callous (সূক্ষ্ম-বোধশক্তিহীন) হ'য়ে পড়ে। অন্যায়কে অন্যায় ব'লে বুঝেও অহং-এর খাতিরে যারা যুক্তি-বিচার খাড়া ক'রে তা' সমর্থন ক'রে চলে, তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে না, অপরেরও ক্ষতির

কারণ হয়। কারণ, অজান মানুষ তাদের ঐ যুক্তিবিচারে বিভ্রান্ত হ'য়ে ভুল পথে চালিত হ'তে পারে।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—নিজেকে পুরোপুরি সংশোধন করা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু খারাপ অভ্যাস তো ছাড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের মধ্যে খারাপও আসে, ভালও আসে। যারা খারাপ চায়, তারা খারাপের কাছে yield (আত্মসমর্পণ) করে। আর, যারা ভাল চায়, তারা ভালর কাছে yield (আত্মসমর্পণ) ক'রে ভাল কাজ নিয়ে actively engaged (সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত) থাকে। ভিতর ও বাইরের খারাপ প্ররোচনায় সায় ও সাড়া না-দেওয়ার জন্য তারা সজাগ ও বদ্ধপরিকর থাকে। আমরা যা'ই হই না কেন, কায়মনোবাক্যে আমরা যা' চাই, তা' আমরা পাই-ই কি পাই—যে-ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই তিলবাটা রোজ খাচ্ছিস তো ?

প্যারীদা—মাঝে-মাঝে বাদ প'ড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাদ দেওয়া ভাল না। তোর শরীর ভাল না থাকলে আমারই মুশকিল। আমার জন্যই তোর শরীর ভাল রাখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহকোমল কথাগুলি শুনে শুধু প্যারীদার নয়, উপস্থিত সকলেরও প্রাণ জুড়িয়ে গেল। রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড তাপ ক্ষণেকের তরে কোথায় যেন অবলুপ্ত হ'য়ে গেল।

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৫।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় সুখাসনে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (কর্ম্মকার), কেষ্টদা (চ্যাটার্জ্জী), যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস), কালিদাসীমা, রাণীমা, রেণুমা, সৌদামিনীমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গে বললেন—বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী day to day (দিনের পর দিন) পরিবেষণের ব্যবস্থা করা লাগে through dailies (দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের ভিতর-দিয়ে)। আর, mission-work (প্রচার-কাজ) জোরসে চালাতে হয়। শত-শত ঋত্বিক্ all over India (সারা ভারতে) from door to door (দ্বারে-দ্বারে) ঘুরবে। তারা এন্তার মানুষকে initiate ক'রে (দীক্ষা দিয়ে) এখানে পাঠাবে। আর, local workers (স্থানীয় কর্ম্মী) create (সৃষ্টি) ক'রে তাদের সঙ্গে একযোগে

সবাইকে nurture (পোষণ) দেবে, service (সেবা) দেবে, mould (নিয়ন্ত্রিত করবে, organise (সংগঠিত) করবে। একটা মানুষও যাতে অপারগ ও অসুখী না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। প্রত্যেকটা পরিবার যাতে উচ্ছল ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, হাতেকলমে তা' ক'রে দেখাবে। ঋত্বিক্‌দের নিষ্ঠা, চরিত্র-গরিমা ও সেবাবুদ্ধির দৌলতে ভারত আবার সোনার ভারত, দেবভারত হ'য়ে উঠবে বাস্তবে। ধর্ম্মের কী রূপ, ধর্ম্ম পালন করলে কী হয়—তা' মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে।

এরই সঙ্গে-সঙ্গে এই কাজের পরিপোষক হয় এমনতরভাবে এইসব divine ideology-র (ভাগবত ভাবধারার) পরিবেষণ চাই দোয়াড়ে। conviction (প্রত্যয়) আছে, আচারবান, ভাল বলতে-কইতে-লিখতে পারে—এমনতর কিছু কর্ম্মী চাই, যারা article (প্রবন্ধ), report (সংবাদ) ইত্যাদি লিখে রোজ কাগজে পাঠাবে। তাদের লেখার ধরণ এমন হওয়া চাই যাতে প্রত্যেকেরই মনে ধরে, যাতে প্রত্যেকেই মনে করতে পারে যে তা' তার নিজেরই কথা, তার সত্তারই কথা, তার সত্যিকার স্বার্থেরই কথা। এই দুটো কাজ বাদ দিয়ে লাখো ডাল জোড়ো, তাতে কিন্তু গুঁড়ি হবে না। বটগাছের শত ডাল থাক, বটগাছের গুঁড়ি না থাকলে, বটগাছ হবে না। এখন সেই গুঁড়ি যাতে শক্ত হয় সেই দিকে নজর দিতে হবে। দীক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়বে, তারা যত আচরণশীল হবে, এবং জনমন যত ইষ্টকৃষ্টিমুখী হবে, ততই দেশের ভিত শক্ত হবে। কয়েকটা ভাল কাগজের সঙ্গে ব্যবস্থা করা লাগে, আর রোজ লেখা supply (সরবরাহ) করতে হয়। লেখাগুলি হওয়া চাই tonic-এর (বলকারক ওষুধের) মত, যাতে মানুষ সেগুলি প'ড়ে তাজা, তরতরে হ'য়ে ওঠে। এমন হ'লে সেগুলি পড়ার জন্য মানুষ আকুল, উন্মুখ হ'য়ে উঠবে। কাগজগুলির চাহিদাও বেড়ে যাবে।

'রঙ্গনভিলা'র মালিক সৌরীনবাবু (মৌলিক) সস্ত্রীক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তাঁরা উভয়েই বললেন—আপনি যদি দয়া ক'রে বাড়ীটা এখন ছেড়ে দেন, তাহ'লে আমাদের খুব উপকার হয়। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকাড়া আবদারের সুরে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে সৌরীনবাবুর স্ত্রীকে বললেন—আমি বাচ্চা, তুই মা, তুই আমার থেকে ঢের বড়। তুই আমার আশ্রয়। আমি একজন great sufferer (মস্ত দুর্ভাগা)। আমার মত sufferer (দুর্ভাগা) আর নেই। আমার প্রায় দুই কোটি আড়াই কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু পরমপিতার দয়ায় মানুষগুলি আছে। তাদের নিয়েই আমি। তারা সুস্থ-স্বস্থ থাকলে সব আবার গজিয়ে উঠবে। কিন্তু এই অসময়ে আমি

তাদের না দেখলে কে তাদের দেখবে ? এখন কেবলই লোক আসছে, কোথায় তাদের আমি আশ্রয় দিই ?

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর সৌরীনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে সবিনয়ে বললেন —আমাকে যদি favour (অনুগ্রহ) করেছেন, আর একটু favour (অনুগ্রহ) করুন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দেন। দেখুন, নিজে আমি ঐ বাইরে থাকি। একটা চালাঘরে রান্না হয়। আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন তো ?

সৌরীনবাবু—আপনি বাবা, আপনি নিজে কষ্ট ক'রে থাকেন, ছেলেদের, মায়েদের ভাল জায়গায় থাকতে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুর মত সরল, সহজ, স্বাভাবিকভাবে বললেন—আপনিও আমার বাবা। বাবা আছেন, মা আছেন—আপনাদের কাছে ছেলে আমি আবদার জানাচ্ছি। গরীব বামুন আমি—আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই যাতে ওখানে থাকতে পারি।

উভয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। 'রঙ্গনভিলা' ছাড়ার কথা দ্বিতীয়বার আর উচ্চারণ করলেন না।

ওঁরা ডাক-বাংলোয় উঠেছেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সঙ্গে বললেন— আমি এখানে থাকতে আপনি ডাক-বাংলোয় উঠলে মনে হয় আমি যেন pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হ'য়ে গেছি।

২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বর্দ্ধমানের বলাইদাকে (ঘোষ) বললেন—এখানে নূতন ক'রে প্রেস করতে হবে। তুই এখন থেকে লোক জোগাড়ের তালে থাক—যারা হবে মুখমিষ্টি অথচ fanatic to the principle (আদর্শে সুনিষ্ঠ)। কারও হুপকানিতে তাদের ডরালে চলবে না। সব তাফালের মধ্যে তাদের মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কাজে লেগে থাকতে হবে। কখনও দু'মুঠো জুটবে, কখন তাও জুটবে না। তৎসত্ত্বেও হাসিমুখে স্ফূর্ত্তিতে এখানকার মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকতে হবে। খামাকা কেউ হয়তো খোশ-খেয়ালে বিশ্রী অপমান ক'রে ছেড়ে দেবে। ও-সব গায় না মেখে একমাত্র ইষ্টের মুখের দিকে চেয়ে নিজের করণীয় ক'রে চলতে হবে।

প্রফুল্ল—একজন ভক্তিমান লোক হয়তো ইষ্টসান্নিধ্যে থাকার প্রলোভনে দুষ্টলোকের উৎপাত, অত্যাচার স'য়ে-ব'য়ে চলল, কিন্তু যদি কেউ অযথা অপরের জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তোলে, তার কি উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মফল কেউ এড়াতে পারে না। দুষ্কর্ম্মের জন্য যার যে-

সময়ে যে-শাস্তি পাবার তা' সে পায়ই। একটা লোক দুষ্কর্ম্ম করছে। অথচ যদি দেখা যায় মোটামুটি ভাল আছে, তার মানে ভাল থাকার মত কিছু সৎকর্ম্ম তার করা আছে, যার সুফল সে নিজ হাতে খোয়াচ্ছে। ভগবান অনেক স'য়ে-ব'য়ে দয়াপরবশ হ'য়ে আমাদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখেন, যাতে আমরা নিজেদের শুধরে নিতে পারি। তাঁর সেই করুণার সদ্ব্যবহার না ক'রে আমরা যদি আমাদের life and energy (জীবন ও শক্তি) শয়তানের সেবায় লাগাই, তবে শয়তান তার পুরস্কার দিতে ভুল করে না। পতিত করা, পাতিত করা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিদীর্ণ-বিশীর্ণ করাই শাতনের সাদর উপঢৌকন। কিন্তু আমরা যদি মানুষের ভালই চাই, আমাদের শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলা লাগে যাতে শাতন আমাদের কাউকে আক্রান্ত ও অভিভূত করতে না পারে। কেউ যদি অযথা কারও উপর অত্যাচার করতে চায়, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই লাগে। অন্যকে যদি নির্ব্বিবাদে অত্যাচারিত হ'তে দিই তার মানে আমি এমন অবস্থার সৃষ্টি করছি যে আমি যদি অকারণ অত্যাচারিত হই, তার বিরুদ্ধে কেউ রা কাড়ার থাকবে না। ধর্ম্মের পথে যে চলবে তার নিজের খারাপ হ'তে নেই, খারাপ করতে নেই এবং অপরকেও খারাপ হ'তে দিতে নেই ও খারাপ করতে দিতে নেই। মানুষকে সৎপথে আনার জন্য প্রীতি, দরদ ও মঙ্গলবুদ্ধি নিয়ে সংযতভাবে তাদের উপর জুলুম জবরদস্তি করলেও ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। কিন্তু যাদের টান আলগা, আত্মাভিমান প্রবল, তাদের সম্বন্ধে আমার খুব ভাবনা হয়, পাছে ছিটকে না যায়। আওতার বাইরে চ'লে গেলে তখন আর কিছু করার থাকে না। তোয়াজী ব্যবহার ক'রেও যদি কাছে রাখা যায়, তাহ'লে ধীরে-ধীরে শোধরাবার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু পীরিতের খাতিরে মানুষ যদি নিজেকে নিজে না শোধরায়, তাহ'লে বাইরে থেকে বড় একটা-কিছু ক'রে ওঠা যায় না। তাই আমি কাউকে শাসন করার কথা ভাবি না, ভাবি আমার প্রতি ভালবাসার টানে সে কবে নিজেকে নিজে শাসন করবে, নিজেকে নিজে সংশোধন করবে। সেই আশায় আমি সই, বই, উদ্দীপনা যোগাই, আর দিন গুণি।

শেষের কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর অপার করুণা ও মমতায় আর্দ্র হ'য়ে উঠলো। কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মন আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হ'ল। একটু পরে সুরেনদার (বিশ্বাস) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি 'পাকি' মানে পবিত্র। তাই আমরা পাকিস্তানকে পুণ্যস্থান এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানকে পুণ্যবঙ্গ বলতে পারি। Land of Lord-Beloved (প্রিয়পরমের স্থান) যেটা,

তাকে বলা যায় সাকীস্থান এবং তাই-ই আমাদের পুণ্যস্থান। সেই পুণ্যস্থান সকলেরই আপনস্থান।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। অগণিত ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহানন্দে গল্প-সল্প করছেন।

আজ দুপুরে অত্যধিক গরমের দরুন শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভাল হয়নি। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইলেক্ট্রিক ফ্যানের হাওয়ার থেকে বড় তালপাতার পাখার হাওয়া বরং ভাল। শুনলাম বড়খোকা কার কাছে আনতে দিয়েছে। বুঝে-বুঝে করার বুদ্ধি ওর খুব আছে। টান থাকলেই অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি গজায়।

একটু পরে হাসতে-হাসতে বললেন—গরম তবু আমি স'য়ে নিতে পারি। কিন্তু শীতে যেন আমি কাবু হ'য়ে পড়ি।

সরোজিনীমা—তাও তো শীতকালে আপনি গরম কিছু গায় দেবেন না। তাতে শীত কমবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর ভঙ্গিমায় ঘাড়টি বেঁকিয়ে স্মিতবদনে বললেন—তুই বেকুব, কিছু বুঝিস না। গরম জামাকাপড় যত গায় দেওয়া যায়, শীত তত জ'াকায়ে আসে। তুই বরং এক ছিলুম তামুক খাওয়া। তামুক খাই আর গল্প করি।

সরোজিনীমা তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে কৌতুকভরে সবার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

দিনাজপুরে হিন্দুমুসলমানের একটি মিলিত বৃহৎ সম্মেলন-উপলক্ষ্যে চুনীদা (রায়চৌধুরী) ও সুরেনদার (বিশ্বাস) সেখানে যাবার কথা।

তাই চুনীদা ও সুরেনদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুলের কথা ভাল ক'রে বলা লাগে। রসুল কথার মানে আচার্য্য, যিনি ভগবানের আদেশ, নিদেশ ও নীতি নিজের জীবনে পরিপালন করেন, মূর্ত্ত ক'রে তোলেন। তিনি শুধু নিজের জীবনে ঈশ্বরের নীতি-নির্দ্দেশ মূর্ত্ত ক'রে তুলেই ক্ষান্ত হন না, প্রীতি, সেবা, সাহচর্য্য ও সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে সমাজ-জীবনেও তিনি তা' মূর্ত্ত ক'রে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁকে যারা ভালবাসে, যারা তাঁর girdle (বেষ্টনী), তাদেরও জীবনের ব্রত হয় তাঁকে, তাঁর অভিযানকে propagate (প্রসারিত) করা। এইটেই হ'ল লোকমঙ্গলের মৌলিক উপাদান। আর, নবী বলতে আমি বুঝি তাঁকে, যিনি ভগবানের বাণী ও প্রেরণা লাভ করেন। হজরত রসুল শেষ নবী হউন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যুগে-যুগে আমরা চাই তাঁর living continuity (জীয়ন্ত ক্রমাগতি)—তা' ইমামের মধ্য-দিয়েই হোক, আর যঁার মধ্য-দিয়েই

হোক, এবং তাঁকে যে-নামেই অভিহিত করা হোক। ভগবদ্বাণী ও ভগবত প্রেরণার সঞ্জীবনী সংস্পর্শ ছাড়া আমরা জ্যান্তে মরা হ'য়ে থাকি। শুনেছি, রসুল পূর্ব্বতনকে মানার কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার বলেছেন—যদি কোনও হাবসী ক্রীতদাসও তোমাদের কোরাণ-অনুসারে পরিচালিত করেন, তবে তোমরা তাঁর আদেশ পালন ক'রে চ'লো। আর, এটা ঠিক জেনো—কোরাণ, বেদ, বাইবেল, গীতা ইত্যাদির মধ্যে যেমন কোন বিরোধ নেই, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ মহাপুরুষ, তা' তিনি পরবর্ত্তী যে-যুগেই আবির্ভূত হউন, তাঁর বাণীর মধ্যে কোরাণ, বেদ, বাইবেল, গীতার পরিপন্থী কোন কথা থাকে না, বরং থাকে যুগোপযোগী পরিপূরণ। তাই পরবর্ত্তীর মধ্যে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে আরো ক'রে পাই। একই ঈশ্বরপ্রেরণার প্রবাহই তো যুগ-যুগ ধ'রে ব'য়ে চলে আরো আরোতর অভিব্যক্তি নিয়ে—প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপূরণে। সৃষ্টি যতদিন থাকবে, ততদিন এ ধারা চলতেই থাকবে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—বিভিন্ন মহাপুরুষের শিক্ষা মূলতঃ এক হ'লেও, গরমিল খোঁজার দিকে যাদের ঝোঁক থাকে তারা নানাভাবে গরমিলই দেখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক মহাপুরুষেরই উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে ভ্রান্ত চলন ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার কবল থেকে উদ্ধার ক'রে ঈশ্বরপরায়ণ ক'রে তোলা। স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ ও তদ্দেশীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য-অনুযায়ী এইটে এক-এক জন করেন এক-এক কায়দায়। ডাক্তার যেমন রোগ বুঝে ওষুধ দেন, এঁরাও তেমনি যুগের গ্লানি যা' তার প্রতিবিধান করেন—পূর্ব্বতনদের উপর দাঁড়িয়ে—তাঁদের fulfilment-এ (পরিপূরণে)। প্রত্যেকটা মানুষকে এঁরা deal (পরিচালনা) করেন তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। তাই, একরকমেরই রকমারি হ'তে বাধ্য। হুবহু একই রকম হ'তে পারে না, কারণ, যেখানে যখন যার মঙ্গলের জন্য যে-মাত্রায় যে-ধরণে যা' করণীয়, মহাপুরুষরা তাই ক'রে থাকেন। এটা মিলেরই কথা, গরমিলের কথা নয়। এটা দেখে বোঝা যায় যে তাঁদের প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যপালী। আগে হয়তো যে aspect-টার (দিকের) উপর জোর দেওয়া ছিল না, যেটা হয়তো পূর্ব্বতনের সময়ে upset (বিপর্য্যস্ত) হয়নি, সেই দিকটাই হয়তো গড়বড় হ'তে চলেছে, তাই প্রয়োজন বুঝে পরবর্ত্তী মহাপুরুষ হয়তো সেইটের উপর emphasis (জোর) দিলেন। কিংবা পূর্ব্বতনদের যে-শিক্ষা লুপ্ত হ'তে চলেছিল, সেইটে হয়তো উদ্ধার করলেন, সংস্থাপন করলেন। ফলকথা, মানুষের বাঁচাবাড়ার পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ ক'রে তাদের progressive go (প্রগতিমুখর চলন)-কে accelerate (ত্বরান্বিত) করাই তাঁদের mission

(উদ্দেশ্য)। মহাপুরুষদের মধ্যে ছোট-বড় না ক'রে তাঁদের মধ্যে গরমিল বের না ক'রে, আমরা যদি তাঁদের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রসঙ্গতি আবিষ্কার ক'রে লোকের সামনে তুলে ধরতে পারি, তবেই পরমপিতা প্রসন্ন হন, পরিতৃপ্ত হন এবং আমরাও সার্থক হ'য়ে উঠি।

২৫শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৮।৫।১৯৪৮)

প্রাতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন টেলি-ফাইন্যালিজমের কথা। তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে একটা distant goal (দূরস্থ লক্ষ্য) না থাকলে evolution (বিবর্ত্তন) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের goal (লক্ষ্য) যত বিরাট হয়, সেই goal reach করতে (লক্ষ্যে পৌঁছাতে) গিয়ে মানুষ তত বেড়ে ওঠে। তাই যাকে-তাকে গুরু করতে নেই। গুরুকরণ করতে গেলে দেখতে হয় তিনি surrendered (আত্ম-নিবেদিত) কিনা, তিনি প্রবৃত্তি-অভিভূতির ঊর্দ্ধের এলাকার মানুষ কিনা, তাঁর divine qualities (ভাগবত গুণাবলী) আছে কিনা। তাঁর সঙ্গে আপনার কতক মিলছে, কতক মিলছে না। যেখানে মিলছে না, ভালবাসা থাকার দরুন সেখানেও বুঝতে চেষ্টা করছেন, কেন মিলছে না, নিজের কোন ত্রুটি আছে কিনা; এতে feeling (বোধ)-টা বেড়ে যায়। গুরুর প্রতি যদি আমাদের unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ) থাকে, তবেই তিনি আমাদের কাছে more and more revealed (আরো আরো প্রকাশিত) হ'তে থাকেন। ধরেন, আমার লক্ষ্যই হ'ল সুকৌশলে ধীরে-ধীরে আপনাদের সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা। তার জন্য যেমন-যেমন যা' করার একের পর এক ক'রে চলি। এই করাগুলির কতকগুলিতে আপনারা satisfied (সন্তুষ্ট) হন, আবার কখনও-কখনও সাময়িক dissatisfied (অসন্তুষ্ট)-ও হন। মনে নানারকম দ্বন্দ্ব আসে। কখনও ভাল লাগে, কখনও মনটা ঘোলাটে হয়। কিন্তু love (ভালবাসা) আছে ব'লে, dissatisfaction (অসন্তোষ) ও ardour (আগ্রহ) সৃষ্টি ক'রে, nerve (স্নায়ু)-গুলি exercised (অনুশীলিত) হয়, developed (পরিপুষ্ট) হয়, ফলে finer truths (সূক্ষ্মতর সত্য) revealed (প্রতিভাত) হয়। Unrepelling love (অচ্যুত অনুরাগ) না থাকলে ও-সব হয় না। ভালবাসা নাই, স্বার্থ-প্রত্যাশায় বা কর্ত্তব্যের খাতিরে কেউ লোকদেখান করা করে বা মনজোগানো চলা চলে, তাতে কিন্তু তার inner development (ভিতরের বৃদ্ধি) হয় না। Research laboratory-তে (গবেষণাগারে) কতকগুলি লোকের মাথা খোলে,

কতজনে আবার নীরেট ব'নে যায়। যাদের অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি আছে, তারা এগিয়ে যায়। আর, যারা মনে করে—আরামের চাকরি, কিছু করি বা না-করি মাসে-মাসে টাকাটা পেয়ে যাব, তারা দিন-দিন dull (ভোঁতা) হ'তে থাকে। চাকুরে মনোবৃত্তিটা বড় বিশ্রী জিনিস। স্বার্থ ছাড়া ভাবে না, বলে না, চলে না, করে না। কিন্তু ভাল চাকুরে যারা, তারা কিন্তু সবসময় ভাবে মনিবের কাছ থেকে যে-টাকাটা পেয়ে বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি তার প্রতিদানে উপযুক্ত পরিশ্রম আমাকে করতেই হবে। দেওয়া বাদ দিয়ে নেওয়া জিনিসটা বড় খারাপ। ধরুন, আপনাকে খুব দিচ্ছি, আপনি enjoy (উপভোগ) করছেন, আপনি আমাকে একটু হিঞ্চের শাকও দিচ্ছেন না, এটা ভাল নয়। আমি চাইলাম, দিলেন, তা' নয়। আমার প্রয়োজন বুঝে, আমি ভালবাসি তাই বুঝে-বুঝে এনে দিলেন, দেবার ধান্ধায় থাকলেন—এটা gracious to evolution (বিবর্ত্তনের পক্ষে হিতকর)। নিলে যে দোষ হয়, তা' নয়, সর্ব্বনাশ হ'ল, তা' নয়, মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল, তাও না। কিন্তু দেওয়াহীন নেওয়ার প্রবৃত্তিতে evolution (বিবর্ত্তন)-এর পথে stagnation (অচল অবস্থা) আসে। স্বল্প দক্ষিণাও ঐ জন্য খারাপ। স্ত্রীরও যদি স্বামীর জন্য করা না থাকে, একতরফা অঢেল পায়, অথচ স্বামীকে একটু নটে শাকও রেঁধে দেবার আবেগ না থাকে, সে স্বামীকে feel (বোধ) করতে পারে না। আর, যে স্বামীকে feel (বোধ) করতে পারে না, যে ছেলেপেলেকেও feel (বোধ) করতে পারে না। তার দৃষ্টি blurred (জাবড়া) হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—মানুষের কাছে দুনিয়াটা যেমন cosmos (শৃঙ্খলা) ব'লে প্রতিভাত হয়েছে অন্য জীবের কাছেও কি তাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, আকাশের দিকে প্রথমটা চাইলে মনে হয় chaos (বিশৃঙ্খলা)। বার-বার চাইতে-চাইতে ওর সঙ্গে যেন একটা পরিচিতি ঘটে, তখন আর chaos (বিশৃঙ্খলা) মনে হয় না। বোঝার চেষ্টার ভিতর-দিয়ে আমাদের বুঝ যেমন অগ্রসর হয় আমাদের মত ক'রে, প্রত্যেক জীবেরও তেমনি হয় তার মত ক'রে। বাঁচতে গেলেই, চলতে গেলেই, আচরণ করতে গেলেই প্রত্যেককেই বিশ্ব-জগৎ-সম্বন্ধে একটা adjustment (সামঞ্জস্য) ক'রে চলা লাগে। তা' আপনার আপনার মত ক'রে, বিড়ালটার মত ক'রে, পোকাটার পোকাটার মত ক'রে। Environment (পরিবেশ)-সম্বন্ধে একটা conception (ধারণা) না থাকলে কোন জীবই তার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। সব জীবই ক'রে-ক'রে, ঠেকে-ঠেকে শেখে। নূতন কোন পরিবেশে আসলে প্রথমটা সেখানকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে একটু যেন conscious effort (সচেতন চেষ্টা) লাগে।

পরে সব adapted ও adjusted (সুসমঞ্জস ও সুবিন্যস্ত) হ'য়ে ওঠে। কেষ্টঠাকুরকে কয় চিরনবীন, তার মানে তাঁর নিত্য নবীন বোধেরও অন্ত নেই, আর সেই নূতনত্বের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য ক'রে চলার শক্তিরও অন্ত নেই। সবটা যেন তাঁর কাছে লীলার মত স্বতঃ, সহজ ও অনায়াসসাধ্য। তাই তাঁকে নব-কিশোর নটবর ব'লে মনে হয়। তিনি সর্ব্বদা পুরাতনের মধ্যে সত্যের নব-নব রূপ দেখতে পান। আবার, যে-কোন নূতনত্বের মধ্যে তিনি শাশ্বত যা' তারই অভিব্যক্তিকে বোধ করেন। তাই তিনি চির-চেতন।

কেষ্টদা—চৈতন্যের বিকাশ তো মানুষের মধ্যেই হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ঐরকম ভাবি। আমার বোধে দাঁড়িয়ে আমি বলি—The world appears as cosmos to me (জগৎ আমার কাছে শৃঙ্খলা ব'লে মনে হয়)। তবে এ-কথা আমি বলতে পারি না যে অন্য কারও কাছে এমনটা মনে হয় না।

কেষ্টদা—আমরা যেমন কাউকে ignore (অবজ্ঞা) না ক'রে সবাইকে include (অন্তর্ভুক্ত) ক'রে ভাবছি, এমন কি আর কেউ ভাবে ? কথা বলার শক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি কি আর কিছুর মধ্যে দেখা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর উদাসভাবে বললেন—God knows (ঈশ্বর জানেন)।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—ঠাওর পেয়ে ওঠা যায় না, একটা পিঁপড়ে আমাদের থেকে wiser (বিজ্ঞতর) না আমরা তার থেকে wiser (বিজ্ঞতর)। প্রত্যেককে তার দুনিয়া নিয়ে সমগ্রভাবে জানলে বুঝলে মনে হয় রহস্যের থল-কূল নেই, বড় ছোট কাকে কিভাবে বলি। সবই তো তাঁর অনন্ত বিচিত্র খেলা। শুনেছি আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতর প্রাণীর ভাষার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আমরা তো আজ এর কোন হদিসই জানি না। কার যে কতখানি জ্ঞান ও বোধ বাইরে থেকে কি ক'রে বোঝা যাবে বলেন! হয়তো এই কাকটা কা-কা ক'রে ডেকে আমাকে কোন মঙ্গলজনক নির্দ্দেশ জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে আমাদের বোধের দরজা বন্ধ সেখানে আমি কি ক'রে বুঝব, ও আমাকে কী বলতে চায়, ও আমার কত বড় বান্ধব !

কেষ্টদা—আমরা মানুষেরটাও বুঝি আবার অন্যেরটাও অনেকখানি বুঝি—এই তো আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আমাদের আত্মপ্রসাদ।

কেষ্টদা—পাখী ডানার উপর ভর ক'রে ওড়ে, তাই লক্ষ্য ক'রে মানুষ aero-plane (আকাশযান) করেছে। মানুষের বুদ্ধি ও শক্তির কি শেষ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Aeroplane (উড়োজাহাজ) প্রয়োজন থেকে হয়েছে। আমরা utilise (সদ্ব্যবহার) করতে পারি। এতে আমাদের কী হ'ল ? একটা পাখীর পাখা কিন্তু তার নিজস্ব। এ জিনিসটাও ফেলনা নয়। আর, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে যদি মানুষের চরিত্র ও হৃদয়-মনের উন্নতি না হয়, তাহ'লে কিন্তু হবে না।

কেষ্টদা—মানুষ monster (অতিকায় জন্তু) হবে না, সে তার cerebral development ও manipulation (মস্তিষ্কশক্তির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ)-এর ভিতর-দিয়ে তার প্রয়োজন সিদ্ধ করবে। এ-সব তো আছেই। তা' ছাড়া একমাত্র মানুষের মধ্যেই ক্রাইষ্টের মত মানুষের আবির্ভাব দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় অন্য প্রাণীর মধ্যেও হয়তো উদ্ধাতা আসেন। তিনি তাদের বাঁচাবার কৌশল শেখান। পরমপিতার কারবার বিশ্বদুনিয়ার সব-কিছুকে নিয়ে।

কেষ্টদা—সচ্চিদানন্দ-standard (মাপকাঠি) দিয়ে কে more evolved (বেশী-বিবর্ত্তিত) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Standard (মানদণ্ড) তো আমরা ক'রে নিয়েছি।

কেষ্টদা—সচ্চিদানন্দের standard (মানদণ্ড) যা' ক'রে নিয়েছি, তা' কি ঠিক নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ standard (মানদণ্ড) করা হয়েছে wisely ও widely (প্রাজ্ঞতাসহকারে ও ব্যাপকভাবে)। এই সচ্চিদানন্দত্ব বাদ দিয়ে কিছু দেখা যায় না।

সৌরীনবাবুর এক আত্মীয় ঢাকায় সব ছেড়েছুড়ে এসেছেন। দুঃখ ক'রে বলছিলেন অসুবিধার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশা-ভরসা দিয়ে বললেন—মানুষের মানুষই সম্পদ্। টাকা-পয়সা মাটি বড় জিনিস কিছু নয়। মানুষ নারায়ণের প্রতীক। মানুষে যদি ভক্তি থাকে, লক্ষ্মী আপনি আসেন। আপনি মানুষের সেবা করেন, দেখবেন পরম-পিতার দয়ায় সব ঠিক হ'য়ে আসবে।

উক্ত ভদ্রলোক—দেশ ছাড়া হ'য়ে দেখছি, সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি আমার যদি তেমন সামর্থ্য থাকত তবে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা যাতে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদা ও নিরাপত্তা সহ বসবাস করতে পারে, সেই চেষ্টা প্রাণপণে করতাম। কিন্তু এই বয়সে আমার

হাতে তার সুযোগ কোথায়? নইলে ওখানকার জলবায়ু, ওখানকার মাটি—আমাদের শরীর ঐই-ই চায়, ওতেই ভাল থাকে। কোথাও গিয়ে তেমনটি মিলবে না। তাই বার-বার বলতে ইচ্ছা করে—'আমার সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি', 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। ভালবাসার দায় অশেষ। তার জন্য করতে হয় ঢের। করব না, পাব, তা' তো হয় না। আমাদের অনেকের বুদ্ধি হ'ল, যদি কেউ ক'রে দেয়, তাহ'লে ভোগ করতে পারি—অবশ্য যে ক'রে দেবে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতার বালাই না রেখে।

উক্ত ভদ্রলোক—আজকাল ধর্ম্মের স্থান নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? জগতে সমস্ত জীবেরই সব যা'-কিছু administered (পরিচালিত) হ'চ্ছে ধর্ম্ম দিয়ে। ধর্ম্ম মানে তেমন বলা, তেমন করা, তেমন ভাবা, যাতে পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।

উক্ত ভদ্রলোক—অত্যাচার, নারীধর্ষণ ইত্যাদির মধ্যে ধর্ম্ম কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সবের মধ্যে ধর্ম্ম নেই। কিন্তু ঈশ্বরকে ও প্রেরিতকে অবলম্বন ক'রে যেখানে নিষ্ঠা আছে, বিশ্বাস আছে. আচার আছে, সংহতি আছে, পারস্পরিকতা আছে, সেখানে ধর্ম্ম নেই—এ কথা বলা চলে না। হায়েনা যে মানুষ খায়, গরু খায়, বাঘ খায়, তারাও নিজেদের পরস্পরকে বিপদের সময় save করে (বাঁচায়), তারা অতখানি একগাট্টা, তাই সকলে তাদের ভয় করে। বাঁচার ধর্ম্ম ওরা ওদের মত পালন করে—পরস্পর feel (অনুভব) করে, সাহায্য করে, environment (পরিবেশ)-কে নিয়ে বাঁচতে চায়। আমরা আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে মানুষকে খুশী করার তালে ঘুরি। হরিজনকে উন্নত ক'রে না তুলে নিজেরা হরিজনে পর্য্যবসিত হ'তে চাই। মেথরকে জামাই করলে আমরা তাকে খুশী করার জন্য তার মত হ'তে চাইব, কারণ আমরা গুরুকে রুষ্ট করতে সাহস পাই না, পাছে মেয়েটা কষ্ট পায়। তাই বলি, আমাদের বোধ-বিচার ও চাল-চলনে অনেক গোল ঢুকে গেছে। ফলকথা, উৎসহারা, বেকুবপারা, অস্তিত্বনাশা, বৈশিষ্ট্যবিলোপী চলনটা কিন্তু ধর্ম্ম নয়।

উক্ত ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণরা সমাজে কম অত্যাচার করেনি। ব্রাহ্মণরা নায়ার বা শূদ্রের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবে না। এর কোন মানে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুনের দোষ দেন কেন? ওটার কারণ কি জানেন? সমাজকে বাঁচাবার জন্য সমাজপতিদের কত কায়দা করতে হয়, সে-সম্বন্ধে কি আমাদের কোন ধারণা আছে? অনেক সম্প্রদায়ের অনেকেরই হিন্দুদের উচ্চবর্ণের মেয়েদের উপর

লোভ। অনার্য্যরাও এ-ব্যাপারে কম উৎপাত সৃষ্টি করেনি। তাই অমনভাবে কঠোর বেড়াজাল সৃষ্টি না করলে, আজ সমাজের যতটুকু আছে, তাও থাকত না। অমন ক'রে দোহাই পাড়া ছিল, তাই এত invasion (আক্রমণ), আঘাত-ব্যাঘাত ও প্রলয়ের মুখে কিছুটা আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। নইলে সব তো ভেসে চ'লে যেত। অজান মানুষরা বোঝে না কিজন্য কী করা লাগে! তাই যেমন খুশী কয়! হিন্দু কিন্তু মানুষকে আপন করার কথা ছাড়া পর ক'রে দেবার কথা ভাবেইনি। কিন্তু শক্ত ক'রে বাঁধন দিয়েছে সেই সব জায়গায়, যে-সব জায়গা আলগা ও ঢিলে রাখলে পতন, বিনাশ ও বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। এর মধ্যে ঘৃণার কোন স্থান নেই। আমি বুঝি—Hinduism বা Aryanism (হিন্দুত্ব বা আর্য্যত্ব) এমন একটা বাদ যা কাউকে বাদ দেয় না। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তা'কে ক্রমোদ্ধ্বগামী ব্রাহ্মী বিস্তারের পথে পরিচালিত করার কতই না বাস্তব কৌশল অধিগত করেছে এই সনাতন আর্য্যহিন্দু সমাজ! এর কোন তুলনা দেখি না।

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি আবেগ-উদ্দীপনায় স্ফীত ও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

অব্যাহত গতিতে আলোচনার স্রোত ব'য়ে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সোহাগ-সিঞ্চিত, প্রত্যয়দীপ্ত বাচনভঙ্গিমা সবার অন্তরে এক মধুর আবেশের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। সকলেই বিভোর হ'য়ে শুনছেন তাঁর অমৃত কথন। এমন সময় প্রকাশদা (বসু), মণিদা (কর), অশ্বিনীদা (দাস), সুরেনদা (সেন), সুনীতিদা (পাল) প্রভৃতি অনেকে এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

নবাগত ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বললেন—আজকাল সর্ব্বত্রই দেখা যায় অধর্ম্মের জয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—বিধি কখনও উল্টে যায় না। যদি কল্যাণকর স্থায়ী জয় কোন পক্ষের হয়, তাহ'লে জানবেন, তারাই ধর্ম্ম পালন ক'রে চলেছে। সাময়িক উত্থান-পতন দেখে বিচলিত হ'তে নেই। যারা নিষ্ঠাসহকারে বিধিমাফিক ধর্ম পালন ক'রে চলে, তারা সাময়িক বেকায়দায় পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত ঝেড়ে-কেটে উঠে দাঁড়ায়। যারা ছলে, বলে, কৌশলে দাঁ মেরে সাময়িক বড় হয়, তারা দেখতে-দেখতে হাউইবাজির মত নিঃশেষ হ'য়ে যায়। কর্ম্মফল কাউকে রেহাই দেয় না। সবার ভাল না করলে নিজের ভাল হয় না। যে অপরকে দাবিয়ে রেখে বা দুর্ব্বল ক'রে রেখে নিজে বড় হ'তে চায়, সে নিজেকেই নিজে ঠকায়। বিধির দলিলে যার কোন সমর্থন নেই, কোন সম্ভাবনা নেই, তার পিছনেই সে ছোটে। একে

বলে ব্যর্থতার সাধনা। Obsession (অভিভূতি)-ই এই অকাম করায়। ধর্ম্ম মানে তাই করা, তাই বলা, তাই ভাবা যাতে সপরিবেশ আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি। পরিবেশকে বাদ দিয়ে বা পরিবেশকে বিশীর্ণ ক'রে নিজের মঙ্গল হ'তে পারে না। ধর্ম্মের এই মূল ব্যাপারটা যে আমরা জানি না, বুঝি না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও চলার বেলায় মানি না। এই অবস্থায় আমাদের কীই বা হ'তে পারে আর আমরা কীই বা পেতে পারি!

ভদ্রলোক—আমি ভাবি, স্বাধীনতা-সংগ্রামে পূর্ব্ববঙ্গ এত যে ত্যাগ স্বীকার করল, দুঃখ-নির্য্যাতন বুক পেতে নিল, তাতে তাদের ভাগ্যে জুটলো কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ বাঁচেই না, তা' আবার ফুলফল দেবে কী? আমরা যা'ই করতে যাই আগে মূল ভিত ঠিক করা লাগে। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে ও দাঁড় করিয়ে দেশের মানুষগুলিকে যদি integrate ও organise (সংহত ও সংগঠিত) করা না যায়, তাহ'লে শিব গড়তে গিয়ে বানর হ'য়ে দাঁড়ায়। আর, যে-সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই, ওটা কোন সমস্যাই নয়। আমরা যদি স্বধর্মনিষ্ঠ হই এবং পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষদের life-history ও philosophy of life (জীবন-ইতিহাস ও জীবন-দর্শন)-সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে গভীরভাবে অনুশীলন করি, আবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হ'তে প্রবুদ্ধ করি, তাহ'লে এই চেষ্টার মধ্য-দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সহজেই দানা বেঁধে উঠতে পারে। ধর্ম্মাচরণের ভিতর-দিয়ে মানুষের passion (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তাই, মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে গেলে আগে ধর্ম্মকে জাগাতে হয়। এই অকাট্য সত্যটা কি আমরা জানি? না বুঝি! না মানি! আমাদের বাপ, বড় বাপ, বৃদ্ধ প্রপিতামহরা কী ক'রে গেছেন, তা' কি আমরা ভেবে দেখি? সে-শ্রদ্ধা, সে-তপস্যা আমাদের কোথায়? ভগবানের নাম ক'রে পাঁচজন swindler (জুয়াচোর) দল বেঁধে দাগাবাজি ক'রে ধরা প'ড়ে যদি বলে ধর্ম্ম নেই, তাহ'লে চলবে কেন? অকাম-কুকাম করা আর যা-হোক ধর্ম্মকার্য্য নয়। মানুষকে ভালবাসা, সেবা করা, সাহায্য করা, নিজে যোগ্য হওয়া, অপরকে যোগ্য ক'রে তোলা, নিজে বাঁচা, অপরকে বাঁচান, অপরকে বড় করার সঙ্গে-সঙ্গে নিজে বড় হওয়া—এই সব কাজ ধর্ম্মের আওতায় পড়ে। মানবতার বিকাশের কথা লোকে কয়, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মই যে মানবতার একমাত্র standard (মানদণ্ড), তা' ক'টা লোকে বোঝে?

ভদ্রলোক—হিংসার ভাবটা যদি না যায়, তাহ'লে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শনিষ্ঠা ও সত্তা-সংরক্ষণ—এই দুটি জিনিস যাতে অব্যাহত থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। অহিংসার মূল লক্ষ্য সত্তাপোষণ। তুমি অন্যায় করলে আমিও তোমাকে ঘাঁটাব না, আমি অন্যায় করলে তুমিও আমাকে ঘাঁটিও না—এই ধরণের গোঁজামিলের মিল অহিংসা নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিপ্রসূত, কুশল-কৌশলী, সংযত, সংহত কঠোর প্রতিরোধ রচনা না করলে, অহিংসার সাধনা সফল হয় না। আমরা রোগকে হিংসা করলেও যেমন রোগীকে হিংসা করি না, তেমনি দোষকে হিংসা করলেও আমরা কখনও দোষীকে হিংসা করব না। Incorrigible sinner (অসংশোধনীয় পাপী) যে তাকেও ঘৃণা করতে নেই। ভালবাসাময় শাসন, তোষণ, সেবা, দরদ, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও psychological manipulation (মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা) ছাড়া মানুষের ভাল করা যায় না। পরাক্রমের অভিব্যক্তি দেখান ভাল, কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হ'লে তখন আপনাকে দিয়ে আপনার ও অপরের অপকার ছাড়া উপকার হ'তে পারবে কমই।

ভদ্রলোক—পাকিস্তান কি টিকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ওভাবে ভাবি না। আমি ভাবি, রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে যাই থাক না কেন, তা' যেন দুর্নীতিমুক্ত হয়, লোকপালী হয়, বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে বান্ধববন্ধনে আবদ্ধ থাকে। জনমত, জনগণের চাহিদা ও চলন যদি এই দিকে ঘোরে, তাহ'লেই chaos (বিশৃঙ্খলার)-এর ভিতর-দিয়ে cosmos (শৃঙ্খলা) গ'ড়ে উঠবে, নচেৎ নয়। তাই, আমাদের নিজেদের educated (শিক্ষিত) হওয়া লাগবে ও পরিবেশকে educated (শিক্ষিত) ক'রে তোলা লাগবে।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

তাঁর যাবার বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে স্নেহল কণ্ঠে বললেন—ফাঁকমত আবার আসবেন।

এরপর কেষ্টদার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়েকটা ইংরেজী শব্দের বাংলা এইভাবে করা যায় না? আমার মাথায় যা' আসছে বলব?

কেষ্টদা—আজ্ঞে, বলাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতকটা আত্মগতভাবে বললেন—Attending physician-কে বলা যায় পরিচারী চিকিৎসক, visiting physician-কে বলা যায় পরিদর্শী চিকিৎসক, consulting physician-কে বললে হয় মন্ত্রণী চিকিৎসক।

গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড আনমনাভাবে স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বললেন—Nurturing offer-এর বাংলা করা যায় পোষণী অর্ঘ্য, আর profiteering service-এর বদলে বলা যায় গোলামী সেবা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—কী বলেন কেষ্টদা! এগুলি কি হয়?

কেষ্টদা প্রফুল্লকে বললেন—পড়ো তো কথাগুলি।

পড়া হ'লে কেষ্টদা বললেন—খুব apt ও beautiful (যথাযথ ও সুন্দর) হয়েছে।

প্রসন্ন হাসিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনবদ্যসুন্দর মুখমণ্ডল আলোয় আলো হ'য়ে উঠল। তিনি মোহন ভঙ্গিমায় হাতখানি ঘুরিয়ে বললেন—Profiteering service (গোলামী সেবা) যারা দেয়, তাদের subservient mentality (পরাধীন মনোবৃত্তি) হয়, আর mercenary attitude (অর্থলোভী ভাব-ভাবনা) হয়। আর, পোষণী সেবায় মানুষ progressive (প্রগতিমুখর), generous (উদার), untussling (কলহবিমুখ) ও humble (বিনম্র) হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির পিছনে ভগবানের একটি শুভ উদ্দেশ্য আছে। কামকে মানুষ দোষণীয় মনে করে, কিন্তু কাম না থাকলে সৃষ্টিধারা রক্ষা পেত না। শুনেছি, মরার সময় নাকি কামবেগ বেশী হয়। যাদের ফাঁসি দেয়, তাদের অনেকের নাকি ঐ সময় যৌনসম্বেগ বৃদ্ধি পেয়ে seminal discharge (বীর্য্যক্ষরণ) হ'য়ে যায়। সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও দুঃখ-পীড়িত লোকদের সন্তান বেশী হয়। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে তারা যেন বংশবৃদ্ধি ক'রে সন্তানের মধ্য-দিয়ে আরো ক'রে বাঁচতে চায়।

কথায়-কথায় বলা হ'ল—আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—বহুমুখী প্রতিভা ও প্রজ্ঞার এমন অন্বিত অভিব্যক্তি কমই দেখা যায় পৃথিবীতে।

২৬শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দার পূর্ব্বকোণে তক্তপোষে শুভ্রশয্যার উপর প্রশান্ত চিত্তে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে নীচেয় বসেছেন। সবাই নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখছেন।

আজ সকালেই সূর্য্যগ্রহণ লেগেছে। গ্রহণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রস্রাব পেয়েছে। কিন্তু লোকমত প্রচলিত আছে যে গ্রহণের সময় প্রস্রাব-বাহ্যে করতে

নেই। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) বললেন—ভাল ক'রে পঞ্জিকাটা দেখেন তো, ওতে এ-সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কিনা।

সুশীলদা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাটা এনে তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন। কিন্তু তার ভিতরে ঐ ধরণের বিধিনিষেধের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব জোর প্রস্রাব পেয়েছে। অগত্যা তিনি বাইরে গিয়ে প্রস্রাব ক'রে আসলেন। প্যারীদা (নন্দী) গাড়ু-গামছা নিয়ে সঙ্গে গেলেন।

ফিরে এসে বিছানায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা ঝোঁক আছে—যার কার্য্যকারণ জানি না, অথচ চল্‌তি আছে, তা' পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে follow (অনুসরণ) ক'রে দেখার।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—তাহ'লে তো অনেক কিছুই মানতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানা আসে।

কেষ্টদা—গ্রহ বড় না ঠাকুর বড়—সেটা আমাদের অনেকের কাছে একটা প্রশ্ন হ'য়ে আছে আজও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রহ মানে obsession of complexes (প্রবৃত্তির অভিভূতি)। একজন হয়তো ঠাকুরকে ভালবাসে অথচ লোভের তাড়নায় কুখাদ্য খায়। এখানে তার লোভের টান ঠাকুরের প্রতি টানের থেকে বড়। তার ঠাকুরের উপর টান যদি লোভের টানের থেকে বড় হয়, তবে সে কুখাদ্য খাওয়া ছেড়ে দেবে এবং অভক্ষ্যভোজনজনিত দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাবে। এইতো আমি যা' বুঝি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মায়াবাদের বক্তব্য কী তা' আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, মায়াশক্তিকে যদি স্বীকার করা হয়, তাহ'লে তো অদ্বৈতবাদ থাকে না। ব্রহ্ম ও মায়া এই দুটো জিনিসকে স্বীকার করায় দ্বৈতবাদ এসে পড়ে। আমি এইরকম বুঝি—যেমন আমি আছি আর আমার বৃত্তি আছে, আমি না থাকলে আমার বৃত্তি থাকে না, আমি থাকলেই আমার বৃত্তির অস্তিত্ব সম্ভব। তাই আমার বলা আছে—স্ব-অয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান-তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হইল। আমি থাকলেই আমার বৃত্তির অভিধ্যান করতে পারি। তাই আমি বুঝি আমাদের প্রত্যেকেরই সত্তা আছে, তা' সে-সত্তা সদসতের অধীনই হোক বা তার অধীশ্বরই হোক। এই সত্তাকে অটুট রাখাই ধর্ম্ম, তার জন্যই লাগে বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ। জ্ঞানবিচারে যে বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ না হ'তে পারে, তা' নয়, তবে তা' অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কিন্তু গুরুভক্তিতে এটা অতি সহজে হয়। ভক্তিযুক্ত চলন ও করণের ভিতর-দিয়ে তত্ত্বজ্ঞান আপ্‌সে আপ ফুটে ওঠে। কিন্তু

নিছক তত্ত্বালোচনার ভিতর-দিয়ে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ভিতর আসে না। আর, যা' উপলব্ধির ভিতর না আসে, তা' কখনও চরিত্রগত হয় না।

কেষ্টদা—ষড়-দর্শন কি ক'রে হয়? একদর্শনই তো হওয়া উচিত। সত্য তো কখনও এক ছাড়া দুই নয়। তার দর্শন ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হ'তে যাবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ষড়-দর্শন মানে বুঝি six phases of observation (পর্য্যবেক্ষণের ছয়রকম পর্য্যায়)। ধরেন, একই মাটি তাকে কুমোর এক দৃষ্টিতে দেখছে, কৃষক আর এক দৃষ্টিতে দেখছে, Botanist (উদ্ভিদবিদ্) অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে, Soil-Chemist (মৃত্তিকা-রসায়নবিদ্) ভিন্নরকম দৃষ্টিতে দেখছে, Geologist (ভূতত্ত্ববিদ্) তার নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখছে, কবি দেখছে তার কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে। এই রকম কত রকমারি ভঙ্গী আছে।

কেষ্টদা—এত রকমারি দার্শনিক মতবাদ আছে ব'লেই মনে হয় এগুলির কোনটাই ঠিক নয়। বিজ্ঞান যেমন আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট জ্ঞান দেয়, দর্শন যদি ঠিক হয়, তাও আমাদের তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট জ্ঞানের সন্ধান দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটাই তার মত ক'রে ঠিক। যার মধ্যে সত্যের একটা দিকের পরিচয় পাই, তাকে অঠিক বা অসত্য ব'লে বরবাদ ক'রে দিলে আমরা বঞ্চিত হই। তাই ব'লে আংশিক সত্যকে যদি আমরা সত্যের একমাত্র সমগ্র-রূপ ব'লে জাহির করতে চাই এবং অন্যের বাস্তব বোধ ও দর্শনকে অলীক ব'লে নস্যাৎ ক'রে দিতে চাই, তাহ'লে ভুল হবে। বিভিন্ন অন্ধের হাতী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যে বাগ্‌বিতণ্ডার কথা পাওয়া যায়, তা' এই ধরণের ভুলেরই নমুনাবিশেষ। একজন বলে আমি স্বহস্তে হাতীর দেহ স্পর্শ ক'রে বোধ করেছি হাতী কুলোর মত, আর একজন বলে আমিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে বলছি হাতী বিরাট জলের হাঁড়ির মত, তৃতীয় জন বলে আমি হাতীর গায় হাত বুলিয়ে টিপে-টিপে দেখেছি হাতী থামের মত, অন্য যারা ছিল তারাও তাদের স্ব-স্ব সীমাবদ্ধ অনুভব-অনুযায়ী জোরের সঙ্গে বলে হাতী এই-এই রকম। প্রত্যেকে তার নিজস্ব বোধটাকে একমাত্র সত্য ব'লে ধ'রে নিয়ে অন্য সবার কথা মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করতে চায়। এই নিয়ে তুমুলকাণ্ড, তাদের মধ্যে মারামারি বাধে আর কি! তখন একজন সুস্থদৃষ্টিসম্পন্ন লোক যে একটা গোটা হাতী ভাল ক'রে দেখেছে, সে এসে তাদের বিবাদ মিটিয়ে দেয়। সে বুঝিয়ে বলে—তোমাদের প্রত্যেকের কথাই অংশতঃ সত্য, কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। সে তখন হাতীর পুরো দেহের বর্ণনা দিয়ে তাদের পরস্পর-বিরোধী উক্তিগুলির

সামঞ্জস্য দেখিয়ে দেয়। তখন তারা ঝগড়া ত্যাগ ক'রে পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করে।

কেষ্টদা—প্রকৃত দ্রষ্টাই তো এই অসাধ্য সাধন করতে পারেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদিম এককে যিনি with his being (তাঁর সত্তা দিয়ে) সব দিক্ থেকে সব রকমে দর্শন করেছেন বা দেখেছেন analytically and synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-সহকারে), তিনিই ষড়-দর্শন বুঝতে পারেন এবং তাদের সমন্বয় দেখাতে পারেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য-সম্মত জীবনদৃষ্টির তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে তাকে তার বিশিষ্ট পথে সার্থকতার দিকে পরিচালিত করার সামর্থ্যও তিনি রাখেন। তাই এমনতর বেত্তা-পুরুষই আমাদের অনুসরণীয়।

কেষ্টদা—ঋষিরাই তো ষড়-দর্শনের প্রণেতা, কিন্তু তাঁদের অনুভূতির মধ্যে এত বিরোধ থাকবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক ঋষির এক-এক দর্শন, কিন্তু সেগুলি রকমারি হয়েও এক। প্রত্যেকে তাঁর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী মূল সত্যের উপলব্ধির পথে চলেছেন এবং যিনি যেমন যতটা উপলব্ধি করেছেন তিনি তেমন ততটা তাঁর বিশিষ্ট রকমে প্রকাশ করেছেন।

কেষ্টদা—একটা দর্শন খণ্ডন ক'রেই তো আর একটা দর্শন গ'ড়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খণ্ডন নয়, যেখান থেকে যেটুকু দেখতে পাওয়া যায়, সেইটুকুর উপর জোর দেওয়া আছে; অন্যগুলি বলা নেই। যেমন আপনার বাড়ী থেকে এ-বাড়ীর কতকটা দেখা যায়, কতকটা দেখা যায় না। যিনি ওখান থেকে দেখেছেন, তিনি তো সেই বর্ণনাই দেবেন!

কেষ্টদা—কিন্তু যিনি বড়াল-বাংলোর সবটা দেখেছেন তিনি তো শুধু তেমন বলবেন না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি সবটা দেখেছেন, তিনিই সামঞ্জস্য করতে পারেন।

কেষ্টদা—কাল সবার থেকে বলবান—এই কথা প্রচলিত আছে, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল মানে, আমার মনে হয়, শাতন অর্থাৎ প্রবৃত্তি-অভিভূতি, যা' সত্তাকে বিদীর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন করে, বিশীর্ণ করে, পাতিত করে। বদ্ধজীব প্রবৃত্তি-ঝোঁকা হ'য়েই জন্মে এবং প্রবৃত্তি-লিপ্সার পরিপূরণেই জীবন ধারণ করে। প্রায় সব কালেই এমনতর লোকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। আর, তারাই বাঁচাবাড়ার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে উৎসমুখী,

সত্তাপোষণী জীবনচলনার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বহু ইষ্টপ্রাণ মানুষের সংহত প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে ছাড়া এটা হবারও নয়। এর জন্য যেমন চাই যজন-সমন্বিত যাজন, তেমনি চাই সুবিবাহ ও সুজনন। এখন ক্রমাগত দীক্ষা দেবেন এবং মানুষগুলিকে সৎ-চলনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবেন। নইলে নিস্তার নেই।

কেষ্টদা—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"—পুরুষোত্তম এই ভয়ঙ্কর কথা বললেন কেন? মানুষকে বাঁচানই তো তাঁর mission (উদ্দেশ্য)!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের আর এক নাম বিধি। মানুষ যখন বাঁচাবাড়ার বিধিকে অবজ্ঞা ক'রে আত্মবিনাশের বিধিসম্মত পথ অনুসরণ ক'রে চলে, তখন পরমপিতা দয়াপরবশ হ'য়ে তাদের তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে সৎপথে পরিচালিত করতে কতভাবেই না চেষ্টা করেন! কিন্তু মানুষ যদি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে, তখন কর্ম্মফলের বিধির করালরূপ ধারণ ক'রে তাদের বিনষ্ট করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলকথা, দুর্দমনীয় মরণ-নেশা ও মারণ-নেশা যেখানে মানুষকে নিঃশেষে পেয়ে বসে, সেখানে তাদের বাঁচাবার কোন পথ পরমপিতার হাতে থাকে না। ভগবান মানুষকে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই সে যদি খেয়ালবশে ভগবানকে পাত্তা না দেয় ভগবান সেখানে নিরুপায়। তবে অপরের ক্ষতিসাধনের বদখেয়াল যদি কারও প্রবল হয়, প্রকৃতিই তাকে সাবাড় ক'রে দেয়। সৃষ্টিরক্ষার জন্যই ভগবানের এই বিধান। বিহিত অসৎনিরোধ তাই ধর্ম্ম। যেমনভাবে সৎ-চলনে চলা উচিত ও অসৎ-চলনকে নিরোধ করা উচিত সমাজের অধিকাংশ লোক যদি তা' করে, তবে সমাজে অসৎ-চলন প্রশ্রয়পুষ্ট হ'য়ে অতি প্রবল হ'য়ে উঠতে পারে না। তাতে অসৎ-লোকেরাও রক্ষা পায়, সমাজও বাঁচে। যারা স্বার্থ, সুনাম বা তথাকথিত শান্তির জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঙ্গত প্রতিবাদ করে না, তারা নিজের, অন্যায়কারীর ও সমাজের শত্রু। যারা ভাল ক'রে সব জিনিস বোঝে না, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা বুঝেসুঝেও অন্যায় ও অসৎ-চলনের প্রশ্রয় দেয়, তারা প্রকারান্তরে শাতনের সেবা করে।

কেষ্টদা—শুক্রনীতিতে আছে "কালস্য কারণং রাজা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজশক্তি যদি ঋষি-অনুশাসিত, বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তা-পোষণী ও অসৎ-নিরোধী অনুচলনে চলে তবে তা' অশিষ্টচলনের নিরাকরণ ক'রে, সৎ-চলনকে প্রবুদ্ধ ক'রে কালের গতিকে শুভ-সম্বেগী ক'রে তুলতে পারে। দেশের লোকের মনোভাব, চিন্তা, চলন ও চরিত্র যত উন্নত হয় দেশও তত উন্নত হয়।

তাই সব চাইতে বেশী নজর দেওয়া লাগে ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টির পরিপালন ও সঞ্চারণার দিকে ও অকল্যাণকর যা'-কিছুর নিরসনের দিকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ইংরাজী বাণীটি দিলেন—

He is the existence of all that exists,—
thereby He, 'the Sat',
He is the responsiveness of all that responds,—
So 'Chit'—that He is ;
He is the becoming of each that comes,—
thus He—the 'Ananda' as known.

(তিনি প্রতিটি সত্তার অস্তিত্ব, তাই তিনি সৎ। তিনি প্রতিটি চেতন প্রাণীর চেতনা, তাই তিনি চিৎ। তিনি সবারই বর্দ্ধন-নন্দনা, তাই তিনি সর্ব্বজনবিদিত আনন্দ।)

শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনী-মার কাছে জল চাইলেন। ঘটির ঢাকনা খুলে সরোজিনী-মা দেখলেন ঘটিতে জল বেশী নেই, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘটিতে জল ভ'রে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘটি থেকে উঁচু ক'রে জল পান ক'রে ঘটিটি সরোজিনী-মার হাতে দিয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে হাসিমুখে বললেন—

যে-ব্যাপারে যা'-যা' লাগে
আগেই জোগাড় রাখ্,
ব্যাপার এলেই সমাধানে
হ'বি ধন্যভাক্।

২৮শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দার পূর্ব্বকোণে শুভ্র-শয্যায় সমাসীন। আননে তাঁর মধুর হাসি, নয়নে তাঁর প্রীতি ও করুণার নির্ঝর। ভক্তবৃন্দ একে-একে এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করছেন। আজ বাইরে থেকে কয়েকজন নবদীক্ষিত ভাই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাদির কথা কাতরভাবে নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন—ঊষা-নিশায় মন্ত্র-সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ—এইটুকু বজায় রাখলে অনেক-কিছু সহজ হ'য়ে আসে। বহু গোল কেটে যায়। ইষ্টধান্ধা প্রবল

হ'লে অমঙ্গলকে মঙ্গলে নিয়ন্ত্রণ করার বুদ্ধি ও শক্তি গজায়। আর, পরিবার-পরিবেশের সবার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে হয়, তাদের সাধ্যমত সেবা দিতে হয়। চরিত্রের গুণে মানুষকে যে আপন ক'রে নিতে জানে, ধীরে-ধীরে তার দুঃখ ঘোচার পথে চলে।

একজন বললেন—আমার মনের মধ্যে খুব দুশ্চিন্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী-জন্য দুশ্চিন্তা ?

উক্ত দাদা—শরীর ভাল না, কী করলে শরীরটা সারে, আর কী ক'রে সংসারটা চালান যায় এই সব ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখা। শরীরটা যাতে ভাল হয় তাই কর্। শরীর এমন মজবুত করা লাগে যাতে ভূতের মত খাটতে পারিস। শরীর ভাল হ'লে মনও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তখন অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে নিজের শক্তি-সামর্থ্য-অনুযায়ী ছোটখাট একটা-কিছু নিয়ে লেগে পড়বি। নিজের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু সে কথা বড় ক'রে না ভেবে ভাববি পরিবেশের কী অভাব বা প্রয়োজন তুই মেটাতে পারিস। তাতেই স্ফূর্ত্তি ক'রে লেগে যাবি। আর যা' করবি, তা' নিখুঁতভাবে করবি। তার মধ্যে যেন কোন গলদ, গাফিলতি বা গোঁজামিল না থাকে। এর ভিতর-দিয়েই পয়সা আসে, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কেবলই অপরকে ভালবাসার তালে থাকবি, অপরের সুখ-সুবিধা দেখার তালে থাকবি—নিজেকে বিপন্ন না ক'রে। পরের মঙ্গল করার নেশা যদি তোমাকে পেয়ে বসে, তখন অমঙ্গল তোমার কাছ থেকে ছুটে পালাবার পথ পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণা-সন্দীপী, প্রাণময়, অমোঘ অমিয় কথন শুনতে-শুনতে দাদাটির ব্যথাহত বিষণ্ণ মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

দাদাটি বললেন—আপনার দয়া হ'লে সব পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া আছেই। জীবনটাই তাঁর দয়া।

সুবোধভাই (দাস) বললেন—ধানবাদে একটি দাদা দীক্ষা নেবার কয়েকদিন পর পাগল হ'য়ে গেছে। তাতে লোকে সৎসঙ্গের দুর্নাম করে। এখন কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্ত ভঙ্গীতে জবাব দিলেন—কত বর্ব্বর আছে, কত কথা বলে। আর তোমরাও যদি বর্ব্বর হও, তাহ'লে তার উত্তর দিতে পার না। মানুষ যদি বলে অমুক লোক ভাত খেয়ে পাগল হ'য়ে গেছে—তার কি কোন মানে হয় ?

আশুভাইয়ের (ভট্টাচার্য্য) ইচ্ছা চাকরী বা ব্যবসায় এই জাতীয় অর্থকরী কিছু করা।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাকরী হ'ল subservient service (পরনির্ভরশীল আজ্ঞানুবর্ত্তী সেবা)। তার মানে আর একজন আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে আর তার বিনিময়ে আমি তার হুকুম তামিল ক'রে যাব। খাটতে আমি রাজী আছি, কিন্তু নিজের মাথা খাটিয়ে দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়ে কিছু করবার ঝামেলা পোহাতে রাজী নই। একজন যতই efficient (দক্ষ) হোক না কেন, যদি সে স্বাধীন ও সদ্ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করার যোগ্যতা অর্জ্জন না করে, তাহ'লে তার আত্মপ্রত্যয়ও গজায় না, ফলে ভয় ও দুর্ব্বলতাও যায় না। সাধারণতঃ একটা চাকর service (সেবা) দেয় not for the man, but for the money (নিয়োগকর্ত্তা মানুষটির জন্য নয়, তার অর্থের জন্য)। এই বুদ্ধি ভাল নয়। মানুষ অর্থস্বার্থী না হ'য়ে সেবাস্বার্থী ও লোকস্বার্থী হ'য়ে যদি চলে, তাতে তার নিজেরও মঙ্গল হয়, পরিবেশেরও মঙ্গল হয়। এতে dishonesty (অসাধুতা) মাথা তোলা দিতে পারে না। কেউ যদি চাকরীই করে আর সে যদি তার মনিবকে সদ্ভাবে লাভবান ক'রে নিজে লাভবান হ'তে চায়, সেটা কিন্তু মন্দের ভাল। সেখানে সে শুধু অর্থস্বার্থী নয়, মানুষস্বার্থীও বটে। চাকরীর থেকে ব্যবসায় ভাল। কিন্তু ব্যবসাদার যে, সেও যদি মানুষস্বার্থী না হয়ে দাঁ মেরে টাকা করার ফন্দী আঁটে, তাহ'লে ব্যবসায়ের তাৎপর্য্য যায় নষ্ট হ'য়ে এবং ব্যবসায়ও বেশী দিন টেকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আপন মনে আবার বললেন—সব চাইতে জবর জিনিস হ'ল nurturing service (পোষণী সেবা)। একজন হয়তো একটা বাগান করল। ভাল ক'রে তদ্বির করল। প্রত্যেকটি গাছে সার দিল, জল দিল। গাছগুলি বড় হ'ল, ফল ধরল। ফল পেকে প'ড়ে গেল। তখন সেই ফল কুড়িয়ে নিয়ে অন্যকেও দিল, নিজেও খেল। তার বীচিটা আবার পুঁতে দিল। আবার গাছ হ'ল। গাছের যত্ন নিয়ে থাকল। গাছগুলি পুষ্ট হ'য়ে উঠুক, তাজা হ'য়ে উঠুক—এই দেখেই সে খুশী, এই তার মস্ত আত্মপ্রসাদ। নিজের গাছের ফল, অথচ নিজে হয়তো অনেক সময় খায় না, পাঁচজনকে বিলিয়ে দেয়। তবু বাগানের পিছনে পয়সা ঢালে, কত পরিশ্রম করে। গাছগুলিকে লালন-পালন করাই যেন তার নেশা। একেই বলে nurturing service (পোষণী সেবা)। অনেকে গরুর জন্য অমন করে। কেমন যেন একটা অকারণ টান। মানুষ ছেলেপেলের জন্য কতখানি inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) নিয়ে করে। তারা বড় হ'লে, সুখী হ'লেই খুশী। বিশেষ কোন স্বার্থ-প্রত্যাশা রাখে না। তবে আমি আমার ছেলেপেলের interest (স্বার্থ),

এইটুকু বোধ করতে পারলে বাপের মনে আনন্দ ধরে না। আমি ignored (উপেক্ষিত) এ-কথা love (ভালবাসা) বোধহয় সইতে পারে না। ছেলের টাকা হ'লে বাপে যে পাবে, তা' নয়, তার যদি নাম হয়, বাপের নিজের খ্যাতি তাতে হয়তো বাড়ে না, সে ভালটা খেলে তার খাওয়া হয় না, তবু তাতেই তার সুখ। মানুষ নিজে কত কষ্ট করে কিন্তু ভাবে ছেলেপেলেদের গায় যেন্ কাঁটার আঁচড়টাও না লাগে। বাপে যে ছেলের জন্য এত করে, তা' কিন্তু ছেলে ভাল ক'রে অনুভব ও উপভোগ করতে পারে না যদি সে ভালবেসে বাপের জন্য কিছু না করে।

প্রফুল্ল—কেউ যদি আমার জন্য খুব করে, তাহ'লে তা' আমি অনুভব ও উপভোগ করতে পারব না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে আমার জন্য করে, তার দিকে যদি আমার মন উন্মুখ না হয়, তাহ'লে তার করাটা তলিয়ে বোধ করতে পারি না। বিনামূল্যে পুকুর বা নদীর অপর্য্যাপ্ত জলে যখন আমরা স্নান করি, তখন কি আমরা জলের কদর ভাল ক'রে বুঝতে পারি? কিন্তু এখানে যে পয়সা খরচ করে ভারী দিয়ে কুয়ো থেকে জল আনিয়ে ঘরে ব'সে স্নান করতে হয়, তাতে হিসেব ক'রে গায় জল ঢালতে হয়। কারণ, তুমি জলের জন্য মূল্য দিচ্ছ। তেমনি, তোমার জন্য তোমার বাপ-মার অফুরন্ত করার মূল্যটা বোঝার জন্যই তোমার তরফ থেকে তাদের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে কিছু করা উচিত। সেই জন্য আমি পিতৃভৃতি, মাতৃভৃতি করার কথা কই। শাস্ত্রে যে পিতৃতর্পণের কথা আছে, তারও উদ্দেশ্য পিতৃপুরুষের প্রতি আমাদের মন উন্মুখ ক'রে তোলা, যাতে তাদের শুভ স্মৃতি আমাদের উন্নত চলনে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে খালি গায় ব'সে আছেন। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর এখনও হাওয়ার মধ্যে যেন আগুনের হল্‌কা। প্যারীদা (নন্দী) হাতপাখা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাতাস করছেন। তাও যেন তিনি সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। এমন সময় পূজনীয়া বড় বৌদি ও কল্যাণী-মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশীমনে তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

গরমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কষ্ট হ'চ্ছে দেখে বড় বৌদি ভিজে গামছা দিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গ মুছে দিলেন।

এরপর তাঁরা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

ধীরে-ধীরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন।

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবই ভাষা বের ক'রে আনে। ভাষা বেরোয়, করা যায় না। অবশ্য বিশেষ ক'রে আমার।

কেষ্টদা—প্রয়োজনমত আপনার তো সব-কিছু বেরিয়ে আসে। নাটকও তো আপনি লিখেছিলেন 'দেবযানী'। তিনটে ছোটগল্প কেমন সুন্দর লিখেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবযানী যখন লিখি, তখন খুব ছোট। পণ্ডিতের থেকেও কম বয়স। ও লেখাতেও ঐ একই ধাঁজ, একই সুর।

কেষ্টদা—হ্যাঁ!

মেণ্টুভাই (বসু) নিজের খাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও কেষ্টদার autograph (স্বহস্তলিখন) প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে গভীর কণ্ঠে বললেন—লেখা-টেখা সব ঠিক আছে। এখন চরিত্রে লিখতে পারলে হয় অর্থাৎ practically (বাস্তবে) achieve (আয়ত্ত) করলে হয়।

মেণ্টুভাই—কিভাবে করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যানুসরণে এমন কি কোন কথা আছে—সেবা কর, কিন্তু স্বাবলম্বিতাকে নষ্ট ক'রো না?—

কেষ্টদা—মনে পড়ে না।

মেণ্টুভাই—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বিপদে পড়লে একজন হয়তো তোমাকে অর্থ সাহায্য করল, কিন্তু সাহায্য বরাবর এমনভাবে করা উচিত নয়, যাতে তোমার উপার্জ্জন-ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।

মেণ্টুভাই—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে একজন হয়তো ভাত রেঁধে দিচ্ছে। তা' রেঁধে দিক, তাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে এমন অবস্থার যেন সৃষ্টি না করে, যাতে দরকার মত তুমি নিজে আর রেঁধে খেতে পারবে না। আমি যেমন পায়ের অসুখের পর থেকে বাধ্য হ'য়ে service (সেবা) নিতে-নিতে আজ পঙ্গু হ'য়ে পড়েছি।

মেণ্টুভাই—এটা কার লক্ষ্য রাখা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে service (সেবা) দেবে সে লক্ষ্য রাখবে, তবে যে service (সেবা) নেবে, তারও লক্ষ্য রাখা ভাল।

কেষ্টদা—সে-দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভিক্ষুককেও তো ভিক্ষা দেওয়া চলে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা চরমে টেনে নিয়ে ওভাবে বলতে পারেন। তবে আমি চাই না যে আমার কথার দোহাই দিয়ে কেউ প্রয়োজন-পীড়িতকে সেবা ও সাহায্য করা থেকে বিরত হোক। আবার, সেবা দিতে গিয়ে যদি কারও যোগ্যতা নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়, তাও ঠিক নয়। মানুষকে যোগ্য হ'তে সাহায্য করাই সেবার একটা vital factor (প্রাণবস্তু)।

কেষ্টদা—হেনরী ফোর্ড বলেছেন unsympathetic charity-তে (সহানুভূতিহীন বদান্যতায়) দুনিয়ার অসাধারণ ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Unsympathetic ও unintelligent charity (সহানুভূতিহীন ও বুদ্ধিরহিত বদান্যতা) ভাল নয়।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মনকে বাদ দিয়ে সেবা করতে যেও না, সেবা তোমার নিরর্থক হবে।

তারপর আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন—এ ভাষাটা বেশ সহজ হয়েছে। সত্যানুসরণের মত হয়েছে। পরমপিতা দিলে আবার হয়তো আসতে পারে।

একটু বাদে উপরোক্ত ভাবটি অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজীতে বললেন—Never serve one ignoring one's mind, it will go to dogs.

কেষ্টদা—আপনি মাঝে বলেছিলেন ইংরেজী আর আসবে না, কিন্তু তারপর তো কত দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোমোহন ভঙ্গীতে ডান হাতখানি ঘুরিয়ে সহজ নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন—পরমপিতার মরজি। আমার কোন হাত নেই।

মেণ্টু—গুরুর আদেশ পালন করার পথে প্রধান অন্তরায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরায় আবার কি? অন্তরায় মন অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তিগুলি—পিছুটান যাকে কয়। গুরুকে যে ভালবাসে, গুরুকে খুশী করার প্রলোভন যার প্রবল হয়, সে গুরুর আদেশ পালন না ক'রে পারে না। নিজের খেয়াল-খুশী ও অষ্টপাশকে যে প্রাধান্য দিয়ে চলে সে আর পেরে ওঠে না।

মেণ্টু—অষ্টপাশ কী? অষ্টপাশ কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে বললেন—এই সম্বন্ধে আমার যা' বলা আছে, সেটা ওকে প'ড়ে শোনা।

প্রফুল্ল—লেখাটা পাবনায় থাকতে দেওয়া। খাতাটা বোধহয় কেষ্টদার বাড়ীতে আছে। এখন রাত্রিবেলায় তাড়াতাড়ি খুঁজে পাব কিনা কি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! উল্টা না ভেবে যখন যা' করার তন্মুহূর্ত্তেই তা' করতে লেগে গেলেই করাটা তাড়াতাড়ি সমাধা হয়।

এরপর কেষ্টদার বাড়ী থেকে খাতাটা এনে তা' থেকে হ্যারিকেনের আলোয় প'ড়ে শোনান হলো— "অন্তঃকরণে উচিত ব'লে যা' উদয় হয়, তা' করতে দেয় না কিসে জান? মানুষের অন্তর্নিহিত নিরোধপ্রবৃত্তি বা ভাব। ঐ প্রবৃত্তি বা ভাব আট প্রকারের প্রকৃতি বা রূপ নিয়ে কর্ম্মপ্রেরণাকে নিরোধ ক'রে থাকে, তা' হচ্ছে —ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ আর পৈশুন্য অর্থাৎ খলতা বা ক্রূরতা; আর একেই বলে অষ্টপাশ। তাই নিরোধের ভাবটাকে যেমন ক'রেই হোক উড়িয়ে দিয়ে করার প্রেরণাকে যে মুক্ত চলনায় চালাতে পারে, সে পারে।"

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর মেণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা গেল?

মেণ্টু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

"যা' সম্পাদন করতে হবে, তা' যথাসময়েই ক'রো, নতুবা ভণ্ডুলেই যাবে কিন্তু!"

কেষ্টদা—যে-সময় যা' করার, তা' না ক'রে-ক'রে পরে একটা কাজ সুরু করলে দেখা যায়, আর দশটা চেপে ধরেছে। এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা ছাড়া পথ নাই। করণীয় কখনও আমাদের রেহাই দেয় না কিন্তু।

কেষ্টদা—তখন কোন্‌টা করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা করলে সবগুলি করা হয় বা করার পথ খুলে যায়, সেইটের উপর জোর দিতে হয়। আর, বিভিন্ন কাজ করতে গেলে সেগুলি যাতে inter-fulfilling (পরস্পর-পরিপূরক) হয়, তেমনভাবে adjust (বিন্যাস) ক'রে নেওয়া লাগে।

কেষ্টদা—ক'রে-ক'রে আগের arrears (বকেয়া কাজ) কি পুরো make up (পূরণ) করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে-করতে capacity (ক্ষমতা) বেড়ে যায়। দীপঙ্কর যেমন ৬০ বছর বয়সে বেরিয়ে গিয়ে কত কী করলেন। না করলে পরে system (দেহবিধান)-ও educated (শিক্ষিত) হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

"তোমার বিদ্যা যদি মাথাতেই মজুত থাকে, আর তা' শরীরকে শিক্ষিত করতে না পারে, সে-শিক্ষা তোমার কিছুই নয়।"

উপরের বাণীর ভাব-অবলম্বনে ইংরেজীতে বললেন—

"If your learning is accumulated in your brain only but does not train your physique that is not education, you are not educated at all."

পরে বললেন—

"যদি বিচ্যুতিকে এড়াতেই চাও, তবে সর্ব্বতোভাবে অচ্যুত হও।"

উক্তভাব নিম্নলিখিতরূপে ইংরেজীতে ব্যক্ত করলেন—

"Be unrepelled and avoid mistakes."

আর একটি বাণীতে বললেন—

"উন্নত হও আর উন্নত কর, কিন্তু স্বার্থসমারোহে অবনতির বিস্তার এনো না।"

ঐ বাণীর ইংরেজী ক'রে বললেন—

"Be developed and develop others, but do never spread downfall with ceremonious selfish move."

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—আমাদের যে করার ইচ্ছা নাই, তা' নয়, কিন্তু shrink করি (সঙ্কুচিত হই), তাই করা হয় না।

কেষ্টদা—Shrink করি (সঙ্কুচিত হই) কিসের জন্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাছটানের জন্য। হয়তো বাজারে যাব, কলম আনতে হবে। যাবও। কিন্তু হয়তো এর সঙ্গে আর পাঁচটা অবান্তর করণীয় জুটিয়ে নিলাম। এর ফলে মূল সম্বেগ খোয়া গেল অনেকখানি। নানান তালে প'ড়ে শেষটা কলম আনতেই হয়তো ভুল হ'য়ে গেল কিংবা কলম আনতে এতই দেরী হ'য়ে গেল যে কাজের অনেকখানি ক্ষতি হ'য়ে গেল। Purpose to the principle (আদর্শ-পূরণী উদ্দেশ্য) যদি মানুষের prominent (মুখ্য) না হয়, তাহ'লে success (সাফল্য) তার সুদূরপরাহত হ'য়ে ওঠে। কারণ, প্রবৃত্তি ও পরিবেশের হাজারো টান, হাজারো প্রয়োজন তাকে ছিঁড়ে খেতে থাকে। অথচ সে ভাবে—আমি তো খারাপ কিছু করছি না। আমার নিতান্ত কপাল মন্দ তাই এত ক'রেও আমার দুঃখ ঘোচে না।

বঙ্কিমদার (রায়) মনে সংশয় ছিল 'অচ্যুত' শব্দটি হয়তো যোগারূঢ় শব্দ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থে শুধু বিশেষ্য পদেই প্রয়োগ করা হয় এবং এর বিশেষণ-প্রয়োগ হয়তো বা অসিদ্ধ। তাই তিনি অভিধান দেখে নিঃসংশয় হ'য়ে এসে হাসিমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব কথা জ্ঞাপন ক'রে প্রসঙ্গতঃ বললেন—'অচ্যুত' শব্দটির বিশেষ্য প্রয়োগ, বিশেষণ প্রয়োগ দুই-ই আছে দেখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—কোন্‌টা কী পদ তা' তো জানি না। কিন্তু 'অচ্যুত' কথা যে বলেছি, ঐ কথার কোন substitute (প্রতিশব্দ) হয় না। পাব কোথায় অমন কথা ? 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' ছাড়া তো উপায় নেই। যেখানে যা' লাগে, সেখানে তাই-ই এসে যায়। পরমপিতা যোগান দেন।

২৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১২।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় ব'সে পর-পর কয়েকটি বাণী দিলেন—

প্রথম বাণীতে বললেন—

"নীতি যা' ছোটকে বড় করতে জানে না, অথচ বড়কে ছোট করে, তা' মৃত্যুপন্থী—বাস্তবে।"

এই বাণীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বললেন—বড়র উপর সক্রিয় শ্রদ্ধাই মানুষকে বড় ক'রে তোলে। তাই, বড়র উপর শ্রদ্ধা যাতে বাড়ে, সেই ব্যবস্থা করা লাগে। বড়রও বড় আছে, তাই তারও উচিত শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া এবং ছোট যারা, দুর্ব্বল যারা স'য়ে-ব'য়ে, ভালবেসে, সেবা ও উৎসাহ দিয়ে তাদের যোগ্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করা। এতে সমাজবন্ধন ঠিক থাকে এবং প্রত্যেকেই উন্নতির পথে চলে। বড়র দায়িত্ব বেশী, তার আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তার উপর ছোটর শ্রদ্ধা, ভালবাসা উথলে ওঠে। কিন্তু ছোট যদি প্রকৃতিগতভাবে শ্রদ্ধাহীন ও অকৃতজ্ঞ হয়, বড়র সেখানে কিছু ক'রে ওঠা দায়।

প্রফুল্ল—তথাকথিত বড় যে, যে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে, যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মানুষের জীবন বিপন্ন ক'রে তোলে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তো একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে বহুস্থানে এমন উল্টো ফল ফলে যে প্রকৃত বড় যারা, যারা লোকপালী, তাদের উপরও মানুষ অশ্রদ্ধাবান হ'য়ে ওঠে। এর প্রতিকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বড়র মত ক'রে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ছোট ছোটর মত ক'রে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। আবার, মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংস্থার হাতে যদি তা' কেন্দ্রীভূত কর, তার পরিচালক যারা, তারাও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। এর হাত থেকে নিস্তার নেই, যত সময় বেশীর ভাগ মানুষ বিশেষতঃ সমাজের শ্রেষ্ঠরা প্রকৃত ইষ্টপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রাণ না হয়। তাই যজনসমন্বিত যাজন ও অসৎ-নিরোধ সমাজে এতখানি বিস্তারলাভ করা চাই যাতে মানুষ ভাল হওয়ার এন্তার প্রেরণা পায় এবং

খারাপ হ'তে বা করতে গেলে সুরু থেকেই চারদিক থেকে পদে-পদে বাধা ও বিরূপ-তার সম্মুখীন হয়। অসৎ-নিরোধ যারা করবে তাদের যেমন চাই সাহস, তেমনি চাই সংযম ও শুভবুদ্ধি। তাতে মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে, এক অমঙ্গল দূর করতে গিয়ে আর এক অমঙ্গলের আমদানি হয় কমই। আমি যদি কারও বেচাল চলনের বিরোধী হই, তাহ'লে তার মনে আমার এই বোধ গজিয়ে দিতে পারা চাই যে আমি তার দোষকে ঘৃণা করলেও তাকে ঘৃণা করি না। তাকে আমি ভালই বাসি ও তার ভালই চাই। নিজের বেয়াড়া ছাওয়াল-পাওয়ালের বেলায় আমরা যে মনোভাব নিয়ে যেমন-যেমন করি, বাইরের বেয়াড়া মানুষগুলির বেলায়ও সেই মনোভাব নিয়ে তেমনি-তেমনি করলে সুফল পাওয়া যায়। কঠোর ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে obsession-এর (অভিভূতির) ঊর্দ্ধে থাকা যায় না এবং নিজে obsession-এর (অভিভূতির) ঊর্দ্ধে না থাকলে, মানুষকে obsession (অভিভূতি) কাটাবার ব্যাপারে সাহায্য করা যায় না।

আরো কয়েকটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—লেখাগুলি কেমন হ'চ্ছে ?

বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য)—বেশ সহজ, সবাই বুঝতে পারবে।

বিরাজদা কোন একজন বিশিষ্ট লোকের সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভদ্রলোক নিজে ভাল, কিন্তু অন্যে বাজে idea (ধারণা) দিয়ে তাকে খারাপ ক'রে ফেলেছে।

বিরাজদার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর ত্বরিতবেগে বললেন—খারাপ idea (ধারণা) দিলে, যে তা' নেয় সেই তো লোক খারাপ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। এমন সময় দেওঘরের থার্ড অফিসার এবং স্থানীয় এক ভদ্রলোক আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

তাঁরা বসার পর ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠল। নিরন্তর ঈশ্বরীয় স্মৃতি মনে জাগ্রত রাখা সম্ভব কিনা এবং তা' কিভাবে সম্ভব—এই তাঁদের জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—ইষ্টের উপর বুকচোয়ান টানের ফলে 'যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা-তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে'—এমনতর অবস্থা হয়। যা' দেখছে, তাতেই মনে হ'চ্ছে এটা তাঁর কোন কাজে লাগে কিনা, এ-দিয়ে তাঁকে কিভাবে নন্দিত করা যায়। একটা ডালিম গাছের ফুল দেখে হয়তো মনে হ'ল, তিনি ডালিম কত ভালবাসেন, তাঁর ঠোঁটটি কি পায়ের তলাটি দেখতে ঠিক ডালিম

ফুলের মত। আবার, Beloved (প্রেষ্ঠ) যদি চ'লে যান, তখন কেবলই মনে হ'তে থাকে—তিনি এইখানে বসতেন, এইখানে স্নান করতেন, এইভাবে হাঁটতেন, এই ভঙ্গীতে কথা বলতেন, এইভাবে খেতেন, এই-এই জিনিস পছন্দ করতেন, এই সময় তিনি ঘুমাতেন, এই রকম ক'রে তিনি হাসতেন, হাসার সময় কত সুন্দর দেখাত তাঁর মুখখানি। একের পর এক অফুরন্ত স্মৃতি ভেসে উঠতে থাকে মনের পরদায়। যেন বায়োস্কোপের রীল পর-পর চলছে। কত মধুর লাগে সেই সব স্মৃতির অনুধ্যান। তাতেই ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে। তিনি যেন মনের মধ্যে লেগেই থাকেন, তাঁকে জড়িয়েই অস্তিত্বটা, ভোলার জো নেই।

থার্ড অফিসার বললেন—এ তো এক রকমের মায়া!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়াটা জন্মান চাই তাঁর উপর। তাতেই মুক্তি। মায়া কথার মানে পরিমিতি। সন্তানকে পরিমাপিত ক'রে দেন যিনি তাঁকে বলা হয় মা, আর তার জীবনবীজ বপন ক'রে দেন যিনি তাঁকে বলা হয় বাবা।

একটু থেমে ইজিচেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে ব'সে নিগূঢ় কণ্ঠে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বললেন ঠাকুর—অতশত কিছু না। মূল কথা—তাঁর উপর টান হওয়া ও তাঁর জন্য সব কিছু করা, যেমন আমরা বৌ, ছেলেপেলের জন্য করি কিংবা একটা ভাল ছেলে তার মা-বাপের জন্য করে। এটা আমরা করছিই। এতে আমরা চির অভ্যস্ত। এইটে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে করলেই হ'ল এবং সাধ্যমত এই করাটা ক্রমাগত বাড়িয়ে চললেই হ'ল। এই-ই যোগ, এই-ই concentration (একাগ্রতা), সাধন মানেও ঐ। একেই অন্য ভাষায় বলে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'—যা' দীক্ষার উপদেশ-অনুযায়ী বিধিমাফিক করতে হয়।

মনস্থির করা মানে অনেকে ভাবে মনে কোন চিন্তা উঠবে না। তা' কিন্তু কথা নয়। আদত কথা হ'ল—সব চিন্তাকে ইষ্টে সার্থক ক'রে একসূত্রসঙ্গতিশীল ক'রে তোলা। আবার, সমাধি বলতে অনেকে ভাবে বেহুঁশ হওয়া, কিন্তু কথা হ'ল সম্যক্ ধারণা। সমাধি নানা ব্যাপারে হ'তে পারে। যার যে-ব্যাপারে যে-মাত্রায় সমাধি হয়, সে সেই ব্যাপারে সেই মাত্রায় ধৃতি বা ধারণা অধিগত করে। একজন তন্ময় হ'য়ে অঙ্ক কষছে, চটা দিয়ে তার পিঠের উপর একটা বাড়ি মারলেন, তার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ভাবল হয়তো একটা মশা বা মাছি পড়ল গায়। আপন মনে অঙ্কই কষে যাচ্ছে। ফলকথা, যে যে-বিষয়ে যতখানি সক্রিয়ভাবে তন্ময় হয়, সে-বিষয়ক জ্ঞান ও বোধও তার ভিতর ততখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য, আধার-মাফিক যার যেমনটা হওয়া সম্ভব।

একজন বললেন—কী চাই, তাই যেন ঠিক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ভালবাসি তাই চাই, আর তার অনুকূলে যা' তাই চাই। যে বাজারের পটলীকে ভালবাসে, সে পটলীর মত মেয়েমানুষ আর দেখে না, সেই তার দুনিয়ায় সেরা। হয়তো তার সতী-সাধ্বী, সুন্দরী স্ত্রীর দিকে সে ফিরেও চায় না। টাকার উপর যার নেশা, সে হয়তো ভাল ক'রে ভেবেও দেখে না, কিজন্য সে টাকা-টাকা করে। অথচ লোভের বশে সে টাকার পিছনে ঘোরে। ফলকথা, আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ও বংশপরম্পরায় আরো-আরো ক'রে বাঁচতে চাই ও প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে চাই। কিন্তু মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পায় যে তার ভালবাসার বস্তু ও মাত্রা যত superior (উন্নত) হয়, ততই সে superior knowledge, experience, ability, consciousness, keenness ও enjoyment (উন্নত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, চেতনা, তীব্রতা ও উপভোগ)-এর অধিকারী হয়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ যারা, তারা superior-most (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) যিনি, যাঁর আর এক নাম ভগবান, তাঁর জন্য পাগল হয়। ভগবানের উপর ভক্তি থেকে জ্ঞান আসে, দর্শন আসে। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন বাদ দিয়ে শুধু দর্শন প'ড়ে জ্ঞান-ভক্তি কতখানি হয় বুঝতে পারি না। তাই, যে প্রকৃত সুখ-শান্তি চায় তার উচিত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দিকে নজর দেওয়া।

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক বললেন—তাহ'লে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য জীবনের goal (উদ্দেশ্য)-টা জানা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। আবার, বৈষ্ণবদের ঐ কথাও আমার ভাল লাগে—'আমরা চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি'। তাঁকে সেবা করাই তো জীবনের enjoyment (উপভোগ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণস্পর্শী কথাগুলি শুনে সবাই আনন্দ ও উদ্দীপনায় ভরপুর হ'য়ে উঠলেন।

৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় প্রসন্নচিত্তে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়), রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা), বীরেনদা (মিত্র), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), খগেনদা (তপাদার), ডাক্তার কালীদা (সেন), বঙ্কিমদা (রায়), ভগীরথদা (সরকার), হরিপদদা (সাহা), প্রকাশদা (বসু), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), চারুদা (করণ), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), অবিনাশদা (পাল), শৈলেশদা (বিশ্বাস), সরোজিনীমা,

কালিদাসীমা, সেবাদি, কালিষষ্ঠীমা, বিজয়দার মা, ভুবনের মা, রেণুমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভগীরথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সেই ওষুধটা আনাইছিস ?

ভগীরথদা—আনতে দিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডিসপেন্সারী ভাল ক'রে সাজায়ে ফেলা লাগে, যাতে দরকার-মত মোটামুটি সব ওষুধ পাওয়া যায়।

ভগীরথদা—জায়গার অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাস-উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন—ওষুধই তার জায়গা ক'রে নিবি। তুই ভাবিস ক্যা ? তুই তোর কামে লাগে' যা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

"তুমি তোমার ভরদুনিয়ায় যা' দেখ, যা' শোন, যা' পাও তার প্রতি প্রত্যেককে অনুধাবন কর, অন্বেষণ কর তোমার প্রিয়পরমের সার্থকতাকে, আর কাজে তা' মূর্ত্ত ক'রে তোল, ব্রাহ্মীজ্ঞান তোমাকে প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে।"

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিতকণ্ঠে বললেন—শুধু শুনলে, বুঝলে বা বললে কিছু হয় না। বুঝ-অনুযায়ী চলা লাগে, করা লাগে। না ক'রে-ক'রে আমাদের যেন চরা প'ড়ে গেছে। এর প্রতিকার না করলে হবে না। আর, সে-প্রতিকার যার-যার নিজের হাতে। তার উপর অন্যের কোন হাত নেই। আমি ভাবি, যা'-কিছু মনে আসে অন্ততঃ ক'য়ে যাই, অমুক বিষয়ে বলা নেই—এমনতর আপসোস যেন কারও না থাকে।

কেষ্টদা—আপনার ছড়ার মধ্যেও মোটামুটি সব আছে। প্রয়োজনীয় কোন কথাই বড় বাদ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই আমি বলি, ছড়া যদি whole thing (সবটা) না ছাপেন তবে structure of the individual and structure of the society (ব্যক্তি ও সমাজের গঠনবিন্যাস) ঠিক পাওয়া যাবে না। Whole thing (সব জিনিসটা) ছাপলে survey of the individual and society (ব্যক্তি ও সমাজের বীক্ষণা) সমগ্রভাবে ধরা দেবে। এর দরকার খুব বেশী। কারণ, প্রয়োজনীয় সামান্য কোন একটা দিককেও যদি আমরা neglect (উপেক্ষা) করি, সেই ফাঁক দিয়েও যথেষ্ট অনাসৃষ্টির আমদানি হ'তে পারে। তাই সব দিকে সমান তালে নজর রেখে চলা লাগে। অবশ্য, ইষ্টপ্রাণতা থাকলে আপ্‌সে-আপ সব বোধ গজিয়ে ওঠে। তবু all-round knowledge-এর (সর্ব্বতোমুখী

জ্ঞানের) culture (অনুশীলন) এন্তার চালান লাগে with an accent on action (কাজের উপর জোর দিয়ে)।

প্রমথদা (দে) একটা নূতন কলম ও খাতা নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন—আপনি দয়া ক'রে যদি কিছু লিখে দেন……।

প্রমথদার প্রার্থনা-অনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুর লিখে দিলেন—

"যাহা বলি
তাহা তোমার সব বুদ্ধিবিবেচনায়
দক্ষ ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করিও,—
সার্থক হইবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত), কাশীশ্বরদা (রায়চৌধুরী), হরপ্রসন্নদা (মজুমদার), সতীশদা (দাস), সুরেনদা (সেন) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন।

উপনয়ন-সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—যজ্ঞেশ্বর তো নিলে পারে। ও তো পালের গোদা। এমনি তো তেইশমারা গেছে, এখনও যদি তেইশমারার পথে চলি, কোথায় যেয়ে দাঁড়াব ? আর্য্যকৃষ্টি, দশবিধ সংস্কার ও সদাচার পালনে পরাঙ্মুখতার দরুন বেশীর ভাগ লোকের মন আজ নীচু হ'য়ে গেছে, গৌরব কিসে বোঝে না, সে-দিকে ঝোঁকে না। নিজেরা আচার-আচরণ ও শুভ সংস্কারগুলি নিষ্ঠা-সহকারে নিখুঁতভাবে পালন ক'রে চললে ও সামাজিক শাসন বজায় থাকলে সবারই ভাল হয়। সমাজ বলতেই বোঝায় বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণকে। একজন বিপ্রও যদি বেচাল-চলনে চলে তবে চার বর্ণ মিলে তাকে boycott (বর্জ্জন) করতে পারে। একটা আছে সামাজিক শাসন, আর একটা আছে সাম্প্রদায়িক শাসন।

যে-সমস্ত offence (অপরাধ) সম্প্রদায়ের কৃষ্টিকে অবনত করে, সেই সব ক্ষেত্রে আগে সাম্প্রদায়িক শাসন চালু ছিল, আর যে-সব দোষের ফলে সমাজের প্রত্যেকের অবনতি আসে, সেখানে সামাজিক শাসনের প্রয়োগ হ'ত। সমাজের বাঁধন ও শাসন ধর্ম্মানুসারী হ'লে, তার ফলে মানুষের ঢের উপকার হয়।

ব্রাত্যদোষ আগে একটা প্রায়শ্চিত্তার্হ অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত। কিন্তু আজ বংশপরম্পরায় অনেকের ব্রাত্যদোষ চলতে থাকা সত্ত্বেও তাদের বা পরিবেশের সে-সম্বন্ধে হুঁশ নেই। অনাচরণ ও অনভ্যাসে মগজের কী দশা হয়, তাই ভেবে দেখ। তাই আমি বলি—আর্য্য দ্বিজদের প্রত্যেকেরই বিহিতভাবে উপনয়ন

নেওয়াই ভাল। ওতে পিতৃপুরুষের সংস্কৃতির ধারাটা ঠিক থাকে। নইলে হিন্দু যে একেবারে ডুবে গেল।

৩১শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১৪।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে বিছানায় ব'সে আছেন। বাইরে খুব গরম হাওয়া, তাই একবার বারান্দায় গিয়ে ব'সে আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), সরোজিনীমা, হেমপ্রভামা, সুরবালামা, অমূল্যদার মা প্রভৃতি ঘরের মধ্যে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—দেখ্ তো ব্যবহার কথার ব্যুৎপত্তি কী ?

অভিধান দেখে বলা হ'ল, বি—অব—হৃ+ঘঞ্।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'অব'র মধ্যে আছে রক্ষা। তাই ব্যবহার বলতে আমি বুঝি তেমনতর চলা, বলা, করা যার ভিতর-দিয়ে নিজের ও অপরের অস্তিত্বরক্ষণী উপাদান বিশেষভাবে আহৃত হয়। আমরা যার সঙ্গে যে-ব্যবহারই করি, সব সময় লক্ষ্য রাখা লাগে কী করলে সে তার পরিবেশসহ রক্ষা পায়। এই বুদ্ধি থাকলে কোথায় কিভাবে চলা লাগবে তা' বুঝতে আর কষ্ট হয় না। "Do unto others as you wish to be done by" (অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন)—ব্যবহার-সম্বন্ধে ঐ হ'ল মোক্ষম কথা। এই principle (নীতি)-টা চরিত্রের সঙ্গে এমন ক'রে গেঁথে ফেলতে হয় যে, তার উল্টো চলন যেন কিছুতেই আমাদের মধ্যে মাথা তোলা দিতে না পারে।

মণি সেন একটা পাত্র হাতে ক'রে ঘরে ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে ? কী মাল আনলি ?

মণি—বাজার থেকে কয়েকটা ক্ষীরণী নিয়ে এসেছি আপনার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আবার কি রে ?

মণি—এই দেশের একরকম ফল। এখানকার লোকে খুব খায়। আমি বাড়ী থেকে ভাল ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার পাত্রে ক'রে নিয়ে এসেছি।

মণিভাইয়ের মনোগত আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন ক'রে আগ্রহ সহকারে বললেন—আন্ তো এই দিকে।

মণি-ভাই পাত্রটি সামনে ধরতেই শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া ক'রে তা' থেকে কয়েকটি তুলে মুখে দিলেন এবং উপস্থিত প্রত্যেককে স্বহস্তে দু-চারটি ক'রে 'ক্ষীরণী' প্রসাদ-স্বরূপ বিতরণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার্থিব করুণাস্পর্শে সকলের অন্তরে এক গভীর আনন্দানুভূতি দোলা দিয়ে গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতা থেকে আনীত একখানি নূতন বাংলা অভিধানের (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বঙ্গীয় শব্দকোষ) পাতা উল্টে-উল্টে দেখে সন্তোষ-সহকারে বললেন—বেশ ভালই।

'মহাভারতের সমাজ' বইটা প'ড়ে কেষ্টদার খুব ভাল লেগেছে। তাই তিনি বললেন—আপনার ভাবধারার সঙ্গে খুব মেলে। আপনার শুনলে ভাল লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী মনে বললেন—তাই নাকি? তা' পড়েন না খানিকটা।

কেষ্টদা বেশ খানিকটা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে সবটা শুনে বললেন—সমাজ-পরিবেশ যদি ভাল হয় তবে মানুষের চরিত্র-গঠন সহজ হ'য়ে ওঠে। তবে বিবাহ ও জনন ঠিক না থাকলে কোনটাই তত কার্য্যকরী হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বামুন-সমাজ বললে আমার মনে হয়, ভুল হবে। চার বর্ণ নিয়েই সমাজ। তাই বামুন সম্প্রদায় বা বিপ্রসম্প্রদায় বলা ঠিক।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে গেলেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ১৫।৫।১৯৪৮)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমতলায় এসে ইজিচেয়ারে উপবেশন করেছেন। ভক্তগণ এসে প্রণাম ক'রে কেউ-কেউ নিজ-নিজ কাজে চ'লে যাচ্ছেন, কেউ বা কাছেই থেকে যাচ্ছেন।

কেষ্টদা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থাপন করলেন।

কেষ্টদা বললেন—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"—এটুকু তো আশার বাণী, কিন্তু "অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"—এটা তো বড় নিষ্ঠুর ভীতিপ্রদর্শন। এই ভয়ের কথা বলার কী প্রয়োজন? ভয় দেখিয়ে যদি ভক্তির উদ্রেক করার চেষ্টা করা যায়, তাহ'লে তো মেরুদণ্ডওয়ালা মানুষ যারা, তারা অপমান বোধ করে ও বেঁকে দাঁড়ায়, আর দুর্ব্বল লোকেরা যদি ভয়ভীত হ'য়ে আত্মস্বার্থের খাতিরে নতি স্বীকার করে, তাদের সে আনতির দাম কী? ওর ভিতর-দিয়ে কি ভক্তি-ভালবাসা বা চারিত্রিক জেল্লা ফোটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কাউকে ভয় দেখিয়ে ভক্ত করার গরজ হয় না।

সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ যারা, তারা তাদের অন্তরের অবাধ্য তাগিদেই ভগবানকে খোঁজে, ভগবৎ-পথে চলে। তার ফলে সব প্রতিকূলতাকে জয় ক'রে তারা স্বভাবতঃই সুখী ও সার্থক হয়। তারাও ভগবানকে enjoy (উপভোগ) করে, ভগবানও তাদের enjoy (উপভোগ) করেন। আর, অহঙ্কারবশে যারা ভগবান ও ভাগবত বিধির অবাধ্য হ'য়ে প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে চলে, তাদের ঐ শাতন-সেবাও কখনও নিষ্ফল হয় না। তারাও তাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় পায়। এই হ'ল বাস্তবে যা' ঘটে according to the law of action and reaction (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম-অনুযায়ী)। This is just a statement of a scientific fact (এটা একটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ মাত্র)। এর মধ্যে ভয়-অভয় দেখাবার প্রশ্নই ওঠে না। টি-বি রোগের বৈজ্ঞানিক কারণ কী যদি ডাক্তার তা' বলে, তাহ'লে কি বলব ডাক্তার ভয় দেখিয়ে মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি পালনে বাধ্য করছে। অজ্ঞতা মানুষের অজ্ঞাতসারে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, তাই মানুষের প্রকৃত জ্ঞান যাতে বাড়ে, অর্থাৎ কী করলে কী হয়, তা' যাতে মানুষ বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করাই লাগে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬২নং শ্লোকে যে 'পরাং শান্তিং' কথার উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরা শান্তি মানে পূরণ-পালনী শান্তি, অর্থাৎ তাকে পূরণ-পালন করা থেকে যে শান্তি আসে, তাকেই বলা যায় পরা শান্তি। তখন তিনি ছাড়া অন্য কোন চাহিদার বস্তু থাকে না। তাই অশান্তির বীজ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

৬৭নং শ্লোক পড়া হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মুগ্ধ বিস্ময়ে বলতে লাগলেন—কেষ্ট ঠাকুর কেমন সুন্দরভাবে বলেছেন—তপস্যাহীন লোককে, ভক্তিশূন্য মানুষকে, শুনতে ইচ্ছুক নয় বা আমার প্রতি অসূয়াপরবশ এমনতর কাউকে আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলবে না। আমরা হয়তো একজন অশ্রদ্ধাপরায়ণ লোকের কাছে রামকৃষ্ণঠাকুর-সম্বন্ধে বললাম—তিনি ভগবান। সে কিন্তু যা' শুনবে, তারই উল্টো ও বিকৃত অর্থ করবে। এতে তারও ক্ষতি, সমাজের পক্ষেও ক্ষতি। তাই এমনতর মানুষের কাছে কখনও গুহ্যতম কথা বলতে নেই। আর যদি বলতেই হয় তবে প্রথমটা তাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব গজিয়ে তুলে তারপর যতটা সমীচীন ততটা বলতে হয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ২০।৫।১৯৪৮)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আমগাছের ছায়ায় একখানি ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুধাংশুদা (মৈত্র), গোপেনদা

(রায়), সুরেনদা (বিশ্বাস), শৈলেনদার মা, দুলালীমা, গৌরীমা, শৈলমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—অনুভূতি যাদের হয়েছে, তাদের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আপনাদের মধ্যে দেখলেই পারেন। বস্তু তো এক বই দুই নয়।

একটু থেমে বললেন—কাল একজন প্রশ্ন করছিল কালী সাকার না নিরাকার। আমি তাকে বললাম সাকার-নিরাকার দিয়ে তোর কাম কী—ও দিয়ে তোর কী হবে ? তুই গুরু পাইছিস, তাঁকে ভালবাস্, follow (অনুসরণ) কর্, তিনি যেমন বলেছেন তেমনিভাবে 'মা' 'মা' কর—তাতে যা' হবার তা' আপনা থেকেই হবে। এ-সব ক'রে জানতে হয়, কথার কচকচিতে কিছু হয় না। ঠিকমত করলে, প্রাণভরে ডাকলে মা স্বয়ং ধরা দেবেন তোর কাছে। সেইতো আসল জানা, আসল বোঝা। তাই বলি—আবোল-তাবোল ক'রে সময় নষ্ট করিস্ না। এইভাবে কি-কি জানি বললাম। সে বলল—'আমি একেবারে চুর হ'য়ে গেছি। এমন সহজ ক'রে কেউ বলেই না। হয়তো বলতে জানেও না।' বলতে-বলতে তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, 'সমত্বং যোগ উচ্যতে।' এই সমত্ব মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় সমত্ব মানে equitable balance (বৈশিষ্ট্য-সম্মত সমতা)। এমনভাবে চলা যাতে ইষ্টের সঙ্গে যোগটা কখনও ব্যাহত না হয়। আর, ঐটে ঠিক থাকলে মানুষের চলার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। অন্তর বা বাইরের কোন অবস্থা বা পরিস্থিতি তাকে বেহাল করতে পারে কমই। ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যখন যা' করা সমীচীন ও শুভদ তাই-ই সে ক'রে চলে। তাতে মাত্রা জিনিসটা ঠিক থাকে। সমত্বের প্রধান লক্ষণ হ'ল চলনার consistency and continuity (সঙ্গতি ও ক্রমাগতি)।

কেষ্টদা—আরো আছে, 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ না হ'লে কর্ম্মের কৌশলই বেরোয় না। কোন-কিছু সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে মনের যে একাগ্রতা ও স্থৈর্য্যের দরকার তার জন্যই চাই প্রেষ্ঠনেশা। তাই আমি বলি—Do adhere and have the tactics to do. (নিষ্ঠাবান হ'য়ে কর্ম্মকৌশল আয়ত্ত কর)।

কেষ্টদা—দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে—মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ, আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাত্রা মানে কী ?

কেষ্টদা—ইন্দ্রিয়। এখানে বক্তব্য এই যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগহেতু, শীত, উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে এইসব দ্বন্দ্ব উৎপত্তিবিনাশশীল, তাই অনিত্য। তাই ধীরভাবে এগুলি সহ্য করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো কষ্ট একেবারে ছাড়ে না। কষ্টের যেন প্রবাহ চলছে। থেকে-থেকে কতবার মার কথা মনে হয়, সাধনার কথা মনে হয়, গোপালের কথা মনে হয়, কিশোরীর কথা মনে হয়, ভেলকুর কথা মনে হয়, কাছের দূরের আরো কত-কত লোকের কথা মনে হয়। কত লোকের কতকষ্ট সব যেন আমাকে একসঙ্গে ঠেসে ধরে। একটা প্রবল কষ্ট আমাকে যেন বিকল ক'রে ফেলতে চায়। তবু বুকের কষ্ট বুকে চেপে রেখে যখন যে-ক্ষেত্রে যা বাস্তব করণীয় তা ক'রে চলতে হয়। কষ্টও এড়াবার জো নেই, আবার যা' করার তা' না ক'রেও রেহাই নেই। এই-ই জীবন আমার। আমি একটা পাগল কিনা বুঝি না।

কেষ্টদা—এক জায়গায় বলেছেন—'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্ত যঃ স চ মে প্রিয়ঃ'। তার মানে হর্ষ-অমর্ষ, ভয়-উদ্বেগ তাকে বেগ দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিবাদের সুরে বললেন—বেগ আবার দেয় না ? তেমন তো দেখি না। আমার মনে হয় জীবনপথে চলতে হর্ষ-অমর্ষ, ভয়-উদ্বেগ প্রত্যেকেরই তার মত ক'রে হয়ই। তবে এগুলি প্রকৃত ভক্তের balance (সমতা)-টা নষ্ট করতে পারে না, ইষ্ট থেকে তাকে চ্যুত করতে পারে না। আর, এই অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠাই মানুষের চলনাকে সব অবস্থার মধ্যে অনেকখানি অব্যাহত রাখে। অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপ তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে না। ইষ্টের মুখ চেয়ে সে অক্লান্তভাবে struggle (সংগ্রাম) ক'রে চলে। বিফলতা ও সফলতার দুঃখ ও আনন্দ দুই-ই তাকে পেতে হয়। অবশ্য, বিফলতায় সে পুরোপুরি মুষড়ে পড়ে না। এ তো গেল একদিককার কথা। আর, জীবের দুঃখ দূর করার ব্রত নিয়ে যে-সব মহাপুরুষ আসেন তাঁদের তো দুঃখ-ব্যথার অন্ত দেখি না। কেষ্টঠাকুর, রামচন্দ্র, যীশুখ্রীষ্ট কেউই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাননি। অবশ্য, এ কষ্ট তাঁরা লোকমঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছেন। তাই, বদ্ধজীবের অজ্ঞতা ও কর্ম্মফলপ্রসূত কষ্ট ও এই কষ্টের মধ্যে তফাৎ আছে।

কেষ্টদা—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এক বিরাট দার্শনিক আলোচনার অবতারণা ক'রে তারপর ক্ষাত্রিয়ের করণীয় নির্দ্দেশ করলেন অর্জ্জুনকে। ওভাবে বললেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Divine philosophy (ভাগবত দর্শন) দিয়ে সুরু ক'রে তা'

থেকে concrete-এ (বাস্তবে) আসলেন। আত্মিক ধর্ম্ম প্রত্যেককে পালন করতে হয় তার instinctive activity (সহজাত সংস্কার-সম্মত কর্ম্ম)-এর ভিতর-দিয়ে। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা' বলেছিলেন তার মর্ম্ম হ'ল—You are a Kshatriya, born with Kshatriya instincts. And you must do your instinctive duty with all elevating urge (তুমি ক্ষাত্র-সংস্কার নিয়ে জাত ক্ষত্রিয়। এবং উন্নয়নী আকূতি নিয়ে তোমাকে অবশ্যই তোমার সহজাত সংস্কার-সম্মত কর্ত্তব্য পালন করতে হবে)। অর্জ্জুন পণ্ডিত কিনা তাই কেষ্টঠাকুর ঐভাবে অর্জ্জুনকে তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন। Philosophy (দর্শন) না বললে অর্জ্জুন ধরত না। একজন জেলের কাছে বলতে গেলে ওভাবে বললে হ'ত না। তাকে তার মাছ ধরার Philosophy (দর্শন)-এর উপর দাঁড়িয়ে বলতে হ'ত। কার সঙ্গে কখন কোন্ ব্যবহার করতে হয়, কাকে কোন্ অবস্থায় কোন্ কথা কিভাবে বলতে হয়, এটা অনেকেই বোঝে না। তার কারণ, তারা ধরতে পারে না কার কী সংস্কার, কার কী বৈশিষ্ট্য, কখন কী mood (মেজাজ) কাকে rule (শাসন) করে। আবার, কেউ যদি ধরতেও পারে অথচ তার যদি self-mastery (আত্ম-কর্ত্তৃত্ব) না থাকে, তাহ'লেও কিন্তু সে বেতাল ক'রে ফেলে।

কেষ্টদা—শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে বলেছেন শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, আবার শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তিনি প্রত্যেকের অন্তরে চৈতন্যস্বরূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! জ্ঞান বললেই প্রশ্ন আসে কিসের জ্ঞান? মানুষ জ্ঞানস্বরূপকে ধ'রেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারে। তাই জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং দয়া ক'রে মানুষের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হ'য়ে আবির্ভূত হন, যাতে মানুষ তাঁকে জেনে সার্থক হ'তে পারে। তিনি হ'লেন knowledge incarnate (মূর্ত্তিমান জ্ঞান) অর্থাৎ incarnation of knowledge in flesh and blood (জ্ঞানের রক্তমাংসসঙ্কুল বিগ্রহ)। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। ব্রহ্ম তো সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁকে যিনি জানেন, দেখেন, বোঝেন, সেই বেত্তাপুরুষের জীবনই সার্থক। তাঁকেই বলে ব্রহ্মবিৎ। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' মানে 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মের মত হন' নয়, এর মানে হ'ল 'তিনি ব্রহ্মই হন'। পুরুষোত্তমকে সচ্চিদানন্দস্বরূপও বলা হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ কথাটা বড় সার্থক কথা। তিনি প্রত্যেকের অন্তরে চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ চেতনাস্বরূপ, এটাও বোঝা যায়।

সুরেনদা কলমের ক্যাপটা খুলে রেখে লিখছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ক্যাপটা কোথায়?

সুরেনদা—এই যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আট্‌,—এখনই আট্‌।

সুরেনদা আলগা ক'রে লাগালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে ব্যগ্রভাবে বললেন—ভাল ক'রে লাগা। বদ অভ্যাস-গুলি সেরে ফেলতে হয়। ছোট-ছোট জিনিসগুলি ঠিক ক'রে ফেলতে হয়, তাতে বড় জিনিসগুলিও ঠিক হয়। কোন ছোটই ছোট নয়। ছোটটাও রেহাই দেয় না। এইভাবে খুঁটিনাটি frailty (দুর্ব্বলতা) শুধরে-শুধরে perfection-এর (পূর্ণতার) দিকে যেতে হয়।

সুরেনদা—নিজের ধান্ধা তো আমাদের কিছু-কিছু থাকে। ইষ্টধান্ধা তো পুরোপুরি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে যে নিজের জীবনে প্রধান ক'রে চলে, তার নিজের ধান্ধাটাও ইষ্টধান্ধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তোমার হয়তো ছাতা নেই, কিন্তু ছাতা ব্যবহার না করলে হয়তো অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। তাতে ইষ্টকাজের ক্ষতি হবে, তাই ছাতা জোগাড় করছ। এটা কিন্তু ইষ্টধান্ধারই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, ভিতরে বাস্তবে ঐ attitude (মনোভাব) থাকা চাই। তা' যদি না থাকে, আর লোকঠকান চাল-হিসাবে যদি কেউ ঐ ধরণের ভোল ধরে, সেটা কিন্তু হবে তার পক্ষে hypocrisy (ভণ্ডামি)। আত্মস্বার্থী ধান্ধার থেকে hypocrisy (ভণ্ডামি) আরো বিশ্রী জিনিস। ওটা এক রকমের distortion (বিকৃতি)। ইষ্টকাজ ignore (উপেক্ষা) ক'রে যে কেবল নিজের কোলে ঝোল টানে, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, সেটা হ'ল নিজের ধান্ধা, আত্মস্বার্থী ধান্ধা। ঐ ধান্ধা থাকলে প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে ইষ্টকাজ করাই মুশকিল হ'য়ে ওঠে। অন্য ধান্ধা থাকায় ইষ্ট-কাজও যথাযথভাবে করা হয় না। তাই ঐ কাজে success (সাফল্য)-ও আসে না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। আমি বুঝি existence of mine (আমার অস্তিত্ব) আমার কাছে indispensable (অপরিহার্য্য) হোক তাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য যেন হয় to fulfil the existence of thine (তোমার অর্থাৎ ইষ্টের অস্তিত্বকে পরিপূরণ করা)। ইষ্ট ও পরিবেশকে sacrifice ক'রে (বিসর্জ্জন দিয়ে) নিজের স্বার্থের কথা বড় ক'রে ভাবা মানেই দুরদৃষ্টের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলা।

সুধাংশুদা—একজন হয়তো মনে করছে যে সে ইষ্টধান্ধা নিয়ে চলছে, কিন্তু বাস্তবে হয়তো অন্যরকম। এটা ঠিকভাবে বোঝা যায় কি ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকে তার নিজের ভিতরের দিকে চাইলে বুঝতে পারে সে কার জন্য কী করছে। আর কোন লোক ego-prominent (অহংপ্রধান)

না Ista-prominent (ইষ্টপ্রধান), তা' তার চালচলন, হাবভাব ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়েই সদাসর্ব্বদা ফুটে বেরোয়। প্রত্যেকের আচরণই ব'লে দেয় সে কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—গীতার কোন্ অধ্যায়ে কতগুলি শ্লোক আছে পর-পর এক জায়গায় লিখে যোগ ক'রে দেখ্ তো সবশুদ্ধ কত শ্লোক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ১৮টি অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা যোগ ক'রে বলা হ'ল—গীতায় সাকুল্যে ৭০১টি শ্লোক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আগেও শুনেছিলাম। যা'হোক, মিলিয়ে দেখা গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানে এসে বসলেন। একটু বাদে হাউজারম্যানদা ও ফেন্‌দা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দেখেই উল্লাসভরে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল ?

উভয়েই সহর্ষে বললেন—হ্যাঁ !

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে বললেন—ফেন্‌কে কতদিন পরে দেখলাম। দেখে বড় ভাল লাগছে।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বর্ণলতা মা ভাল আছে ?

ফেন্‌দা—Dysentery (আমাশয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে একটা উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। ওরা অল্পক্ষণ ব'সে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

সামাজিক ঐক্যের তাৎপর্য্য-সম্পর্কে কেষ্টদা কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমাজে বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আছে এবং থাকবেও। ঐগুলি যখন এক আদর্শের পূরণ-প্রয়াসী হ'য়ে চলে, তখনই সমাজে ঐক্যের সৃষ্টি হয়। ঐক্য মানে এমন নয় যে স্বভাবগত রকমারিত্ব থাকবে না। রকমারিত্ব জীবনেরই লক্ষণ। সেইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কথা আমি অত ক'রে কই। আমি বুঝি—প্রত্যেকটা প্রবৃত্তিরও একটা স্বতন্ত্র ধরণ আছে এবং তারও বাস্তব প্রয়োজন আছে। তাই বৃত্তিগুলিকে defunct (নিষ্ক্রিয়) করাও কাজের কথা নয়। দরকার হ'ল ওগুলিকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী আদর্শের অনুগামী ক'রে একমুখী ক'রে তোলা। এর ভিতর-দিয়েই বৃত্তিগুলি unified (ঐক্যবদ্ধ) হ'য়ে integrated personality (সংহত ব্যক্তিত্ব) গজায়। যে-দেশে বেশীর ভাগ লোকের personality (ব্যক্তিত্ব) disintegrated (বিশ্লিষ্ট), সে-দেশে national integration (জাতীয় সংহতি) সুদূরপরাহত হ'য়ে ওঠে। তাই, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষ্টিগত জীবনে যদি ঐক্যসঙ্গতি চাই তার জন্য পিছনে

চাই এমন একজন মানুষকে অনুসরণ ক'রে চলা যিনি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে প্রত্যেককে সব দিক দিয়ে পূরণ ক'রে চলতে পারেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Present situation of India (ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি) যা', তাতে মনে হয় অন্ততঃ ৫ কোটি স্বস্তিবাহিনী যদি সমাজ-সেবার জন্য thoroughly equipped (সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত) হয়, তাহ'লেই সব দিক সামাল দেওয়া যেতে পারে। নইলে মুশকিল আছে। তাদের কাজ হবে লোকের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে নিটোল ক'রে তোলা। তারা নিজেরা ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি নিয়ে চলবে এবং দেখবে যাতে উন্মার্গগামী চলন দেশের ভিতর প্রশ্রয় না পায়। ভারতের জেলায়-জেলায় উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সর্ব্বত্র তারা ছড়িয়ে থাকবে এবং লোকহিতী সেবাযজ্ঞে নিজেদের ব্যাপৃত ক'রে রাখবে। Government (সরকার) দেশের লোকের উপর tax (কর) বসিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে যদি সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে এদের maintain (প্রতিপালন) করে তাহ'লে কিন্তু এই কাজের sanctity (পবিত্রতা) থাকবে না। এরা হবে ইষ্টপ্রবুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক। এদের কোন condition (সর্ত্ত) বা demand (দাবী) থাকবে না। তবে এদের সব রকমের প্রয়োজনের দিকে শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে চলতে হবে আপনাদের, বাপ যেমন ছাওয়ালের জন্য করে ঠিক তেমনিভাবে। নইলে সব ভেস্তে যাবে। আর, দেশের লোককে বাস্তব সেবায় এমন উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে যাতে এই সেবাযজ্ঞের পোষণ-প্রবৃদ্ধিকল্পে তারা unconditional religious offer (নিঃসর্ত্ত ধর্ম্মীয় অবদান) হিসাবে আপনাদের কেন্দ্র-সংস্থাকে নিয়মিতভাবে যোগান দিয়ে চলে। দেশের লোক যদি সংহত, সংযত, উচ্ছল ও পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে তবে 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

প্রফুল্ল—এ-সব ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। তাই নেহেরুজী প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের এই বিষয়ে বললে বোধহয় ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার আগে অনেক কাজ আছে। প্রথমে কাগজে লিখে-লিখে লোকের মাথাগুলি এই ভাবে ভাবিত ক'রে নিতে হয়, তখন কথাগুলি ধরতে পারে। পরিবেষণের রকম চাই ; সেটা হওয়া চাই thoroughly faultless (সম্পূর্ণ নিখুঁত)।

সংবাদ এসেছে পাবনা-আশ্রমের বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রে টি-বি হাসপাতাল হ'চ্ছে। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—It is an insult, abuse and mischief

to the existence of the institution (এটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের পক্ষে একটা অপমান, দুর্ব্যবহার ও অপকার)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তক্তপোষের উপর পাতা শুভ্রশয্যায় সমাসীন। তাঁর নয়নাভিরাম অপরূপ রূপ বিজলি-আলোয় অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণমুখী হ'য়ে ব'সে তামাক খেতে-খেতে হাউজারম্যানদা ও ফেন্‌দার সঙ্গে মসগুল হ'য়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

মনের ওঠাপড়া-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ যেন wave (ঢেউ)-এর মত। ওঠার সঙ্গে নামা আছে, নামার সঙ্গে ওঠা আছে। ওঠানামা একসঙ্গে চলে। ওর জন্য ভাবতে নেই। দেখতে হয় উঠতি-পড়তি সবটার সঙ্গে, সবটার মধ্যে যেন আমার Lord (প্রভু) আমার মধ্যে unaffected (অব্যাহত) থাকেন। তিনি যদি আমার ভিতর চিরজাগ্রত থাকেন, তবে আমাকে আর ঠেকায় কে? তাঁর জন্যই তো আমি, তাঁর জন্যই তো আমার যা'-কিছু সব। দুঃখের মধ্যেও যদি তাঁকে বুকে ক'রে নিঝুম হ'য়ে থাকতে পারি, সেইতো আমার পরম সুখ। কোন অবস্থায় লহমার জন্যও যেন আমরা তাঁকে না ভুলি, অন্য কিছু যেন আমাদের মনকে পেয়ে না বসে। এই steady unrepelling love (এই স্থির অচ্যুত ভালবাসা)-টুকুই আমাদের সম্বল। অনেকের টান যেন হাউইবাজীর মত, খুব চোখধাঁধান জেল্লা নিয়ে ঠেলে উঠে একটু পরেই ফুসফাস। ঠিক যেন মাতালের উল্লাস। তা' স্থায়ী হয় না, উল্লাসের পরে আসে প্রচণ্ড অবসাদ। তা' তাড়াবার জন্য আবার মদের আশ্রয় নিতে হয়। টনিকে কিন্তু তা' হয় না। তা' শরীরকে পুষ্ট করে, মনকে প্রফুল্ল করে, কিন্তু কোন undesireable reaction (অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া) আনে না। আমার মনে হয় ইষ্টনিষ্ঠাই হ'ল সেই universal tonic (সার্ব্বজনীন বলকারক ওষুধ) যা' আমাদের অস্তিত্বকে সবরকম ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটুটভাবে ধ'রে রাখে। এতে চোখ ঝলসায় না, কিন্তু প্রাণ জুড়ায়।

কেষ্টদা—অনেক যুবক আছে যারা মায়ের ভালবাসাকে নীরস মনে করে, কিন্তু কোন সুন্দরী মেয়ে যদি তাদের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয়ও করে, তাতে তারা যেন একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—হ্যাঁ। তা' বটে। এমনটা না হ'লে gasping depression (প্রাণান্তিক অবসাদ) ভোগ করবে কি ক'রে? (হাসির তালে-তালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার উন্মুক্ত বক্ষস্থল আনন্দ দোলায় দুলতে লাগল)।

ফেন্‌দা অনেকদিন পরে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহাতুর জননীর মত বারংবার মমতামধুর প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাঁকে দেখছেন।

এই অপার স্নেহস্পর্শে ফেন্‌দার শরীর-মন যেন অমৃত-অভিষিক্ত হ'য়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার সংহত আবেগে বললেন—ফেন্‌ এসেছে! আমার মনে হ'চ্ছে যেন পরমপিতার blessing (আশিস্‌) আমার ভিতরে যেন একটা tonic action (বলপ্রদ ওষুধের কাজ) হ'চ্ছে!

এই কথা শুনে ফেন্‌দার সত্তার গভীরতম তন্ত্রী যেন ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল।

এরপর বিজ্ঞান ও অনুভূতি-জগৎ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Matter (বস্তু)-কে বুঝতে গেলে তার পেছনে fine, finer, finest (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম), যতরকমের stage (স্তর) আছে, সেগুলিকে causal link (কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল) সহ বুঝতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ব্যক্তিগত সাধনা দুই-ই আমাদের এই পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করে। তবে সুকেন্দ্রিক সাধনার ভিতর-দিয়ে আমাদের being (সত্তা)-টা যেভাবে elevated (উন্নীত) হয় এবং perceptive faculty (বোধক্ষমতা)-র range (পরিসর) যেভাবে বেড়ে যায়, তাতে আমাদের integrated materio-spiritual development (সংহত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ)—যা' কিনা আমাদের কাম্য তা' লাভ করার পক্ষে সুবিধা হয়। তাই আমি বলি, সদ্‌গুরু-নির্দ্দেশিত সাধন-পদ্ধতির অনুশীলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একযোগে চালান ভাল। এই উভয়েই উভয়ের সহায়ক হবে। সত্য এক বই দুই নয়। আর, এর কোন শেষ নেই। তাই আমাদের জ্ঞান ও বোধ যত বাড়ে তত ভাল। মলিকুল, এটম, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়াণ্টা, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি নামগুলির সঙ্গে আমি আগে তেমন বিশেষ পরিচিত ছিলাম না, কেষ্টদার কাছে শুনে শিখেছি, কিন্তু ওগুলির এবং আরো সূক্ষ্ম অনেক কিছুর কাণ্ড-কারখানা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি যেমন-যেমন বোধ করেছি, তেমন-তেমন বিবরণ কেষ্টদাকে বলতাম। আর, কেষ্টদা বলত কোন্‌টার কী নাম। আমার যন্ত্র হ'ল আমার nerve, brain-cell ও sense organ (স্নায়ু, মস্তিষ্ককোষ ও ইন্দ্রিয়), আর মন্ত্র হ'ল সৎনাম। তাই আমি বলি—এই নাম হ'ল key to creation (সৃষ্টির চাবি)। অনুরাগের সঙ্গে নাম করতে-করতে সব ধরা দেয়। অণুকণাগুলি কোথায় কেমনভাবে ঘোরে, চলে, jump (লাফ) দেয়, jerk (ঝাঁকি) দেয়, shoot করে (ছোটে), সব পরিষ্কার দেখা যায়। Powerful microscope-এ (শক্তি-

মান অনুবীক্ষণযন্ত্রে) যা' ধরা পড়ে না তাও concentration-এর (একাগ্রতার) তীব্রতায় সাদা চোখে ধরা পড়ে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, আমি যদি কয়েকবার মাছ না খেতাম, তাহ'লে যে আরো কত করতে পারতাম বলতে পারি না। Animal food is very harmful to bliss. It deprives the nerves of enrichment. At least I think so. (আমিষ-আহার আনন্দের পক্ষে ক্ষতিকর। এটা স্নায়ুকে বোধ-ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত করে। অন্ততঃ আমি তাই ভাবি।) মদ খেলে stimulant (উত্তেজক) হয়। It aggravates the hankering to have stimulant, fish and flesh are of the same type, as I know. (এটা ঐ উত্তেজক দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িয়ে দেয়। মাছ-মাংসও ঐ একই ধরণের জিনিস—আমি যেমনতর জানি।)

কেষ্টদা—এত যে নামধ্যান করলেন, তবু অল্প কয়েকবার মাছ খাওয়ার কুফল গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার একটা আঙ্গুল খুব কেটে গেলে সেরে যেতে পারে, ব্যথা না থাকতে পারে, তবে আগের সে অক্ষত আঙ্গুল কি আর ফিরে পাবেন ? অবশ্য, আমি একটা hopeless message (নৈরাশ্যের বাণী) বলছি না। যখনই যে ছাড়বে, তখন থেকেই সে bliss (আনন্দ)-এর দিকে এগুবে, যার পক্ষে যেমন যতটা সম্ভব। অবশ্য, শুধু নিরামিষ আহারই সব নয়। নিরামিষ আহারের সঙ্গে-সঙ্গে চাই বিহিত অনুশীলনগুলি ঠিকমত করা। আমি বলি—

"Be constant to your Lord with meditation,
do serve him as much as you can,
go on and have bliss."

(ধ্যানসহ তোমার জীবন-দেবতার প্রতি অবিচলিত থাক, যতটা পার তাঁর সেবা ক'রে যাও, এগিয়ে চল এবং আনন্দের অধিকারী হও।)

এখন রাত সওয়া ন'টা। চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন এবং তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সুধানির্ঝরে অবগাহন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে তুলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার অন্তরঙ্গসুরে বললেন—পরমপিতাকে এমনি আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, কিন্তু তাঁর স্পর্শ আমরা অনুভব করতে পারি ক্রাইষ্ট এবং তাঁর মত যাঁরা তাঁদের ভিতর-দিয়ে। ক্রাইষ্ট তাঁর ভালবাসা দিয়ে ক্রমাগত আমাদের আকর্ষণ করেন, টানেন তাঁর দিকে। আমরা না জানলেও তিনি

জানেন যে আমরা সবাই primarily (মুখ্যতঃ) তাঁরই। আমরা তাঁর প্রতি সংযুক্ত থাকি, এই-ই তিনি চান। এই-ই তাঁর প্রাণের পিপাসা। কারণ, এতেই আমাদের মঙ্গল। আমাদের মঙ্গলটাই তাঁর কাছে উপভোগ্য। তাঁর সঙ্গে সংযুক্তিই আনন্দের, বিযুক্তি দুঃখের। তা' তাঁর পক্ষেও যেমন, আমাদের পক্ষেও তেমনি। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা পরমপিতার কাছে যেতে পারি না। তাই কত emphatically (জোরের সঙ্গে) বলেছেন—"I am the way, the truth, the goal. None can come to the father but by me." (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য। আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না।) তিনি হ'লেন—Shepherd of man. He does not like that any one of his children should be out of his flock i.e., lost. (মানুষরূপ মেষের পালক। তিনি চান না যে তাঁর সন্তানদের কেউ দলছাড়া হোক অর্থাৎ হারিয়ে যাক)।

শেষের কথাগুলি বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরের তরঙ্গলীলায় একটা তীব্র আকুলতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল।

ধীরে-ধীরে একে-একে প্রণাম ক'রে একটা ধ্যানমুখী আবেশ নিয়ে ঘরে ফিরলেন ভক্তবৃন্দ। সেবকদের মধ্যে কয়েকজন কাছে থেকে গেলেন।

আলোচনা-প্রসঙ্গে—একাদশ খণ্ড

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র